KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"X8.5"
Vol. & Number : 19/3, 19/4, 20/2, 20/4	Year of Publication : Feb - 1998, May - 1998, Oct - 1998, June - 1999 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

সদ্যপ্রয়াত শওকত ওসমানের স্মৃতিচারণ এবং তাঁর দুটি গভীর রচনা

শওকত ওসমানের জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত রেখাচিত্র

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পশ্চিমবঙ্গে অপ্রকাশিত ডায়েরি, সাক্ষাৎকার ও অপ্রকাশিত রচনা

বাংলাদেশের সাড়াজাগানো চারজন লেখকের চারটি গল্প

গৌতম ঘোষের নতুন ছবি "ফকির" - এর চিত্রনাট্য

এবং

রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের গোপন বেতারকেন্দ্র সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ চারটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ

বিভাব

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশেষ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা

বিভাব

১৪০৫

From

A

Well

Wisher

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা ১৪০৫

সূচি

বাংলাদেশ : বিশেষ ক্রোড়পত্র

শওকত ওসমানের মহাপ্রয়ান ১

প্রবন্ধ

অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ ।। শওকত ওসমান ১১

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপ্রকাশিত ডায়েরি ২৯

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অপ্রকাশিত লেখা ৪৩

প্রবন্ধ

আমি ও আমার সময় ।। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ৪৮

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিঠিপত্র ৫২

সাক্ষাৎকার

রূপম এবং রাডার পত্রিকার সঙ্গে ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার ৫৯

প্রবন্ধ

ইলিয়াসের পুণ্ড্রদর্শন ।। শোয়েব শাহরিয়ার ৬৯

একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ।। আয়াতুল্লাহ সাঙ্গালজি ৭৭

মূল ফার্সী থেকে অনুবাদ : আনিসুর রহমান স্বপন

বাংলাদেশের গল্প

খাদক ।। হুমায়ূন আহমেদ ৮৭

নিরন্নের কাল ।। ইমদাদুল হক মিলন ৯২

একটি দীর্ঘশ্বাসের ডালপালা ।। নাসরীন জাহান ১০১

প্রতিপক্ষের পক্ষে ।। আহমদ বশীর ১০৯

বিষয় : রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ

বিশ্বভারতীর উৎস-সন্ধানে ।। অরুণ মুখোপাধ্যায় ১১৭

স্থানে স্থানে ... জন কতক সাহসী পুরুষ ।। অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী ১৩১

বিয়াল্লিশে কংগ্রেস রেডিও ।। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৪২

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব ও রবীন্দ্রনাথ ।। পিনাকী ভাদুড়ী ১৫৩

চিত্রনাট্য ক্রোড়পত্র

ফকির : সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য ।। গৌতম ঘোষ ১৬৪

ফকির : মূল গল্প ।। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার । ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। প্রদীপ দাশগুপ্ত।
শান্তিনিকেতন
অরুণ মুখোপাধ্যায়। অনাথনাথ দাশ

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র
অরুণ মুখোপাধ্যায়
এ্যানডুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন। পিন:৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ : রনেনআয়ন দত্ত

অলংকরণ : শ্যামল সেন

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ হইতে মুদ্রিত।।

সম্পাদকীয়

বিভাবের এই সংখ্যা মূলত বাংলাদেশ নিয়ে। এতে প্রয়াত ও জীবিত রচনাকারদের লেখা সংকলিত হয়েছে। যখন শওকত ওসমানের আত্মবিবরণধর্মী দার্শনিক রচনা 'অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ' বিভাবের পাতায় মুদ্রিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ঢাকা থেকে তাঁর প্রয়াণবার্তা এলো। তিনি বিভাবের অতি কাছের মানুষ ছিলেন। কলকাতায়ই তাঁর শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্যে-র মনন গড়ে ওঠে, পরে বাংলাদেশে গিয়ে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক চেতনায় উজ্জ্বল রচনার জন্য তিনি খ্যাত হন। শেষদিকে তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তবে গত ফেব্রুয়ারীতে যখন ঢাকায় বিভাব সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়, তখন বর্তমান রচনাটি মুদ্রণের অনুমতিপ্রদানের সঙ্গে বারবার বলছিলেন "সমরভাই এই দেখাই বোধহয় শেষ দেখা, আর দেখা হবে কিনা জানিনা"। সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ সংসদের আবুল কালাম আজাদ ও লেখক নবারুণ ভট্টাচার্যও ছিলেন। শওকতভাই তিন জনকেই নিজ হাতে একাধিকবার চা ও খাবার পরিবেশন করেছিলেন। বড় লেখকতো তিনি ছিলেনই, কিন্তু তার চেয়েও ছিলেন অত্যন্ত বড়মাপের এক মুক্তমনা মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় রোজই বিভাব সম্পাদকের তখনকার পার্ক সার্কাসের বাড়িতে সকালে এসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। কি ব্যাপক ছিল তাঁর সাহিত্যের পঠনপাঠন ও বোধির পরিধি। তাঁর প্রয়াণ আমাদের নিঃস্ব করে দিয়ে গেল।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের অন্যতম প্রধান লেখক। এ সংখ্যায় তাঁরও এক বিস্তৃত রচনাসম্ভার প্রকাশিত হলো। তাঁর রচনাগুলি মাত্র কিছুদিন আগে ইলিয়াস প্রতিষ্ঠিত 'তৃণমূল' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাই এই সংখ্যায় তাঁর এইসব রচনা এখানে আমাদের কাছে অপ্রকাশিত হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে। এগুলি মুদ্রণের অনুমতির জন্য লেখকপত্নী সুরাইয়া ইলিয়াসের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। ইলিয়াসের ডাইরি (সুস্থ অবস্থার দিনলিপি) উদ্ধার হলে তাও অমাদের দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইলিয়াস জায়া।

বাংলাদেশের যে গল্পগুলি প্রকাশিত হল তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকার বাংলা একাডেমীর পরিচালক শামসুজ্জমান খান, বিশেষ করে বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা সেলিনা হোসেন এবং মুদ্রিত প্রতিটি গল্পের গল্পকারদের। জনাব আনিসুর রহমান স্বপন রবীন্দ্রনাথের একটি অজানা সাক্ষাৎকার আমাদের উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন।

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ওপর তিনটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। এইসব রচনায় বহু অজানা তথ্য পাবেন পাঠক। বিশেষ করে বিশ্বভারতীর "উৎস-সন্ধানে" রচনাটিতে।

গৌতম ঘোষ তার শেষ ছবি ফকির-এর চিত্রনাট্য আমাদের দিয়েছেন। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল গল্পটিও ছাপা হলো। মূল গল্প মুদ্রণে অনুমতিদানের জন্য বিভূতিভূষণপুত্র তারাদাসকে ধন্যবাদ।

আমাদের পরমপ্রিয় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। কবি

এবং প্রবন্ধকার হিসাবে সুদীর্ঘ কাল তিনি আমাদের মনন অধিকার করে ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত "সাহিত্য চিন্তা" পত্রিকাটিও বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লেখক ও বিভাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। বিভাবের এই সংখ্যাটি শওকত ওসমান ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হলো।

বিভাবের আগামী সংখ্যা 'জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা'। বহু অপ্রকাশিত রচনা, তথ্য, ছবি এবং বহু মান্য রচনা থাকছে এতে। শুধু অগ্রিমে জানিয়ে রাখি, পাঠকদের জন্য এক প্রবল বিস্ময় অপেক্ষা করছে এই সংখ্যায়। এই দ্বিতীয়রহিত এবং ভবিষ্যতের জীবনানন্দ গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য এই মহামূল্যবান সংখ্যাটি সম্পাদনা করছেন জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম স্নেহভাজন কবি ভূমেন্দ্র গুহ। সহযোগিতায় আছেন অরবিন্দ গুহ ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

পরিশেষে একটি আনন্দসংবাদ। এখন থেকে বিভাব একযোগে শান্তিনিকেতন থেকেও প্রকাশিত হবে। শান্তিনিকেতন থেকে সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকছেন শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র ভবনের অনাথনাথ দাস।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পর্কে বাসুদেব দেবের সংযোজন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮)

একজন ছাড়া এ ঘটনার আজ আর কোন সাক্ষী নেই।

১৯৬৭ সালের কোন এক প্রাক্-বিকেল। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তখন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্সের সহ সম্পাদক। আমি ও কবি মানস রায়চৌরী কিরণদার আপিসে হাজির, উদ্দেশ্য 'কালপ্রতিমার' জন্য লেখা সংগ্রহ। সেখানে ভাগ্য গুণে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও মজুত। কিরণদা মৃদুভাষী, সৌজন্য শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তি। আমাদের সাহিত্য আলোচনার মধ্যে অকস্মাৎ ঝড়ো হাওয়ার মতই অবির্ভাব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, কি কারণে যেন ও পাড়ায় এসেছিলেন। বলা বাহুল্য সবাইকে দেখে উৎসাহিত শক্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ও ভাষায় আড্ডা জমিয়ে দিলেন অচিরে। কথাবার্তা অনুমোদিত ডেসিবেলের গণ্ডি ভেঙেছিল নিশ্চয়। কিরণদা উসখুস করছেন। অফিসে বসে কাজের সময় এমন উচ্চকণ্ঠ গালগল্প তাঁকে বিব্রত করছিল হয়তো। কারণটা বোঝা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুইংডোর ঠেলে ঢুকলেন তাঁর বস্, গেজেটিয়ার্সের সম্পাদক, আই.এ.এস অফিসার, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও লেখক মানুষ। বল্লেন : 'জেন্টলমেন, আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন। আমার কাজের অসুবিধে হচ্ছে।' আমরা সামান্য সন্ত্রস্ত। কিরণদা লজ্জিত। কিন্তু শক্তির তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য : 'কে রে লোকটা? অ্যাঁ? যান যান কাজে মন দিন গে। কাজ করলে কথা কানে যাবে না। যত্তো সব!' ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে অন্তর্ধান করলেন। পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ কিরণদাকে যে ঝড় সহ্য করতে হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। পরে যখন তাঁর অফিসে যাই, দেখি কাঁচের নিচে একটুকরো কাগজে কিরণদার করুণ মিনতি। 'দয়া করে আস্তে কথা বলুন।'

বস্তুত কিরণশঙ্করের মতোই তাঁর কবিতা আস্তে কথা বলে। নিজেকে জাহির করে না, প্রকরণে বা ভঙ্গিতে। প্রগলভ নয়, প্রত্যয়ী। তাঁর নিজের ভাষায় : 'অনেকদিন লিখছি। সব ভালো হয় নি, কিছু হয়েছে। কিন্তু বড় কথা বিবেককে বলি দিতে হয় নি। বিবেকবান কবির হাতেই একমাত্র সৎ কবিতা রচনা সম্ভব। যে কবিতার চরিত্র আছে তাই সৎ কবিতা।' বিবেক ও চরিত্র-এই দুটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া শব্দ কিরণশঙ্করের কবিতা মূল্যবোধের মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর কবিতার প্রাণরস মানবিকতা বোধের গভীর থেকে উৎসারিত। স্বদেশ ও স্বকাল তাঁর রচনার আবহ।

'যে বাঁচায় তারে নিয়ে আছি/দরিদ্র কুটিরে স্নিগ্ধ মৃত্তিকার/আরো কাছাকাছি..' এই অবিবেকী অন্ধকার সময়ে সততার ও বিশ্বাসের লণ্ঠন জ্বালিয়া প্রহরীর যে ভূমিকা নিয়েছেন তিনি, সেই ভূমিকায় যথেষ্ট আস্ফালনের অবকাশ নেই। চল্লিশের সমাজ সচেতন প্রগতিশীল কবিসংঘের অন্যতম জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি কিরণশঙ্কর একজন সৎ ও দায়বদ্ধ কবি। উদাসীন, আত্মগত বা নৈর্ব্যক্তিক নন। তিনি মানুষের পক্ষে, রাজনৈতিক চেতনায় স্পষ্ট অথচ শ্লোগান মুখরতা থেকে দূরে। তিনি জীবনের ও উজ্জীবনের কবি।

রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিদের ছায়ায় ১৯৩৬-৩৮ সালে তরুণ কিরণশঙ্করের কাব্যজীবনের শুরু, ঢাকায়। আর সকলের মতোই তাঁর কবিতাও প্রথমে রোমান্টিক, দেহজ প্রণয়ের কুসুম। হয়তো তাতে মোহিতলালের প্রভাবও লক্ষ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ নবীন বয়সেই তাঁর 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' সাড়া তুলেছিল। 'স্বপ্ন কামনা' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি লিখেছিলেন 'মনে হলো যেন অনেকদিন মাটির নিচে থেকে মদ পেকে গেছে'। এই পরিণতির ছাপ কিরণশঙ্করের কবিতায় সূচনা থেকেই উপস্থিত। ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতার জালে তিনি জড়ান নি। স্বরচিত কুয়াশায় আচ্ছন্ন করেন নি নিজের পথ। স্বপ্ন ও কামনার পরিমণ্ডল ভেঙে গেল খান খান। যুদ্ধের দামামা উঠলো বেজে। এরই মধ্যে অনিবার্য ভাবে উচ্চারিত হতে লাগলো মানবিকতার পক্ষে নতুন কণ্ঠস্বর। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নতুন বাতাস হয়ে উঠলো উদ্দাম। পশ্চিমী চিন্তা ও কাব্য ভাবনার ঢেউও এসে লাগলো পূর্বসমুদ্রপারে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-স্বাধীনতা পটভূমিতে কিরণশঙ্কর পালন করেছেন এক দায়বদ্ধ শিল্পীর সচেতন ভূমিকা। 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হলো এ সময়ে। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, এলিয়টের প্রভাব এড়াতে পারেন নি এই সব কবিতায়। স্বাধীনতা ও দেশত্যাগের পর ক্রমশই গদ্য কবিতার দিকে সরে আসছেন। নিরাভরণ ও আতিশয্যহীন কবিতায় যোগ দিল গভীরতার মাত্রা। তাঁর কবিতায় পরীক্ষা নিরীক্ষার, ছন্দে বা প্রকরণে, দুঃসাহস হয়তো প্রকট নয়, কিন্তু তিনি আবিষ্কার করছিলেন সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণুদের উত্তরাধিকার সূত্রে এক ধ্রুপদী ধারা, নতন চেহারায়, লৌকিক অবয়বে।

কবিতা, পরিচয় প্রভৃতি তখনকার সব বিশিষ্ট কাগজে প্রথম থেকেই লিখেছেন তিনি। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষটি যেমন নিরহংকার অথচ অভিজাত, নম্র অথচ আত্মমর্যাদায় দৃপ্ত তাঁর কবিতার চরিত্রেও তেমন সম্ভ্রান্ত ও পরিশীলিত বিভাব। তাকে উত্তেজিত হতে দেখি নি কখনো। শ্লেষ

ও চাতুর্য, চমক ও ঝলকানি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। অথচ কম বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রখর নয় তাঁর 'স্বর' কবিতাটি। কিরণশঙ্কর ক্রমশই গভীর ও স্থিতধী। 'মানবিক মূল্যবোধ ও মানব সম্পর্কের শোচনীয় অমাবস্যার' জগতে তিনি জেগে উঠেছেন, বিশ্বাস ও সততাকে বাঁচিয়ে রাখতে পণ করেছেন আপাতখ্যাতির মোহ। এলোমেলো ধুলো ঝড়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের তোয়াক্কা করেন নি। 'দিনযাপন', 'এই এক সময়', 'বৃষ্টি এলে', 'রুক্ষ দিনের কবিতা' 'মানুষ জানে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সিঁড়ি ভেঙে আমাদের তিনি নিয়ে চলেন দীপনে ও উজ্জীবনে, বিলাসিতায় নয় বোধে। 'চৌরঙ্গীর সেই লেনিন স্ট্যাচুর পাশে এসে দাঁড়ালাম। /এদিকটা বড় অন্ধকার,/ঝলমল করছে নটীর মতো/রাতের চৌরঙ্গী/শুধু যিনি অন্ধকার তাড়িয়ে/আলো জ্বেলেছিলেন এক মাঘের শীতে/তাঁর মুখে আলো নেই'। কবির সামাজিক দায়িত্বের কথা কখনো ভোলেন নি তিনি।

সত্যি কথা বলতে কি কিরণশঙ্করের কবিতা ট্যুরিস্টদের লীলাবিতান নয়, আমাদের তাপিত দিনের আশ্রয়নিকেতন। তাঁর ঐ চিরায়ত স্বভাবের শান্ত মাধুর্য বাংলা কবিতার এক স্থায়ী সম্পদ। তাঁকে সঠিক চেনা যায় তাঁর কবিতার মধ্যেই :

'দুঃখ করো না আমি আবার আসব। / আমি ব্যর্থ নই শূন্য নই / বৃক্ষ থেকে ঝরে যাওয়া শুকনো ফুল / কিংবা উড়ে যাওয়া কীট? পাতা নই; / আমি অন্ধকারে মিশে আছি / তাই অদৃশ্য/... কিন্তু একদিন ঝরণার জলের শব্দ শোনা যাবে,/বাঁশি বাজবার শব্দ/সেদিন সব বিষাদ সরিয়ে আমি আসব।/' (আমি আসব) এই আবহমানের ধারায়, ভবিষ্যতের মধ্যে মিশে থাকেন যে কবি আমাদের স্বপ্নের মতো, তাঁকে আমরা এড়িয়ে যাব কি করে? কবি যে চিরযুবা চিরঞ্জীবী। এ বছর এপ্রিলের মধ্যেরাতে আশি বছর পার করে চলে গেলেন তিনি। (এলিয়টের April is the cruellest month কে সত্যি করে), সে দিনের প্রাক্ দুপুরে তাঁর নশ্বরতাকে বিদায় জানালো আত্মীয় পরিজন, কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যসেবী আর লাল পতাকার মতো বীণাভবনের সামনের রক্তিম কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছ। সমারোহ কোথাও ছিল না তাঁর — না জীবনে না প্রয়াণে।

বয়স তাকে বৃদ্ধ করে নি। কয়েকটি মননশীল আলোচনা গ্রন্থ রচনা, সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্প সহ বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনা ছাড়াও আমৃত্যু তিনি সম্পাদনা করে গেছেন 'সাহিত্যচর্চা' নামে অভিজাত একটি সাহিত্যপত্রের। ১৯৯০ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। তবু কেন যেন মনে হয় এই প্রচার-প্রখর বাণিজ্যিক কালে তাঁর যথোচিত মূল্যায়ণ করতে পারি নি আমরা। জানাতে পারিনি তাকে তাঁর দীর্ঘ কবি জীবনের প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মান। পরবর্তী প্রজন্ম যদি আমাদের এই অপরাধ ক্ষালন করে!

'একদিন কেউ এসে আমার নাম ধরে চুপি চুপি ডাকবে,
সে এখনো আমাকে পরিত্যাগ করে নি।
আমি অপেক্ষা করছি
সূর্য অস্ত গেলে, চাঁদ ওঠার আগে'।

বাংলাদেশ
বিশেষ ক্রোড়পত্র

জয়নুল আবেদিনের তুলিতে শওকত ওসমান

জাতির কথাশিল্পী
শওকত ওসমানের মহাপ্রয়াণ

শওকত ওসমানের জন্যে

শামসুর রহমান

এই মহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, আপনি আহত
শার্দূলের মতো বসে আছেন আপনার নিজস্ব বিবরে।
বাইরে এখন অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমাগত, রক্তখেকো
নেকড়েগুলোর তৎপরতা ভীতি সঞ্চার করছে
অনেকের মনে। আপনি আহত, অথচ অন্তর্গত রক্তক্ষরণ আপনাকে
অবসন্ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আপনি, অনুমান করি,
তাকিয়ে আছেন ঘরের দেয়ালের দিকে,
যেখানে আপনার না-লেখা পংক্তিগুলো মাঝে-মধ্যে
ঝিকিয়ে উঠছে, চক্ষুষ্মান আপনি সহজে
দেখতে পাচ্ছেন কালান্তরের অপরূপ অভিষেক।

আপনার জীবন এক অবিরাম সংগ্রাম বাঁচবার
ক্লান্তি আর হতাশা যাদের কুঁজো করে ফেলেছে তাদের
বাঁচিয়ে তুলবার। আপনি ইচ্ছে করলেই
গোলাপের সুঘ্রাণে বুঁদ হয়ে নক্ষত্রের গুঁড়ো সারা শরীরে মেখে
কাটিয়ে দিতে পারতেন
অবলীলাক্রমে, কিন্তু যে আপনি জীবনকে
দেখেছেন নানা মাত্রায়, বিভিন্ন স্তরে,
তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব পদ্মভুরু হয়ে থাকা? ক্ষুরধার
আপনার লেখনী, তার আঘাতে
অন্ধকার কাতরাতে থাকে পশুর মতো। আপনার
অক্ষরমালার দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।
মধ্যযুগচারী লোকদের, ওরা বুঝতেই পারে না
আপনার সীমাহীন অভীপ্সা, আপনার স্বপ্নের বলয়ে
কী ঐশ্বর্য জ্বলজ্বল করছে!

এ দেশের প্রতিটি বিবেকী মানুষ আপনার
রচনা সমূহের পক্ষে, হে প্রেরণাসঞ্চারী অগ্রজ,
এ দেশের প্রতিটি সাহসী, অগ্রসর মানুষ
আপনার সুদীর্ঘ জীবনের পক্ষে, আপনার কাঁটার মুকুটে
ঝরুক পুষ্প বিকাশের সুর,
আমাদের কৃতজ্ঞ চিত্তের আনন্দধারা।

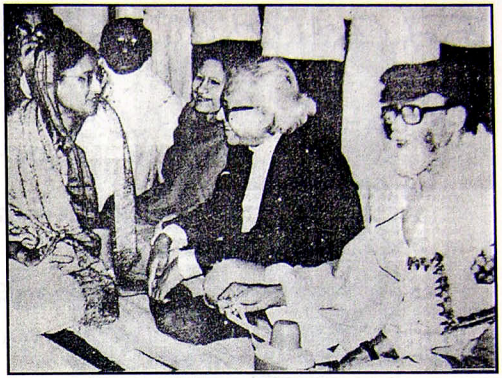

১৯৯৫ সালে বিরোধী দলীয় নেত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনার মিন্টুরোডস্থ সরকারী বাসভবনে নেত্রীর সঙ্গে শওকত ওসমান ও কবি শামসুর রাহমান।

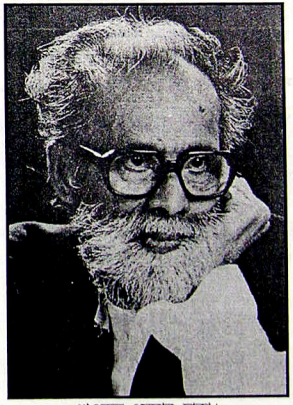

শওকত ওসমান, ঢাকা।

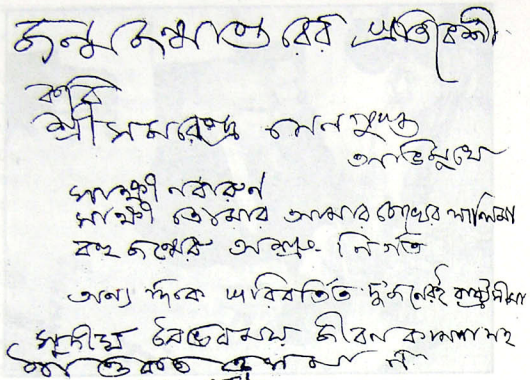

''অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ'' — রচনাটি দেবার সঙ্গে শওকত ওসমান লিখে দেন :—

জন্মজন্মান্তরের প্রতিবেশী কবি শ্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত অভিমুখে
সাক্ষী নবারুণ
'সাক্ষী তোমার আমার চোখের লালিমা
বহু জন্মের অশ্রু নির্গত
অন্যদিকে পরিবর্তিত দুজনেরই রাষ্ট্রসীমা'
সুদীর্ঘ বৈভবময় জীবন কামনা সহ

শওকত ওসমান
২৭/২/৯৮

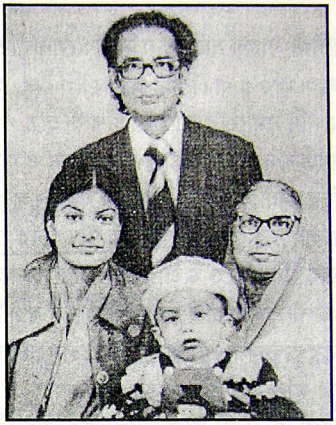

শওকত ওসমান। স্ত্রী সালেহা ওসমান, কন্যা আনফিসা আজগর লায়লী ও দৌহিত্র ওয়ারিদ আজগরের সঙ্গে।

টেনাসিস পুরস্কার গ্রহণ করছেন শওকত ওসমান। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

জাতির কথাশিল্পী, বাংলা সাহিত্যের নির্ভীক সেনাপতি, চিরঞ্জীব চেতনায় উজ্জ্বল মুক্তির বার্তাবাহী হে বাঙালি বীর, অর্ধশতাব্দী কাল ধরে আপনি সমাজের আলোর দিশারী হয়ে পথ দেখিয়ে চলেছেন, যাবতীয় দুঃশাসন ভ্রষ্টাচার, নিপীড়ন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। মাটির কান্না, মানুষের সম্ভ্রমের সংকট, ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর ভেতর বাইরের শোষক শত্রুদের অত্যাচার প্রতিনিয়ত আপনাকে ক্রুদ্ধ, বিক্ষত ও জর্জরিত করেছে। সকল সংকটে প্রতিনিয়ত আপনি কাছাকাছি হতে পেরেছেন স্বজাতির। বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ও বিকাশের ইতিহাস চর্চায় হয়েছেন ঐতিহ্যাশ্রয়ী। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আপনার ত্যাগী ও দ্রোহী স্বত্তা আপনাকে বাঙালি জাতির কথাশিল্পীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করছে। আপনার বিরাশিতম শুভ জন্মদিনে জাতির পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শতায়ু হোন। কর্মে অবিচল হোন। আলোর দিশারী হয়ে বেঁচে থাকুন বাংলার জনপদে। এই কামনা আমাদের।

শওকত ওসমানের শেষ জন্মদিবস পালন উপলক্ষে
উৎসব-পরিষদ ও রাইটার্স ঢাকার প্রতিবেদন

অনুজগণের প্রতি

এবার যেখানে যাবো
অসম্ভব ফিরে আসা।
কাঁকড়ার মত অগ্রে-পশ্চাতে
যেনো বিচরণ-শীল
অনুজের প্রতি তার ভালবাসা।

শওকত ওসমান

একাশি নট আউট

শওকত ওসমান

অনেক কাল বাঁচলাম। গড় বাঙালীর আয়ু বর্তমানে পঞ্চাশের সামান্য উর্ধে। সেই তুলনায় নিশ্চয় অনেক বাঁচা। কিন্তু বাঁচার মূল্য নিরূপিত হয় কাজের ভেতর দিয়ে। কাজের পরিমাপ সেখানে বড় মাপকাঠি। নচেৎ বহু কালের পার্থিব অবস্থান নিরর্থক। এসব নির্ভর করে, জীবনের অর্থবহতার উপর। পিতামাতার দায়িত্ব সন্তান-পালন এবং তাদের সৎ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। এই কাঠামোর মধ্যে জীবন একটি অর্থ বহন করে। তাছাড়া বহুকাল বাঁচার কোন মানে হয় না।

তাই পেছনে তাকাই। কিসের জন্যে এত বাঁচলুম? পেছনে চালিকা-শক্তি কি ছিল?

কৈশোর কালে জেনেছিলুম, স্বর্গীয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায়ঃ ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।

জেনেছিলুম পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা স্বদেশ। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ইংরেজ দাসত্বের নিগড় পরিয়েছে দেশের আষ্টেপৃষ্ঠে, সেখানে বন্ধন শুধু বাইরে নয়, ভেতরেও নাগপাশ জড়িয়ে আছে যার ফলে মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার কোন পথ নেই।

যৌবনে তাই অদম্য বাসনারূপে প্রাণে জায়গা নিয়েছিল স্বদেশের স্বাধীনতা। প্রাথমিক কর্তব্য এই দেশকে স্বাধীন করা। সংঘবদ্ধ না হলে তা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তুমি যোগ দিতে পারবে কি? সকলের পরিবেশ সব সময় সহায়ক হয় না। আমার অবস্থান তেমনই গন্ডীর মধ্যে। স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাছাড়া মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। এসব জানা সত্বেও ব্যক্তিগতভাবে আমি সংঘচারী হতে পারিনি। নিম্ন মধ্যবিত্তর দরিদ্র পরিবারে এমন প্রতিবন্ধকতা নতুন কিছু নয়। দশের সঙ্গে মানসিক-ভাবে থাকলেও, দঙ্গলে যাওয়া নিষেধ হয়ে রইল। এই দোটানার মধ্যে আমার কর্তব্য স্থিরিকৃত হয়। যখন সাহিত্যের শরণাপন্ন হলাম, তখন তা সমাজ সেবার হাতিয়ার হয়ে আমার কাছে দেখা দিল। নান্দনিক জগতে উপযোগিতার উৎপাত অনেকে সহ্য করেন না। রবীন্দ্রনাথ তো কোনো দিন করেন নি। তাঁর ভাষায় "কেজো" এবং "অকেজো" সাহিত্যের ভাগ ছিল অপাংক্তেয়। কিন্তু নিজে পারেননি পরাধীন দেশের নাগরিক রূপে কল্যাণের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগ প্রমাণ করে, তাঁর মানস-পরিচয়। তৃণমূলের দিকে তাঁর নিরীক্ষা থেকে জানা যায়, কিভাবে সমাজ-উন্নয়নের পথ আবিষ্কার করতে হয়। আজ বিশ্বাস করা দায়, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কবি সমবায় সমিতির কথা প্রথম ভেবেছেন এই উপমহাদেশে। বর্তমানে পাবনার শাহজাদপুরের বাথানে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পশু-প্রজননের জ্ঞান এবং চিন্তা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উন্নত গো-ধন তিনি স্বদেশে এনেছেন। জমিদার ছিলেন, কিন্তু প্রজাদের জন্য নিজের দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হননি।

সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পানে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি প্রমাণ করে, দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বে সাহিত্য বা যে-কোন ভূমিকা কেজো হতে বাধ্য। অবিশ্যি বিরাট প্রতিভার অধিকারী বিধায় তিনি যা কিছু স্পর্শ করতেন তা-ই নান্দনিক স্বর্ণে পরিনত হোতো। ব্রাহ্ম-আন্দোলন তাকে বেঁধে

রাখতে পারেনি। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত নাস্তিকের নিকটও পরম উপাদেয় হয়ে ওঠে।

মহান উত্তরাধিকার কবিগুরু রেখে গেছেন দেশবাসির জন্যে। সেই পদাঙ্ক আমি কোনদিন বিস্মৃত হইনি। দেশের স্বাধীনতা ছিল প্রথম উত্তরণের দিকশূল। সেই ভাবে পরিচালিত আমার জীবন-প্রবাহ।

একদিন দেশ স্বাধীন হোলো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোলো। কিন্তু যে-পথে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা, সেই পথ অনেক দূরে রয়ে গেল। প্রতিবন্ধকতা এসে জুটল। কায়েমী স্বার্থের ফন্দি-ফিকির জয়ী হোলো। এই উপমহাদেশে দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হোলো যে সাম্প্রদায়িকতার মারী বীজে দেশ ছেয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শেষ তুরুপ মেরে এই উপমহাদেশ-কে দুইভাগে ভাগ করে ফেললে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান।

পুরাতন ইতিহাস। ইতিহাসের তথ্য আপনারা জানেন। সাম্রাজ্যবাদী ফন্দী তো শুধু এই দেশে প্রয়োগ হয়নি। পৃথিবীময় এই প্রতারণার খেলা তারা খেলে চলছিল। তারা দ্বিখন্ডিত করেছে কোরিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিখণ্ডিত কম্বোডিয়া, দ্বিখণ্ডিত ভিয়েট্‌নাম, একই রেখা সুদূর মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায় যেখানে প্যালেস্‌টাইনও দুই টুক্‌রোঃ ইসরাইল এবং প্যালেস্‌টাইন।

এই প্রতারণার খেলায় জাতীয়তাবাদী নেতারা হেরে গিয়েছিলেন। পরিণাম সম্পর্কে কোন দূরদৃষ্টি ছিল না। পাকিস্তান দু-টুক্‌রা হয়ে যাবে, তারা কি ভাবতে পেরে ছিলেন?

রক্তাক্ত যাত্রাপথ আবার। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার পথ ধরে কত জন সাতপুরুষের ভিটা খোয়ালো, সাথে সাথে প্রাণ। দুই সম্প্রদায় এমনই আত্মহারা। আবার যখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন একই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। বারো শ' মাইল ব্যবধানে দুই খণ্ডরাষ্ট্র, এক ধর্ম ছাড়া আর কোন মিল নেই। তবু জোড়াতালি দিয়ে শুরু হয়েছিল, শুধু এই ঘোষণা-মারফৎ যে ধর্ম সব স্ববিরোধ মুছে ফেলবে কালে কালে। এই কপোল-কল্পনা আসলে মূল ট্রাজেডির উৎস।

নিজ কওমের প্রতি ভালবাসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু মুসলমান কওমের আচরণে মনে হয়, যেন শাস্ত্র-কথিত অভিশপ্ত এক সম্প্রদায় যাদের উপর বিধাতার লানৎ অভিশাপ পতিত। নচেৎ শিয়া সুন্নীর লড়াই চালিয়ে যেতে পারে চৌদ্দ শ' বছর ধরে কোন সম্প্রদায়? মুসলমান কওম নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির মত। কোন হিসাব রাখে না। সামনে নদী আছে, হিংস্র বাঘ আছে, না সাপ আছে - যেন কিছুই দেখে না। কারণ অতীতের হিসাব তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। অন্য কওম কি করে একই সমস্যার সমাধান করেছে, সেদিকেও তাকাতে তারা নারাজ। য়ুরোপে ক্যাথেলিক, প্রটেষ্ট্যান্ট - খ্রীষ্টান কওমের দুই উপসম্প্রদায় চার শ' বছর রক্তক্ষয়ী বৈরিতার পর সেই নিরর্থক হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছে। কি করে রেহাই পেল তারা? সেদিকে মুসলমানেরা তাকিয়ে দেখবে না। তারা যে ধর্মকে রাষ্ট্র-পর্যায় থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে ঠেলে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে, তা দেখতে অভ্যস্ত নয় মুসলমান কওম। কারণ নিশিগ্রস্ত। নিজের

খোলের মধ্যে কচ্ছপের মত ঢুকে থাকাই তাদের স্বভাব।
ওদিকে জগৎ তো বসে থাকবে না, অন্য কওম তো বসে থাকবে না। তারা এগোবে এবং অনুকারকের মত মুসলমানেরা তাদের তাঁবে পিছনে হাঁটবে এবং তাদের তৈরী সভ্যতার চত্বরে জীবন-যাপন করবে বিনা লজ্জায়। তাদের মটোরে চড়বে, ফ্রিজ্ ব্যবহার করবে, এরোপ্লেনে সফর করবে ইত্যাদি। তারা ইসলামী রাষ্ট্র বানাবে, কিন্তু দেশরক্ষার জন্যে আধুনিক অস্ত্র কিনবে ইহুদী নাসারার কাছ থেকে। একটা সূঁচ তৈরী করার মুরোদ নেই, তারা কি ভাবে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান কি জেটবিমান বানাবে?
এসব ঘটে বিনা লজ্জায়। এমন বেহায়া কওম, যারা নিজেদের মানুষ ব'লে পরিচয় দেয় আর পৃথিবতে আছে কি না সন্দেহ!
একাশি বছর পেরিয়ে গেলাম।
জীবনের এই গোধূলি-লগ্নে আশা করব, বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকল নাগরিক মোহমুক্ত জীবন-যাপনের দিকে অগ্রসর হবে।
আমাদেরই একজন তেমনই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের চার স্তম্ভ নির্মিত হয়ঃ
১. গণপ্রজাতন্ত্র, ২. জাতীয়তাবাদ, ৩. সমাজতন্ত্র, ৪. ধর্মনিরপেক্ষতার নামে।
বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পৃথিবীর গোটা মুসলমান কওমের ভবিষ্যৎ অগ্রগামী পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ স্তম্ভটিঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা।
আন্তর্জাতিক এবং দেশী কুলাঙ্গার আততায়ীর ষড়যন্ত্রে তিনি অকালে নিহত হন সপরিবারে। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোন সুযোগ তিনি পান নি। প্রতিবিপ্লবের উল্টো চাকার ঘূর্ণনে একে একে সকল স্তম্ভ মিশ্‌মার হয়ে গেছে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বহু মানুষের স্বপ্ন।
জীবনের এই শেষ লগ্নে প্রত্যাশা করছি, বাংলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ টুটাফুটা স্বপ্ন আবার দুই চোখে তুলে নেবে কওম হিসেবে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলিঙ্গন-তৃষিত বক্ষসহ দীপ্ত এবং দীপ্র পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে ভবিষ্যৎ শ্রীময় কালের অভিমুখে।

জয় বাংলা !

এই বছর ২ জানুয়ারীতে শওকত ওসমানের ৮২তম জন্মোৎসব বাংলাদেশে মহা সমারোহে পালিত হয়। ফেব্রুয়ারীতে গিয়েছিলাম ঢাকায়। সঙ্গে লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য ছিলেন। আমার সঙ্গে দীর্ঘ ২৫ বছর শওকত ওসমানের ছিল অগ্রজ-অনুজ সম্পর্ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় ছিলেন প্রায় রোজই সকালে আমার পার্কসার্কাসের বাড়িতে আসতেন। ঢাকায় বারবার বলছিলেন সমরেন্দ্র আর বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! নিজের হাতে জলখাবার দিয়ে বললেন খাও আমি দেখি। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে সেই নটআউট মানুষটি আউট হয়ে গেলেন।

— সম্পাদক

অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ

শওকত ওসমান

(বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক)

বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি,
তুমি যুগবোধ হারিয়ে ফেলেছ।
কাল বা মহাকাল আছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস জুড়ে।
অনেকে অবিশ্যি তা জানে না।
অথবা, জানলেও তাদের চেতনায় তেমন দাগ বা আঁচড় রেখে যেতে অক্ষম।
তুমি সে-জাতের নও, জানি।
কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকে তোমার কাল-বিস্মরণ ঘটছে।
তুমি স্বীকার নাও যেতে পারো।
চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, হ্যালিটোসিস। ওটা একরকমের রোগ, মুখে দুর্গন্ধ হয়। রোগটা যাকে ধরে সে কিন্তু আদৌ টের পায় না। আশপাশের মানুষ যারা রোগির কাছাকাছি আসে তারা বেশ টের পায় এবং সৌজন্যের খাতিরে দুর্ভোগ বেমালুম চেপে যায়।
আমি তেমন ভদ্রতা দেখাতে পারলুম না। সেই জন্যে বিশেষ দুঃখিত।
আসল কথা বলে ফেলা যাক।
অনেক কাল আগে থেকে তুমি যুগবোধ হারিয়ে ফেলেছ।
আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি।
এই গণ-মাধ্যম বা 'ম্যাস্‌মিডিয়া'র যুগে তুমি যদি চোখ বুজে বসে থাকো, ম্যাস্‌মিডিয়ার গতিবিধি বা অভিঘাত অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইমপ্যাক্ট'-এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন না থাকো, তবু কি আমি বলব তোমার যুগবোধ আছে?
জার্মানরা বলে, 'জিৎগিস্ট্' বা যুগের 'স্পিরিট' অর্থাৎ মর্মশক্তি।
ব্যাপারটা দু-দিক থেকে দেখা যায়।
একজন সময় সম্পর্কে সচেতন। সে মেনে নিয়েছে 'টাইম' বা সময় নামক এক অদৃশ্য সামগ্রী আছে, যা বাতাসের মত জানান দিয়ে যায়। যদিও তার অস্তিত্ব মানুষের চোখের বাইরে।
কিন্তু এমন লোক যুগের মর্মশক্তি সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারে। অর্থাৎ, দেশের উপর দিয়ে কি হাওয়া বইছে, দেশের মানুষ কি চায়, সে-সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়।
গণমাধ্যম সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতা বা অচেতনতা থেকে বোঝা যায়, কাল বা টাইম আছে তুমি তা আর মানো না। অথবা তুমি সেই নাদানের দলে পড়ো যারা টাইম দিয়ে স্পেস্ বা ব্যাপ্তিস্থান হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু কাল সম্পর্কে নিঃসাড়।
তুমি কি লক্ষ করেছ, গণমাধ্যমগুলো গত পঞ্চাশ বছরে ধাপে ধাপে কতো এগিয়েছে? সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, দৈনিক সংবাদপত্র, বেতার ইত্যাদি সবই গণমাধ্যম। একদম নবতম সংযোজন, টেলিভিশন বা দূরদর্শন।

তুমি কি লক্ষ্য করেছ, দৈনিক খবরের কাগজের স্বভাব চরিত্র কি ধারায় কতো বদলেছে? এখন দৈনিক সংবাদপত্রিকায় সাহিত্যের আসর কেমন জেঁকে বসেছে, লক্ষ্য করো।

সাহিত্যের উপর, জনমতের উপর, প্রকাশনার উপর, গণমাধ্যমের চোটপাট কেমন এবং কি পর্যায়ের—তা নিয়ে তুমি একটা বড় কেতাব লিখে ফেলতে পারো, যদি তোমার অবসর এবং গবেষণার চোখ থাকে।

আধুনিক যুগে অন্যান্য প্রশাসনিক যন্ত্রের মত 'মানসিক হাতিয়ার' লাগে। জনমত ছাড়া কোন দেশ চলতে পারে না। রাজনৈতিক পার্টি যারা দেশের শাসনভার পায়, তাদের তো এক-পা নড়ার উপায় নেই জনমত ছাড়া। তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল জনমতের উপর। সুতরাং প্রচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে ওদের ঔদাসীন্য অসম্ভব। প্রচার-সংক্রান্ত ব্যাপার মানে গণ-মাধ্যম। অথচ, তুমি নির্বিকার এসব দিকে।

একজন লেখকের অস্তিত্ব অনেকখানি জনমতের উপর নির্ভর করে।

তোমার ঔদাসীন্য এসব ব্যাপারে আসলে যুগবোধ হারিয়ে ফেলা থেকে শুরু হয়েছে। তুমি সেই জন্যে নির্বিকার।

কিন্তু মনে রেখো, গণমাধ্যমের নুলো নানা দিকে অক্টোপাসের নুলো, তোমার অজানিতে জড়িয়ে বসে আছে। প্রচারের বিবর্তনের দিকে চোখ রাখো, বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

তিরিশ বছর পূর্বে বা তারও কম কাল-সমতলে, তুমি ভাবতে পারতে, ফিলজফি—দর্শনের প্রবন্ধ কি কোন দার্শনিক আখ্যান-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হবে দৈনিক খবরের কাগজের পাতায়? এখন কি দেখছো?

সংবাদপত্রের "সাপ্তাহিক সাময়িকী" কেমন চিন্তারাজির আড়ৎ। আগে যারা সিরিয়াস, গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তারা ভাবতেন, তাদের কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা। তা নিয়েই তাদের যতো মাথাব্যথা। সমঝদারের সংখ্যা অল্প তা নিয়ে কোন উদ্বেগ ছিল না এমন চিন্তাবিদগণের।

কিন্তু এখন ব্যাপক বিস্তারের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, চিন্তাটা যথাযথ ঠিক হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এতটুকু শিরঃপীড়া নেই।

সংখ্যার পানিতে এখন সব পূত বা পাক-পবিত্র হয়ে যায়। প্রার্থনা কোয়ানটিটি—সংখ্যা। কোয়ালিটি গুণ—রসাতলে বা চুলোয় যাক। সংখ্যা এখন 'আবে-জমজম'। মক্কা শরীফের কূপের পানি।

বর্তমানে সাহিত্য-সমালোচনা বা অন্যান্য বিষয়ের সমালোচনার স্ট্যান্ডার্ড বা মানের দিকে তাকাও।

দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাসিক পত্রিকা কোণঠাসা হয়ে গেছে। কোন রকমে হয়ত দু-একটা ধুঁকেধুঁকে টিঁকে থাকে, প্রচণ্ড আর্থিক গচ্চা সহ।

এখন সাহিত্য-সমালোচনা দৈনিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চরে বেড়ায়। স্বল্প আলোচনা, ফিকে স্বাদ। সমালোচনা লেখেন সাংবাদিক বা গ্রন্থকারের বন্ধু-বান্ধব, যা নেহাতেই সৌজন্যের

ঋণশোধ।

তৃতীয় দশকের দিকে কবি এজ্‌রা পাউণ্ডের কাব্যগ্রন্থে (বোধ হয়, মবের্লি নিক্‌সন) এক সফল লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন তরুণ লেখককে মজুরের জন পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে পাবলিশারের কাছে 'এ্যাড্‌ভান্স' বাড়ানো যায়, "Butter the reviewer, from fifty to three hundred rose in eighteen months. সমালোচককে তেল লাগাও। পঞ্চাশ থেকে তিন শ'য় উঠল আঠার মাসে।"

এখন সাহিত্য-সমালোচনা ওই তেল বা মাখনের কারবার। প্রচারের মাধ্যম প্রচুর বৃদ্ধির ফলে, এখন জিগির হচ্ছে "সাফল্য এই মুহূর্তে। নামটাম যা হওয়ার তা এখনই হোক।"

খ্যাতনামা ফরাসি লেখক আঁদ্রে জিদ তাঁর জার্নালে আরো সমসাময়িক বিশিষ্ট সতীর্থদের নামোল্লেখ সহ লিখেছেন যে তাঁরা ভাবতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অখ্যাতই থাকতে হবে, তারপর যদি কিছু নামধাম হয়, হতেও পারে। লিখেছেন, "We put our hopes in duration, our sole concern being to produce a work that would last. আমাদের সব আশা ন্যস্ত ছিল স্থায়িত্বের কাছে। আমাদের একমাত্র মাথাব্যথা ছিল, এমন একটা কাজ করা যা যেন টিঁকে থাকে।"

গণমাধ্যম বা ম্যাস্‌মিডিয়া সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

এখন জপমন্ত্র : মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয় ন ধূমায়িতম চিরম। এক মুহূর্ত জ্বলাই শ্রেয়, চিরকাল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে থাকা নয়। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে জানো?

সাহিত্যের জগতে 'স্পেস্' (ব্যাপ্তিস্থান) খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের কল্যাণে, যত গরিব দেশই হোক, পাঠক-সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু Time বা কাল-ব্যাপ্তি সংকুচিত।

কেতাব-লিখিয়েরা ভেবে দেখে না, তার কাজটা ক'দ্দিন টিঁকবে।

কবিদের আয়ু এখন দশ বছরে সীমাবদ্ধ। অমুক দশকের কবি-রূপে পরিচয়। অর্থাৎ, পরবর্তী দশকে তিনি নিশ্চিহ্ন বা প্রায় গায়েব হওয়ার পথে।

চোখ খুলে দ্যাখো। উৎপাদন বা Production বেড়েছে Consumption বা খাদন (ভোগ) বেড়েছে। কিন্তু সমঝদারিত্ব ধাইছে উল্টো দিকে।

শেষ পর্যন্ত লেখকও নিরুপায়। দু' একজন ব্যতিক্রম। স্রোতের উজান ঠেলা খুব সহজ নয়। ফরাসি রুশো সাহেব বহু পূর্বে লক্ষ্য করেছিলেন, লেখকরা স্বাধীন, কিন্তু তাদের সুখ-প্রশান্তি নির্ভরশীল অপরের মতামতের উপর। সংখ্যার সাহায্যে তার অস্মিতার মূল্য নিরুপিত হয়। সুতরাং সত্তা এবং অস্তিত্বের দিক থেকে লেখকের হালতের কথা বিচার করে দ্যাখো। তাদের দুর্দশা আরো শোচনীয়, বস্তুতঃ টেলিভিশনি হামলার পর।

তুমি একটা নিম্নমানের আধালেখক বা অলেখককে, সমাজে মোটামুটি পণ্ডিত রূপে পরিচিত এমন দু' তিনজনের সাহায্য দু-তিন মাসে টেলিভিশানের পর্দায় কয়েকবার "পুরো লেখক" বলে জাহির করিয়ে দাও, তারপর মজা দ্যাখো। ওই অচল মাল চালু হয়ে গেছে। অহম-স্ফীতি বা Ego-inflation মুদ্রাস্ফীতির মত জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়, যদিও সামগ্রীটা পূর্ববৎ থাকে।

ইমেজের ধাক্কা বড় প্রচণ্ড।

বর্তমান প্রতিযোগিতা-দীর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন সহিংসতা। Violence বা সংগ্রাম অবধারিত। যে-যার কোলে ঝোল বা সুরুয়া মাখাতে তৎপর। প্রচলিত ভাবধারার মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হয় সেইখান থেকে।

গ্রামে মোড়ল মাতব্বর খাড়া করার প্রতিযোগিতা আছে। কারণ, সাধারণ মানুষ তাদের কথায় সায় দেয়। অর্থাৎ, দলীয় লোকদের জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরা দরকার।

পূর্বে বেতারে গায়েবী স্বর শোনা যেত। এখন সশরীরি মানুষের ইমেজ তোমার চোখের উপর, মনের উপর ধাক্কা দেবে। তার ফল, তাৎক্ষণিক।

বিগত কয়েক বছরে কতো মাটির পুতুলকে মহামানব হয়ে যেতে দেখা গেল না টেলিভিশনের কল্যাণে। অবিশ্যি এমন মহাপুরুষরা মৌসুমি ফুল। ওদের জন্ম তাৎক্ষণিকতায়, কাজেই ঝরে পড়তে বেশি দেরি লাগে না।

আগে ওরা পাওয়ারে আসে তারপর দেশের নেতা হয়ে বসে। ওরা শেখ মুজিব নয় যিনি আটাশ বছর পরে নেতৃত্বের শিরোপা পেয়ে পাওয়ারে এসেছিলেন।

টেলিভিশানের ক্বাজ হচ্ছে উদ্দীপনা, রোমহর্ষকতার ভেতর দিয়ে। ওখানে বাহন ব্যষ্টি তথা ব্যক্তির ইমেজ। এই কৌশল সাময়িক স্বার্থোদ্ধারের বড় উপায়।

বর্তমানে পৃথিবীময় অনুন্নত, সদ্যস্বাধীন বা প্রাক্তন উপনিবেশ দেশগুলোতে অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে, তার একটা বড় মিডিয়া বা বাহন টেলিভিশান।

এখন তো ক্যান্‌ড বা টিনের কৌটাবদ্ধ সামগ্রী আমদানি রপ্তানির যুগ। হালফিল বিদেশ থেকে খুব দ্রুত পাওয়া যায় কৌটাবদ্ধ তথ্য—ইনফরমেশান, কৌটাবদ্ধ Ideology বা ভাবধারা, কৌটাবদ্ধ অবসর-বিনোদনী। আইডিয়া, আদর্শ, এখন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্বে জাহাজে শুধু বই পত্রপত্রিকা আসত। তখন ভাবধারা যা আসত, তার শিকড় পুঁততে লাগত প্রচুর সময়। বিমান চালু হতে কিছু সময় ত্বরান্বিত হোলো। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রানিক্সের যুগে ভাবধারা নয় শুধু তথ্য এবং অবসর-বিনোদনী সামগ্রী পৃথিবীর চতুর্দিকে দুদ্দাড় ধেয়ে যায় এবং চাক্ষুষ জানান দেয়।

কোকোকোলা-ব্লুজিনস্ ট্রাঞ্জিস্টার-মার্কা সভ্যতার যে পচা-তলানি হালফিল এদেশের বিত্তবান সমাজের এক বড় অংশ গ্রাস করে বসে আছে, তার কারণ ম্যাসমিডিয়ার জুলুম।

অবিশ্যি দেশি মুৎসুদ্দিরা আবার উন্নত দেশের শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের মনস্তুষ্টির জন্যে তাদের হালচাল, খানাপিনার অনুকরণ করে। মায় লেবাস পর্যন্ত। আসলে এই শ্রেণীর লোকদের কোন জাতীয়তাবোধ থাকে না। মুনাফাই তাদের মুরশেদ বা পথপ্রদর্শক।

টেলিভিশানের মহিমা অপার। অপসংস্কৃতি ওই মিডিয়ার চাপে কি রকম ত্বরান্বিত হয়েছে, লক্ষ্য করেছো?

বর্তমানে স্বাধীন, একদা-উপনিবেশ দেশগুলোতে ইংলিশ স্কুল কি হারে না গজিয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। কিন্তু গজিয়েছে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নিজেদের আইডেনটিটি বা স্বাজাত্য ভুলে যাওয়ার এই এক পিচ্ছল সড়ক। 'আগডোম বাগডোম' জাতীয় দেশি ছড়া শেখার আগে এখন কচি ছেলেমেয়েরা 'হামটি ডামটি' শেখে। অথচ দেশি

বীজ, বিলেতি চারার মত আর কি করে হবে? তাই শিক্ষিকার 'মিল্ক' (দুধ) দিয়ে বাক্য রচনার ফরমাসে কচি ছাত্র জবাব দেয়, "মাই মাদার হ্যাজ টু মিল্ক" (আমার মায়ের দু'টি দুধ আছে)। শিক্ষার কর্ণধারদের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম তথা আল্লা-রসুলের নামে। তখন থেকেই ইংলিশ স্কুল গজাতে লাগল। বাঙলাদেশে একই চিত্র।

আরো মজার ব্যাপার, যে-সব পৃষ্ঠপোষকরা ছেলেমেয়েদের ইংলিশ স্কুলে পাঠায়, তারাই আবার সামাজিক প্রশ্নে ইসলামের প্রচন্ড সেবক হয়ে ওঠেন।

এই স্ববিরোধিতার অন্তঃস্রোত আরো জোরদার হয়েছে টেলিভিশানের মহিমায়। গণ-মাধ্যমের শক্তি খাটো করে দেখো না।

তুমি এত ঘরকুনো হয়েছ কেন?

তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও লেখক হিসেবে?

উপনিবেশে জাতিয়তাবাদী সংগ্রামের তোড়ে সাম্রাজ্যবাদের নাগ-বন্ধন শিথিল হতে লাগল। এদেশের সাম্রাজ্যবাদী একদা-রাজারা সদর দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খিড়কি দিয়ে ঢোকার পথ তারা আগে থেকেই পরিষ্কার করে রাখতে ভুলে যায়নি। বিদেশী পুঁজি ক্যাপিটাল এবং ভাষা ওদের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র হয়ে রইল।

তুমি যেন মনে করো না, আমি ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখার বিরোধী। আদৌ না। কিন্তু তার বয়স দেখবে না, মনস্তত্ত্বের সাধারণ নিয়ম মানবে না? এক সঙ্গে মাতৃভাষা, ইংরেজি, ধর্মভাষা—তিন ভাষার চাপে তো কচি নাগরিকের মগজ যে ছেলেবেলায়ই মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। যত না সয়, তার বেশি ভার মাথায় চাপালে যা ঘটে তা-ই ঘটছে। বয়স-অনুযায়ী, মেধা-অনুযায়ী মাতৃভাষার বাইরে আরো একটি বা দু'টি ভাষা শেখা অবশ্য কর্তব্য। তার জন্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নিয়ম মানবে না, এ কেমন কথা?

কথায় কথায় একটু দূরে এসেছি। মোদ্দা ব্যাপার, এযুগে প্রচার-বাহনকে উপেক্ষা করা অন্যায়। যদি আত্মহত্যা করতে চাও, আর কোন প্রশ্ন তুলব না।

কিন্তু চোখ মেলে দ্যাখো।

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জ্ঞানের ভান্ডারী রূপে একটা আভিজাত্য ছিল। এখন ওরা সংবাদপত্র, টেলিভিশানের কাছে পরাজিত। ওদের টেলিভিশানের কাছে ধর্না দিতে হয়, নচেৎ এলেমের মহিমা প্রকাশ পায় না।

সত্যিকার সমঝদারিতা আর বড় কথা নয়। কে কতখানি বুঝল তা এখন গৌণ। তুমি কতো জনের কাছে পৌঁছতে পারছো তাই এখন তোমার অহম বা 'ইগো'কে শান্তি দিতে পারে।

ঢাকা শহরে লাখলাখ টেলিভিশান সেট আছে। গড়ে পাঁচজন ধরলে, এক সন্ধ্যায় লাখ লাখ লোকের সামনে তোমার বক্তব্য উপস্থিত।

অবিশ্যি, এই জন্যে মাশুল দিতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জারিজুরি ভেঙ্গে গেছে। পূর্বে সাহিত্য শিল্পে ওদের রায় মানুষ নতজানু-সমীহার সঙ্গে মেনে নিত। এখন ওদের আর সেদিন নেই।

প্লেটো সাহেব এ্যাকাডেমি শব্দটাকে মহান মর্যাদা দিয়ে গেছেন। এখন এ্যকাডেমি মানে ফসিল, জীবাশ্ম।

দর্শন-ইতিহাস, বিজ্ঞান যা কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের গুহায় ঢোকে প্রস্তরীভূত বা বিকৃত রূপে—এমন রূপই নেয় যে চেনা দায়, তুমি কোন গোলক ধাঁধায় ঢুকেছ।

সম্প্রতি সাহিত্যের আলোচনায় ওখানে মার্কস প্রবেশ করেছেন। তারও বিকৃতি ঘটতে বেশি দেরি হয়নি। মার্কসবাদ ত পান্থজনের সখা। ওখানে উড়ন্ত পাখি শিকার করতে হয়। অর্থাৎ চলন্ত জিনিস নিয়ে কারবার। কিন্তু এখন এ্যাকাডেমির অচলায়তনের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই অতি-সরলিকরণে ওখানে ডক্টর মহোদয়েরা সিদ্ধহস্ত।

তাই রায় শোনা যায়ঃ

রবীন্দ্রনাথ? ফিউডাল।

শরৎচন্দ্র? ফিউডাল।

বিদ্যাসাগর? প্রতিক্রিয়াশীল।

লালন ফকির? নাকচ।

আসলে সাহিত্য-সমালোচনায় এই জাতীয় পন্ডিতরা পাতিবুর্জোয়া সুলভ অহমিকামুক্ত হতে পারেন না। নিরক্ষর এই দেশ। অন্ধের দেশে কাণা-ও সম্রাট হয়ে যায়। পন্ডিতম্মন্যতা সহজেই অনেককে পেয়ে বসে। জাঁ পল সার্ত্রের একটি উক্তি এঁরা স্মরণ করলে পারেন, "পল ভার্লেন ওয়াজ এ পেটি-বুর্জোয়া বাট অল পেটি বুর্জোয়া আর নট পল ভার্লেন।" পল ভার্লেন ছিলেন পেটি-বুর্জোয়া। কিন্তু সব পেটি বুর্জোয়া পল ভার্লেন নয়।

আসল কথা কি, বদহজম বিদেশি ভাবধারা এদের উদগারে বেরোয়। উদগার তো? ফলে, তার দুর্গন্ধ দূরে সরিয়ে রাখা দায়।

ওদের রাজনীতির মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। স্বদেশের মাটি তাঁরা পায়ের নীচে থাকা জরুরৎ মনে করেন না। কোনো বিদেশি নেতা নস্যি নিলে এরা হাঁচেন।

আসল কথা পন্ডিতদের এই শ্রেণীর পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং অতীতে আর প্রয়োজন কোথায়? অতীত-বর্তামানের সম্পর্ক তারা গুলিয়ে ফেলেন। বোঝা গেল, মহোদয়দের বসার জন্যে পাছা (শরীফ পাড়ার অভিজাত বিদ্বানদের হয়—নিতম্ব) লাগে না।

রুশ ডেমোক্র্যাট আলেকজান্ডার হার্জেনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, "উই আর নট্ দি ডকটর উই আর দি ডিজিজ।" আমরা বৈদ্য নই, আমরা নিজেরাই ব্যাধি।

আরো শোনো, ম্যাসমিডিয়া, সামাজিক আভ্যন্তরীণ তাগিদে গণ-মাধ্যমের উদয় ঘটে। অতঃপর, বন্যাজালের মত তার স্রোতগতি কখনও বাঁধ ভাঙে, ঘরদোর ডোবায়, মানুষের অস্তিত্ব, আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ধরে টান দেয় এবং হেঁচকা টান।

ব্যাপারটা জৈবিক বা অর্গানিক তা অনেকে বুঝে উঠতে পারে না।

নিরন্তর ঝটকা কোন দিকে ধাইবে ঠাওর পাওয়া দায়।

মানুষ তো এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখে।

একই সময়ে নানা বিন্দু থেকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ অমন ভাবে দেখাই জীবনকে

জানার বিশিষ্ট উপায়। তাছাড়া, হেতু ও পরিণাম—কজ এ্যান্ড এফেক্ট্—সম্পর্কে আর পূর্বের মত সরল রেখায় দেখা হয় না। অনেকে ভুলে যায়, যে-পৃথিবীতে তাদের বাস তা-ও পরিপূর্ণ গোল নয়, তার উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। অর্থাৎ বক্র। অথচ তুমি যদি সোজা পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও, পদে পদে প্রতারিত হবে। তখন দৃশ্যমান রূপ-. এ্যাপিয়ারেন্স মনে হবে রিয়ালিটি বা বাস্তব।

ইতিহাসে কতো ঝড়ের উৎপত্তি যে এই মরীচিকা বা দৃষ্টিভ্রম থেকে তার ইয়ত্তা নেই। মরীচিকার পেছনে ছুটলে পথিকের যে-দৃশ্য ঘটে, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে তার ব্যত্যয় হয় না।

এদেশে পন্ডিতেরা চিন্তা করে। অধিকাংশ স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের ব্যাপার।

তুমি কিন্তু জেনে রাখো, বেচারা গোবিন্দ দাস, আদৌ স্বভাব-কবি ছিলেন না। পরিশীলিত মনের মানুষ। তাঁর কাব্যে বহু পরিচয় আছে। অথচ, অপবাদটা বেচারার নামের সঙ্গে লেপ্টে রইল। আমার মনে হয় এদেশের যারা কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি করে তাদের ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের মত অলৌকিক শক্তিধারী জীব রূপে ধরে নেওয়া হয়। আর হেন শক্তির উৎস ঈশ্বর। ক্ষমতা স্বভাবজাত। স্বভাব-কবির ধারণা সেদিক থেকেও আসা স্বাভাবিক।

বাদ দাও ওসব কথা।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পন্ডিতকুল চিন্তা করে, কিন্তু হাতিয়ারের কথা ভাবে না। স্বভাব-পন্ডিত তো। চিন্তা জিনিসটা স্বয়ং হাতিয়ার তা বহুজনের বোধগম্য নয়। ব্যবহৃত হাতিয়ার খানা কেমন তা-ও ভেবে দেখে না। মাটি খুঁড়ছে পন্ডিত। কিন্তু চেয়ে দেখে না, ওটা খোন্তা, শাবল, না কোদাল। কোদাল তো শাবল নয়। তখন মাটি খোঁড়ার রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি সব বদলে যায়।

হিন্দু পুরাণ-অনুযায়ী, বাসুকী সাপের মাথায় অবস্থিত পৃথিবী। সাপের এদিক-ওদিক হেলাদোলা পৃথিবীরও এদিক-ওদিক পাশ ফেরার চেষ্টা। অর্থাৎ ভূমিকম্প। বর্তমান যুগে বাসুকী কল্পনা হয়ে গেছে। গ্যাসের ফলে পৃথিবীর জঠরে অগ্নিমান্দ্য ঘটে, গ্যাস নিষ্কাশনপ্রার্থী তখন।

এই সিদ্ধান্তে আধুনিক মানুষ পৌঁছল কি ভাবে?

হাতিয়ার বদলে গেছে। চিন্তার পদ্ধতি এখন ভিন্ন সড়কের যাত্রী। বৈজ্ঞানকেরা গবেষণা পরীক্ষাদির পূর্বে সেই কথাটা ভাবে। আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস উচ্চারণ করেছিলেন, "লাইফ আন্‌একজামিন্ড ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং.... অপরীক্ষিত জীবন নিয়ে বাঁচার কোন সার্থকতা নেই" তা এক ধরণের হাতিয়ারেরই ইঙ্গিত। হাতিয়ারের বিবর্তন ঘটে। গোবিন্দ দাসদের (স্বর্গীয় কবির নিকট এখন ক্ষমাপ্রার্থনাসহ) নিকট এমন বাক্য বাতিল হয়ে থাকে।

ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব সওয়া শ' বছর পূর্বের ব্যাপার। চিন্তার রাজ্যে এক অগ্ন্যুৎপাত। জীব-জগৎ বিকাশ-পথে খোলস ছেড়ে ছেড়েই এগিয়েছে। অতীতের সঙ্গে না মিলিয়ে কোন কিছুর স্বরূপ অনুধাবন সম্ভব নয়। অথচ, চিন্তা করতে গিয়ে ক'জনই বা অতীতকে পটভূমিতে টেনে আনে?

বাছুরটা এঁড়ে না বকনা, তা লেজ তুলেই পরীক্ষা করা যায়। বহু পন্ডিত লেজে হাত দিতেই নারাজ। আলসেমির জন্য নয়, তার মানস-ছাঁচেই ব্যাপারটা নেই।

সক্রেটিসের খেদোক্তি কি সবার কানে যায়?

অনেকে পরীক্ষা দূরের কথা, জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলাই অসংগত মনে করে। বরং ভেড়ার জোয়ারে স্বচ্ছন্দে ভেসে যায়। নিষেধের সঙ্গে জুজুর ভয় লেপ্টানো থাকে। বিবর্তনবাদে তেমন জুজু নেই। কিন্তু মন আগে থেকেই এমন ভাবে তৈরি হয়ে গেছে, তখন অমন পদ্ধতিই তাদের কাছে অবান্তর।

এই পৃথিবী যে নিরন্তর পরিবর্তনের ঘূর্ণিপুঞ্জ, তা অনেকে উপলব্ধি করে না। ফলে স্থান-কাল দুই-ই স্থানু-অনড় মনে হয় তাদের নিকট।

তুমি আমার লম্বা ভূমিকার জন্যে হয়ত বিরক্ত হচ্ছে।

থোড়া রোসো, বন্ধু।

আমার সাফাই গাইতে দাও।

জানো তো বৃদ্ধ কালে শুক্র এবং স্মৃতি উভয় ধারণই কষ্টকর। তোমার স্মৃতিশক্তি প্রখর আছে ব'লে মনে হয় না।

তোমার কাল-সচেতনতার বহর দেখে বুঝে ফেলেছি। তাই তো এই কথাবতারণা।

তোমার মত অনেকেই অনড় স্থান এবং কালের ব্যাপারি। বালক-কালের জামা ছিঁড়ে বা ফেটেফুটে যায়, দেহের স্বাভাবিক শ্রী নষ্ট হয় এবং অবয়বের কি ছাঁদ হয়, তা বয়ান নিষ্প্রয়োজন।

মানস-জগতে একই ব্যাপার দাঁড়ায়।

মেশিনগানের মুখে তাই অনেকে তীরধনু নিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। পরিণাম অবশ্য পরাজয়। কিন্তু অর্ন্তজগতের মরীচিকা তাদের বিরাট আশ্রয়-সান্ত্বনা। হৃদ-রোগী যদি মনে মনে পালোয়ান হতে চায়, কেই বা বাধা দিতে পারে? ইতিহাসে এমন পরিহাস দেখে মাঝে মাঝে মানুষে বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে পড়ে। পরিবর্তন তাদের চোখে সেঁধোয় না, নিজেদের হালৎ দেখেও না।

অথচ বিশ শতককের গোড়া থেকে পৃথিবীময় এত ওলট-পালট শুরু হলো যে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ এলো বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে তারা এমন জায়গায় পৌঁছলেন, তখন বস্তু-ধারণা আর পূর্বের মত নিরেট রইল না। দেখা গেল, তা কখনও তরঙ্গ কখনও কণিকা বা উভয়ের সমাহার। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি এবং তেজস্ক্রিয়া—রেডিয়েশন আবিষ্কারের ফলে স্থান এবং কালের চিরাচরিত ধারণার ভিত নড়ে গেল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক সোডি এবং রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয়ার মূল সূত্র আবিষ্কার করে দেখলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম শুধু কারণিক (কজাল, হেতু) পরিণাম নয়। আইনস্টাইন ওই দুই আবিষ্কার তাঁর আপেক্ষিক-তত্ত্বে সমন্বয় ঘটান। জগৎকে দেখার সনাতন তিন মাত্রার জায়গায় যোগ হোল চতুর্থ মাত্রা : স্থান-কাল-প্রবাহ। আইনস্টাইনের ভাষায় স্পেস-টাইম কনটিনিউয়াম। এই প্রবাহ এক রকমের টাইম। কিন্তু সমস্ত টাইম আবার কালের প্রত্যেক মুহূর্তে নিহিত। বড় কঠিন ধারণা। সহজে কল্পনায় ঠাঁই দেওয়া কষ্টসাধ্য। স্থান এবং কালের প্রাচীন উপন্যাসে নায়কের জন্ম—যৌবন—জরা। মার্শেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস প্রমুখ প্রতিভাবান শিল্পীরা অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটেই কিন্তু উপন্যাস রচনায় এগিয়ে গেলেন। প্রুস্ত বিরাট-ভাবে গোটা সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু প্রকান্ড ক্যানভাস মনে হবে যেন স্থিরচিত্র। গতি যদি

কিছু থাকে তা বৃত্তাকার, চক্রাকার এবং তার তাৎপর্য বোঝা যায় পুনরাবৃত্তিতে।

জয়েসের উপন্যাস 'ইউলিসিস' মাত্র একদিনের ঘটনা। কিন্তু তা সময় সম্পর্কে নতুন ধারণার পর্দায় ফেলা এবং বৃহৎ আয়তনে। উপন্যাসের চরিত্রদল যেন কালের সড়কের উপর লেপ্টে আছেন। এই অবস্থা থেকেই তাদের পারিপার্শ্বিক আচরণ, অন্যান্য ঘটনা তাৎপর্য লাভ করে।

বস্তুবিশ্বের আর চিরাচরিত আদি ঠায়ে থাকতে পারল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছর মানসিক বিপ্লবের এক মন্থিত ময়দান। কয়েকটা ঘটনা মাত্র তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বছর ম্যাক্স প্ল্যাংকের—"কোয়ান্টাম তত্ত্ব" প্রকাশিত হয়। একই বছরে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের "নিউ হন্ট রপ্রিটেশান অফ ড্রিমস" বা ভাষ্য, এবং টমাস মানের উপন্যাস—"বাডেনবুক্স" ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিন বছর পরে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান-সফর। একই বছরে বেরোয় ম্যাকসিম গোর্কির 'দি লোয়ার ডেপথ', 'পাতালপুরী' নাটক। রিয়্যালিজমের আর এক অভাবনীয় তিক্ত সংযোজনা।

তখন থেকে গোর্কির যাযাবর দল বিশ্বজয়ে অগ্রসর হয়। এদেশে পরবর্তীকালেশরৎচন্দ্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নজরুল প্রমুখের রচনায় তার প্রতিধ্বনি। শ্রীকান্ত, বেদে,বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী ইত্যাদি স্মরণীয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় আইনস্টাইনের "থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"—আপেক্ষিক তত্ত্ব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান নায়করূপে অভিনন্দিত হন।

ওই বছরে এক রুশ ভদ্রলোক, ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ—এক বই প্রকাশ করেন এন. লেনিন—এই ছদ্মনামে। বইয়ের নাম "টু ট্যাকটিক্স ফর সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ইন এ ডেমোক্রেটিক রেভল্যুশান—গণতান্ত্রিকবিপ্লবে সামাজিক গণতন্ত্রের জন্যে দুই কৌশল।

তিন বছর পর (১৯০৮) রাইনার মারিয়া রিল্কের নতুন কবিতার দ্বিতীয় খন্ড প্রকাতি হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নীল্স বোহ্রকৃত এ্যাটমের কাঠামো তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ।

পৃথিবীকে আরো চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর এক সামাজিক বিপ্লবের বিস্ময়ের জন্যে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। কাল মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির সতর বছর পূর্বে। দেখা গেল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সতর বছর পরে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে, রুশ সর্বহারাদের বিপ্লবের আঁতুড়-ঘরে।

নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছেন সেই ছদ্মনামা ভদ্রলোক যিনি বারো বছর আগে 'টু ট্যাকটিক্স ফর ডেমোক্রেসি ইন এ ডেমোক্রেটিক রিভল্যুশ্যান' পুস্তক লিখেছিলেন। নিজের নামের কাছে তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। লেনিন নামেই এখন তিনি বিশ্বে পরিচিত এবং বহুজনের শিরঃপীড়া।

শৃন্বন্তু, বয়স্য। শোন বন্ধু, শোনো।

তালিকা বহু দেওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে মার্কস-ফ্রয়েড-আইনস্টাইন—এই ত্রিহস্পর্শে পৃথিবীর ধ্যানধারণা ডিগবাজি কেতে লাগল।

তুমি এত তলিয়ে দ্যাখো বা ভাবো কিনা, আমার সন্দেহ আছে।

লিখেছো ত রাশ-রাশ। কিন্তু দেখা যায়, জীবন-সম্পর্কে আজও তোমার পজিটিভ ধারণা নেই। আর থাকলেও তার তেজ নদারাৎ। তোমার জগচ্চিত্র অস্পষ্ট, রংছুট।

যুক্তির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ঈমানের উপরেই সত্যিকার শিল্প সাহিত্য গড়ে ওঠে। যুক্তিই মুক্তি। অনেক সময় ঈমান হয়ত নিকট ভবিষ্যতে পরিবেশের কোন সুরাহা করে না। কিন্তু পেছনে সত্যিকার সততা থাকলে শিল্পের কিছু মঙ্গল হয়। টি.এস. এলিয়টের কথা ভাবো। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে জাহির করলেন, তিনি রাজনৈতিক চিন্তায় রাজতন্ত্রী মনার্কিষ্ট, ধর্মে ক্যাথলিক, রচনায় ধ্রুপদী অর্থাৎ ক্লাসিসিষ্ট। এসব তত্ত্ব তার কাব্যশক্তির কোন ক্ষতি করেনি। এলিয়ট কিন্তু আয়রনিষ্ট বা শ্লেষবাদী। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নেতিমূলক। 'ওয়েষ্ট ল্যান্ড' নেতিমূলক, পোড়ো জমির বাইরে তিনি যেতে পারেননি। এমন পজিশান থেকে কাব্যশিল্প হয়ত উৎরোতে পারে, কিন্তু তা জীবন-শিল্প হয়ে ওঠে না।

দান্তে, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহৎ শিল্পীরা জাতির জীবনে আলো বাতাসের মত প্রাকৃতিক সহচর হয়ে যান। এলিয়ট তা নন। অপূর্ণতার এই উপলব্ধি তাকে হয়ত শেষে ঈমানের প্রশ্নে উৎপীড়িত করেছিল। তাই বিষ্ণু দে-র ভাষায়, করুণ কালবিরুদ্ধ রাজনীতির গুহায় এলিয়ট অবসিত হন।

এখন নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো, তুমি একটি বেঈমান। পরোক্ষ পরিবেশ-সচেতনতা এবং কাল-সচেতনতা এক জিনিস নয়। পরিবেশ অনেক সময় দুঃসহ বর্তমানের গর্তে ফেলে রাখতে পারে। তুমি যদি সেখানেই বুঁদ হয়ে যাও, কালের বৃহত্তর পটভূমি তোমার চোখ এড়িয়ে যেতে বাধ্য। মুহূর্তিক প্রত্যক্ষের বাইরেও তো জগৎ আছে, কাল আছে। অর্থাৎ বর্তমানের পাঁকে পড়ে তুমি ভবিষ্যতের ছবি আর দেখো না। আর ভবিষ্যতে কোথায় যাবে তা না জানলে, বর্তমান কি তার সকল করণীয় বক্তব্যসহ তোমার কাছে ধরা দেবে?

আইনস্টাইনের কালপ্রবাহ বিজ্ঞানের তত্ত্বে যাই হোক, শিল্পীর কাছেও অমূলক নয়। স্মৃতি অতীতের ব্যাপার, আশা ভবিষ্যতের ব্যাপার। বর্তমানে তুমি তো আছোই।

শিল্পীর কাজও তো স্মৃতি, আশা বর্তমানকে নিয়ে। কালের প্রবাহ শিল্পীর চেতনায় ধরা পড়বে না কেন?

অবশ্য, ব্যঙ্গ, শ্লেষ শিল্পীর আসরে ম্লেচ্ছ না হলেও মহৎ শিল্পের পাশে জায়গা পায় না।

এলিয়টের মনে সত্যিই এসব প্রশ্ন উঠেছিল কি না,আমার জানা নেই। তবে আন্দাজে ধারণা করা যায়। যেহেতু ঈমান—ফেইথ নিয়ে তিনি প্রচন্ড মাথা তো ঘামিয়েছেন। তার বহু প্রবন্ধে তার সাক্ষাৎ মেলে। তবু শ্লেষবাদীরা মহৎ শিল্পী নয়, এলিয়টের এমন ধারণা অমূলক। পরিবেশের চাপে শিল্পী স্ফীতগ্রিবা গান নাও গাইতে পারেন। আনাতোল ফ্রাঁস তার পরম সাক্ষী। কিন্তু তিনি মহৎ শিল্পী নন, কেউ বলবে না।

একদম নির্জন স্তব্ধতা আর যাই হোক, আত্মসর্বস্ব সন্ন্যাসী, নিউরোটিক বা বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গীত হতে পারে। তাও সন্দেহজনক। প্রৌঢ়কালে বিবক্ষা পেয়ে বসে। বক্‌বক্ করে মানুষ তখন মজা পায়, যেহেতু আর কিছু করার থাকে না। তোমার আমার একই বয়স। একলগ্নে জন্ম। তুমি লক্ষ্য করছো, আমি বড় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাইছি। তুমি বলেই এত

স্বাধীনতা নিচ্ছি। সুবাদ বহুৎ বহুৎ আদিম।

কাল-প্রশ্নের কাছে আবার ফিরে যাওয়া যাক।

কাল মৃত্যু নয় এখানে ঃ টাইম।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে কালের ধারণা বদলাতে থাকে। জড়বাদী দার্শনিকের কাছে সময় ছিল বিষয়গত অর্থাৎ অবজেকটিভ, ভাববাদীর নিকট বিষয়িগত বা সাবজেকটিভ। সেই অবস্থা আর রইল না। অনেকে এই ব্যাপারে নির্বিকার। অপরের অজ্ঞতা তবু তেমন দূষণীয় নয়। কিন্তু কবিকুল, সাহিত্যিক, নিঃস্পৃহ হয় কীভাবে? গোবিন্দ দাস-মার্কা কবির সংখ্যা তাই শ'য়ে শ'য়ে মেলে। এমন তো হওয়া উচিত নয়, কস্মিনকালেও। অন্ধভাবে এখন সাহিত্যের ধর্মপালন ত দূরের কথা, সাধারণ ধর্মপালনও মঙ্গলকর নয়। ধর্ম এবং সাহিত্য তখন দুই-ই হয়ে পড়ে কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার চোরাবালি।

পশ্চিমবঙ্গেও এখন তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত মেলে। ওই দেশে তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে এমন ব্যাপার চোখে পড়ত না। অবশ্য বিভিন্ন সোশ্যাল বা সামাজিক ফোর্সের গাঁজানি (ফারমেনটেশন) যখন শুরু হয় পরিবেশের চাপে, তখন ক্লেদ, পাঁক তলা থেকে উপরে ভেসে ওঠে। ওই বঙ্গেও চিত্র স্বতন্ত্র কিছু নয়। অবিভক্ত বঙ্গে পরশুরাম অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজশেখর বসু তার বিখ্যাত 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প লিখেছিলেন ষাট বছর পূর্বে। তা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এক জেহাদ। এখন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সাঁই বাবার ভক্তদের কীর্তন শোনা যায়।

বুদ্ধিবিরোধী, যুক্তিবিরোধী মানসিক প্রবণতার সামাজিক কারণ বহু। সচেতন না হলে তুমি সেই খোন্দলে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এই খোন্দলে পড়ার মানস-আবহও শিল্পী সাহিত্যিক রচনা করতে পারে।

বর্তমানে অনুন্নত দেশের দশা সাম্রাজ্যবাদের থাবার নীচে আরো কাহিল। অপসংস্কৃতির ড্যাশ বিদেশ থেকে বড় সূক্ষ্ম ধারায় আসে, টের পাওয়া দায়। যুগযুগান্তরের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারীরা আর পূর্বের কায়দায় রক্ত মোক্ষণ করতে পারে না। তাই দেশি এজেন্টদের সাহায্য নেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিশ এদেশে জমিদার প্রথা প্রবর্তন করেছিল যে-মতলবে, তারই সাংস্কৃতিক প্রতিক্ষেপ এখন নানাভাবে দেখা যায়।

একটা কৌশল হালফিল তুমি দেখেছো।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশ হঠাৎ প্রাচ্যের ধর্মগুলোর প্রতি ভয়ানক ভক্তিমুখর। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রশংসায় নতজানু। মধ্যপ্রাচ্যের আমদানি তেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ এখন স্পষ্ট। হিন্দু ধর্মে ওদের মতি আরো বেশি প্রকট। "কৃষ্ণচৈতন্য—কৃষ্ণ-কনসাসনেস" আন্দোলন লক্ষ্য করে থাকবে। পৃথিবীময় ওদের শাখা-প্রশাখার বিস্তার। শ্বেত রঙ, নধর-তনু মার্কিন ভক্ত ন্যাড়া-মাথা, পরনের গেরুয়া, যেন কৃষ্ণসখা বলরাম। পশ্চিমি যন্ত্রসভ্যতার চোলাই এই সব ভক্তের দল অনুন্নত দেশে আসে কৃষ্ণপ্রেমচৈতন্য বিস্তারে। ওরা নিজেদের দেশে আবদ্ধ থাকে না কেন? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গত একশ' বছর দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরিয় দ্বীপপুঞ্জ, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক মেরুদন্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, নিজেদের ঘরে সেইখানে প্রেম বিতরণে ওরা উদ্যোগী হয় না কেন?

ওরা ভিয়েতনামে যায় না, লেবাননে যায় না, ইজরাইলে যায় না কেন প্রেমের পাইপ নিয়ে? ফাঁকিটা সেখানেই ধরতে পারবে।

পূর্বে উপনিবেশ-বিস্তারে ওরা বাইবেল তথা পাদ্রি পাঠাত, পরে বুলেট। এখন ওরা মার্কিন দেশ থেকে আর পাদ্রি পাঠায় না। পাঠায় মার্কিন সন্ন্যাসী। কিন্তু অনুন্নত দেশের ছাঁচ তৈরি। বর্তমান নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি মুৎসুদ্দিদের গাঁটছড়া বাঁধা দেখা যায়, তারি হুবহু প্রতিচ্ছায়া আধ্যাত্মিক জগতে। এখনও কিন্তু ওরা বুলেট যোগায়। তবে নিজেরা আর পূর্বের মত ব্যবহার করে না। ওরা বুলেট সরবরাহ করে অনুন্নত দেশের এজেন্ট স্যাঙাতদের হাতে।

এদেশের গোবিন্দ দাস সাহিত্যিকরা জানিতে অজানিতে ওদের খপ্পরে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে এক সাহিত্যিককে দেখলাম রাধাকৃষ্ণের কাহিনী—'সনাতন বিলকুল' পরিবেশন করেছেন আধুনিক ভাষায়। উত্তম মুদ্রণ, সুশোভন জ্যাকেট গ্রন্থ। তিনি জানতেন না কার্টার (প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) প্রেম এবং কৃষ্ণ-প্রেমের গাঁটছড়া একই রশি দিয়ে বাঁধা।

রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে বই লিখতে আপত্তি নেই। তা আধুনিক চেতনার কোন দিশারি হবে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন ঃ "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ।" এই গ্রন্থ মনীষার আলোক-বর্তিকা। কিন্তু যেখানে প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন ভক্তি ছাড়া আর কিছু মেলে না, তা অন্ধতার পিছল সড়ক হয়ে দাঁড়ায়। কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার মারীবাষ্প নার্ভে-মস্তিষ্কে সেই পথে ঢোকে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা হয়ত এতদিনে উপলব্ধি করেছেন যে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে "মাস্তান"দের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে অত্রস্থলে সাহিত্যিক মাস্তানদের আর্বিভাব ঘটে। গুন্ডা সরীসৃপের জন্যে মানসিক ঝোপ-জঙ্গল, বিবর ওৎ পাতার জন্যে, আগেই তৈরি হয়ে যায়। কল্লোল-যুগীয় তিরিশের বিদ্রোহী কবিদের মানসব্রজনা পঞ্চাশ বৎসর পরে আজ নিরাসক্ত পর্যালোচনা কঠিন নয়।

স্বর্গীয় নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া এক যুগের মহাবিদ্রোহীদের অধিকাংশ পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়ার মোসাহেবে পরিণত হন। নিজেদের পতাকা আর উন্নত রাখতে পারেন নি যুগের উন্মোচন-পথে। "সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর".... রবে যারা হাঁক মেরেছিলেন, তাদের অন্যতম বুদ্ধদেব বসু শেষে রবীন্দ্রনাথেই "সব পেয়েছির দেশ" লাভ করেন।

অনুন্নত দেশে Sex (যৌন শব্দের জায়গায় আমি 'কন্দর্পনা' ব্যবহার করছি, সকলে ভেবে দেখবেন) এই ট্যাবু তৎকালীন কল্লোল যুগের বিদ্রোহীরা ভাঙতে এগিয়েছিলেন। 'ইন্ডিভিজুয়েশান' বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় তাদের দান শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু রোমান্টিক মোড়কে তনু ঢেকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন হাস্যকর, মধ্যবিত্ত-সুলভ তাঁদের বিরোধিতার পরিণামও তদ্রুপ। দম্ভ-প্রদর্শনেই সব পর্যবসিত, দংশনে নয়।

স্বর্গীয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কন্দর্পনা বিষয়বস্তু করে (বেদে, টুটাফুটা ইত্যাদি) সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। শেষে তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁর সমাপ্তি। তিনি শেষে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে নির্বাণ লাভ করেন। বিবর্তনের ধর্ম অবিশ্যি লেখক কর্তৃক যথা-পালিত। হিন্দু পুরাণ এবং নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সায় আছে ঃ "মানুষ ঈশ্বর পূজার পূর্বে লিঙ্গ-

পূজা করিত।" মরমী ভক্তিবাদ প্রতিক্রিয়ার হাত জোরদার করে, স্বর্গীয় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত জানতেন না।

এই উপমহাদেশময় সমাজ-তান্ডবের ঢক্কা-বাদকরূপেই এমন মানস-আবহ রচনার কারিগরদের পরিচয় আজ স্পষ্ট।

একদা-বিদ্রোহীদের কাছে বাছ-বিচারও তেমন ছিল না।

উপনিবেশে সাহিত্যিক-দাসত্বের খোঁয়ারি কাটতে সময় যায়।

কল্লোল-যুগের কল্যাণে, ন্যুট হ্যামসুনের "হাংগার-বুভুক্ষা" উপন্যাসখানা তখন সমাদর লাভ করে। মাত্র দুই দশক পরে হ্যামসুন হন হিটলার-পূজারী। টমাস মান গভীর পরিতাপের সঙ্গে লিখেছেন যে তাঁদের এমন এক সতীর্থ ফ্যাসিস্ট হয়ে যাবেন, ভাবা দায়। লেনিন কিন্তু ওই বই পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, যে লোক ক্ষুধার প্রশস্তি গাইতে পারে সে তো ফ্যাসিস্ট। রাজনৈতিক নেতার দূরদৃষ্টি ছিল। কিন্তু এদেশে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন "বিদ্রোহীদের" চেতনায় তা ধরা পড়েনি। তাঁদের জীবনের প্রতি কৌতূহল শেষে মরমী ধোঁয়ার ভিতর প্রশান্তি লাভ করেছিল।

আলডুস হাক্সলি ইংলন্ডে মাঝবয়স থেকেই গাজায় চক্ষুহীন হন। তাঁর "আইলেস ইন গাজা" স্মরণীয়। উপন্যাসে গাজা যদিও একটির শহরের নাম। মোদ্দা ব্যাপার—সৌন্দর্যের সাধনা সচেতন-ভাবে না করলে তা বর্বরতা, নৃশংসতা—এক বাক্যে, অমানবিকতার আগমনী হতে পারে।

বাঙলাদেশের অধিবাসী তুমি। তোমাকে ওই কথাটা কি ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে?

তোমার থেৎলানো গায়ের চামড়ায় চাবুকের বহু দাগ রয়েছে। তা কি এত জলদি শুকিয়ে যেতে পারে?

পারো কি তুমি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভুলে যেতে?

পাকিস্তান হওয়ার পর, যদিও সূত্র পূর্বের, চব্বিশ বছর ধরে চলল উত্তরাধিকারের লড়াই। শাসকশ্রেণী এবং তাদের পূর্ব পাকিস্তানি এজেন্টরা সাচ্চা উত্তরাধিকারকে ঝুটা প্রতিপন্ন করার জন্যে কম সচেষ্ট ছিল না।

তারা কখনও টান দিত ভাষা নিয়ে, কখনও ধর্ম ধরে। হ্যাঁ, ধর্ম। ফিরোজ খান নুন নামক এক গভর্নর ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি হাঁকফুকার ঘোষণা করলেন "বাঙালি মুসলমানের খৎনা হয় না।" তাকে চেপে ধরলে তিনি প্রাইভেটে নাকি বলেন যে তার স্ত্রী তাকে এই তথ্য যুগিয়েছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম ভিকি নুন, যার নামে বর্তমান "ভিখারুন নেসা গার্লস্ স্কুল।" এই স্কুলের নামটা মহীয়সী কোন বাঙালী রমণীর নামে এখনই পরিবর্তন করা সকলের কর্তব্য।

দাসত্বের এমন চিহ্ন কারো বরদাস্ত করা উচিৎ নয়।

বিদেশি ওই ইটালিয় মহিলা আর যা-ই হন—মহীয়সী ছিলেন না, যদিও গভর্নরের স্ত্রী রূপে তার শয্যামূল্য থাকতে পারে।

ইটালিয় রোড করপোরেশন সংস্থার চেয়ারম্যান ছিল কাউন্ট কাম্পানেল। ভদ্রলোক আবার "ভিকি নুনের" বন্ধু। সেই সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা তৈরীর ঠিকাদারি ইটালিয় রোড

করপোরেশনকে দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারদের মুখে যা থুথু স্বরূপ। যেন রাস্তা তৈরি করার মত ইঞ্জিনিয়ারও তখন এদেশে ছিল না।

পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর মানসিক দেউলিয়াপনা প্রচন্ড-ভাবে প্রকট হয়ে উঠল রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর। তখনও স্থানীয় এদেশি অনুচর পাওয়া গেল সমর্থনের কীর্তন গাইতে।

চব্বিশ বছর ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরাল উত্তাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল বৈকি।

তখন এই দেশে এক শ্রেণীর কবি কি সৌন্দর্যের চর্চায় কবিতা লেখেনি?

এক শ্রেণীর প্রবন্ধকার কি প্রবন্ধ লেখেনি মনীষার প্রদীপ রূপে?

অনেক শিল্পী কি ছবি আঁকেননি?

সবাই সৌন্দর্যের সাধক, বিশুদ্ধ চৈতন্যের পরিবেশক। সংবাদপত্রে অন্যান্য প্রচার বাহনে সবাই খ্যাতনামা।

তাদের অনেকের সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি??????

তিরিশ লাখ মানুষের লাশ, ঈমানদার বুদ্ধিজীবিদের নির্মম প্রাণঘাত।

তাদের অনেকের জ্ঞানচর্চা, সৌন্দর্য-সাধনার ফলশ্রুতি???

ধর্ষিতা, মা-বোনেরা অসহ্য আর্তনাদ, জনক-জননীর সম্মুখে কন্যার বেইজ্জতি-লব্ধ মূক-স্তব্ধতা, নিঃশব্দ ফরিয়াদ—।

তাঁদের সৌন্দর্য-সাধনা তথা প্রাণদাত্রী চেতনা সৃষ্টির পরণাম???

দু'কোটির বেশি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আবার আদিম যুগের যাযাবর—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঝোপ-জংগলে এক ফালি নিরাপদ ঠাঁই-সন্ধানে হন্যে, সদা-সন্ত্রস্ত ইঁদুরের প্রতিবিম্ব।

গুন্ডা—গুপ্ত আততায়ী রাজাকার আলবদরের খুনীদের নিঃশঙ্ক বিচরণের উপযোগী অন্ধকারের ছায়া এই সৌন্দর্য-সাধকের দল দেশের মানস-আবহে দিনের পর দিন কি তৈরি করে রাখেন নি?

তারা আজ অস্বীকার করতে পারেন?

তাই বলছিলাম, বন্ধু, সৌন্দর্যের সাধনা সচেতনভাবে না করলে তা বর্বরতা, নৃশংসতা—এক বাক্যে অমানবিকতার আগমনী, প্রস্তুতি-ভূমিকা হতে পারে।

নৈতিকতার প্রশ্ন তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে চিরকাল জড়িত।

মানস-আবহ থেকে মানবিকতা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে রাখলে, শূয়োরের গঁৎ-গাঁতানিও কাব্য-সাহিত্য হয়ে উঠত এবং দারেট, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিত।

বাঙালি মুসলমানের বয়স আট শ' বছর হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী গোলামির জিঞ্জির তাদের গলায়। এমন দাস-কূলের প্রত্যাশার আকাশ তো দিকচক্রবাল-হীন হতে পারে না। তাই পাকিস্তানি শাসকদের নিকট এদেশি সৌন্দর্য-সাধকেরা বড় স্বল্পমূল্যে বিক্রি হোত। কয়েকটা বাড়তি পাৎলুন, জ্যাকেট, মাঝে মাঝে বিদেশি ট্যুর, কিছু "পশ্", হোটেলে পশ্‌বার মত

পকেটের তাগদ, ঈষৎ আর্থিক নিরাপত্তা। এই তো ওদের দাম!

পুরুষানুক্রম গোলামের প্রত্যাশা গগনচুম্বী হবে কেন?

"দরিদ্রের স্বপ্নেও দীনতা থাকে।" কথাটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

উত্তরাধিকারের সংগ্রামে ওরা সাচ্চা না ঝুটা চেতনা পরিবেশন করছিল, চব্বিশ বছর পরে ইতিহাসের নির্মম বাস্তব তা স্পষ্ট চোখে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আর দৃষ্টিভ্রমের কোন প্রশ্ন ওঠে না, সন্দেহের দোলায় দোলায় কোন প্রশ্ন ওঠে না।

জানিনে, ওদের বিক্রীত এবং বিকৃত বিবেকের গায়ে অনুতাপের কোন স্পর্শ লেগেছে কি না, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। যে-কোন মানুষের অধঃপতনে তোমার আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। যেহেতু পতনটা মানুষের।

তবে বেশি দুঃখ করো না। ইতিহাসের ট্র্যাকশটে ওদের ছায়া অন্ধকারও গ্রহণ করবে না।

একদা জিন্না এভিন্যু বর্ত্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিন্যু। ইতিহাস এইভাবেই তুরুপ করে। তার অত্যারোপ—সুপার-ইমপোজিশনের খেল অন্ধের দল কখনও দেখতে পায় না।

ভাবাদর্শ—আইডলজি আকারহীন, নির্বস্তক কিছু নয়।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার অদৃশ্য শিকড় প্রোথিত থাকে।

অত্যাচারি যদি নিজের নিপীড়ন-জুলুমকে ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত প্রতিয়মান করে তুলতে না পারে, তার জুলুম ত মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বসবে।

দস্যু নিজেকে দস্যু বলে জাহির করলে কি সে ডাকাতি করতে পারতো?

তাই ছদ্মবেশ প্রয়োজন হয়।

ভাবাদর্শও এই ছদ্মবেশের একটি সহায়।

আলিবাবা কাহিনীর দস্যুরা নিজেদের তেলের সওদাগর বলে পরিচয় দিয়েছিল।

ঈমান এবং সততা নিয়ে বাঁচতে হলে কাল-পটভূমির দিকে সদা-জাগ্রত প্রহরী চোখ রাখা অপরিহার্য।

এখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে তুমি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান মানুষ হতে পারো কিন্তু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে চরম অবমাননায় তার দাম দিতে হয়। এই সোজা সূত্রের কথা অনেকে মনে রাখে না।

চল্লিশ বছর পূর্বে এক কবির উদয়কালে মনে হয়েছিল, ভবিষ্যতে দেশের মানুষ এক মহৎ কবির সন্ধান পাবে। কিন্তু জীবন-যাচাইয়ের পথ তিনি ভুলে গেলেন তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পাকিস্তান ও ইসলাম সমার্থবাচক। অর্থাৎ পাকিস্তান টিঁকে থাকলেই ইসলাম টিঁকে থাকবে। মুর্খ কবি রাষ্ট্র এবং ধর্মের পার্থক্য বুঝলেন না।

মগজের সাধনা না থাকলে মাজাও আর সোজা থাকে না।

তখন সরীসৃপের দলে পড়তে হয়।

জীবদ্দশায় কবি দেখে গেছেন পাকিস্তান ভেঙে গেল (আর যেটুকু অবশিষ্ট একত্রিত আছে, তা নেহায়েৎ ডান্ডার মহিমায়) কিন্তু ইসলাম টিঁকে রইল যথাপূর্ববৎ।

অন্ধ মোহগর্তে পতিত, প্রারম্ভে প্রতিভাবান কবি, এখন এক ডজন মাইনর রোমান্টিক কবিদের

অন্তর্গত। তাঁর বিরাট সম্ভাবনা ভ্রষ্ট বুদ্ধির চোরাবালিতে অজানিতে নিঃশেষ হয়ে গেল। কবি তিনি কিন্তু জালেমের দুঃশাসন, জল্লাদের হাতিয়ার চালানোর মানসিকতা গঠনের কারিগর। ইতিহাসের কাছে তাঁর এই কলঙ্ক কি কেউ খন্ডাতে পারে?

তাই বলা হয়, ইতিহাসে ক্ষমা নেই।

জানো, বন্ধু, ইংরেজরা যাকে বলে "সেন্স পিরিয়ড" অর্থাৎ কাল-বোধ সম্পর্কে তাই বড় সতর্ক থাকতে হয়।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তেইশ বছর পেরিয়ে গেল।

জীবনে ইতিহাসের এমন ঘূর্ণিঝড় দেখার সুযোগ তো সচরাচর আসে না।

ঝড় বয়ে গেল।

অথচ আজও একটা উপন্যাস লেখা হল না।

যা হয়েছে, তুমিও স্বয়ং দাগি আসামি, সব নুন-চামড়ার উপর ঈষৎ খামচি। বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার কাছে এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপার আশা করা যায় না।

কিন্তু তরুণ বন্ধুদের কান্ড দ্যাখো।

ওদের কাছে যেন ইতিহাস নেই। 'গ্র্যান্ড ভিশান' বিরাট দিব্যদৃষ্টি নিয়ে এগোনোর চেষ্টা দূরের কথা, বরং পাশ কাটিয়ে যেতে আনন্দ পায়। অথবা, এখানে-সেখানে ঈষৎ খামচি। মুক্তিযুদ্ধের এক-আধখানা ঘটনা, লন্ডনে সেই সময় তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ধুক্‌পুকনি, ইতিহাসের লাভাস্রাবী অগ্ন্যুৎপাত নিয়ে প্রায় ছেলেমানুষি বা লেখা-লেখা খেলার এই এক তামাসা চলছে।

এমনিতে বাঙলা উপন্যাস বিশ্বের আসরে অতি দীন, দরিদ্র, জীবনের নানা দিকে যাতায়াত-হীন। সেখানে 'মাল্‌টিপল টাইম' অর্থাৎ যৌগিক কাল, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ডবল টাইম—বা কোন দার্শনিক চিন্তার খেই ধরে এগোনো, কিংবা দর্শকের বিন্দুতে না থেকে লেখক হিসেবে সোজা জীবনের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে উপন্যাস রচনা—এমনতর নানা পরীক্ষার চেষ্টা বাঙালিদের নেই।

তরুণরা প্রধানতঃ ম্যাসমিডিয়ার শিকার। পূর্বেই বলেছি, ফলে, লেখক নয় ক্যাটারিং এজেন্ট। খেপলা জালের বেষ্টনির মত বিরাট চৌহদ্দি জুড়ে জীবনকে নানা কোণ থেকে ধরার প্রবণতা কোথাও চোখে পড়ে না। ভাসা ভাসা কিছু ঘটনা, কাহিনী বাজারে ছাড়া যেন আমাদের ব্রত। বাঙালি চিন্তা করে শুনলে তাই আমার হাসি পায়।

এই আত্মদীনতা সম্পর্কে অনেকে সচেতনও নয়।

আজকাল ছোট গল্প লেখা আগের চেয়ে ঢের কঠিন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের তাগিদে য়ুরোপে আধুনিক ছোট গল্পের সূত্রপাত। কিন্তু মানুষ আবার যৌথ জীবনের দিকে ছুটে না গেলে তার পরিত্রাণ নেই।

আণবিক দানবের হাতিয়ার তা আরো অবধারিত করে দিয়েছে। নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে সিরিয়াস লেখকেরা চিন্তিত।

ছোট গল্পের ফর্ম কী হবে? আবার কি আমরা সোজাসুজি কথকতায় ফিরে যাব, অথবা

উপাখ্যানের আঁচল ধরব?

প্রবন্ধের ছাঁচে কি ছোট গল্পকে ফেলা যায় না?

এত রকম সমস্যা সম্মুখে।

তরুণ বন্ধুরা বয়োধর্মে নানা দিকে ফেটে পড়ে না কেন? তবু একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়। সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার।

অবিশ্যি তুমি নিজে বৃদ্ধ তা বিস্মৃত হয়ো না।

তোমার আমার জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এই এক ট্র্যাজেডি। একটা সময়ের পরিসরে তুমি আছো, আমি আছি। গড়ে ষাট সত্তর খুব জোর আশি বছর। তার পর নেই।

কিন্তু সংসারের প্রবাহ ত লুপ্ত হবে না। অবশ্য মৃত্যু আমার কাছে আরেক ধরনের নতুন জীবন-ধারা, অন্য কেরিয়ার। একটা লোক চলে যায়। কিন্তু তার কৃত কাজ থাকলে তা জানান দিতে তাকে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না।

এত দিনে নিশ্চয় তুমি উপলব্ধি করেছ, তুমি লেখকও। তুমি এক ধরণের মুদ্দফরাস ঝাড়ুদার। লেখনি তোমার পতাকা নয়, তোমার পতাকা সম্মার্জনী।

দুঃসহ বর্তমানের মুখে তাৎক্ষণিকতায় সমস্ত উদ্যম অপচয় করেছ।

জাতীয় জীবনের বুদ্বুদের পেছনে তোমার সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা আইস্‌বার্গের উপরি-স্তর। আরো গভীরে ডুব দিতে শেখনি 'অরূপ রতন আশা করি'।

উপন্যাসের কল্যাণে ব্যক্তি-মানুষ জেনেছে, তাকে ইতিহাস দিয়েছে ব্যক্তি-মানুষের স্বীকৃতি। ব্যষ্টি-গোষ্ঠীর মিলিত জীবন-ধারার তরঙ্গ-কল্লোলের ঐকতান শুনতে পাওনি কোনদিন।

বাঙলাদেশের সীমানায় পদ্মানদীর বাঁধ থাকার ফলে আত্মসন্তুষ্টির শিকার এক রকমর গাঁইয়া মোড়ল বা লোকাল 'লায়ন' (স্থানীয় সিংহ) হওয়াই ত এদেশে সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু পৃথিবী আরো বিচিত্র এবং বিশাল তা ভুলে যাও খুব সহজে।

তুমি ওজর তুলবে, আমার জানা কথা, প্রৌঢ়কালে বৃদ্ধকালে কি মত বদলানো যায়? অভ্যেসের মতই তা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবানবন্দি চিরকাল স্মরণীয়।

নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি পরিবর্তনের কথা অকপট স্বীকার করেছেন।

দিলীপ কুমার রায়-কে এক চিঠিতে মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে লিখেছেন, "মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বারবার মত না বদলাতেন তাহলে আজকের দিনের সংগীতসভা, ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হোত এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হোত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানির পক্ষপাতী, তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তাহলে বুঝবো এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি।"

সৃষ্টির তাগিদে মত বদলানো কোন অপরাধ নয়।

আমার কাছে স্বীকারে তোমার ইজ্জত যাবে না।

কালপরিক্রমা তুমি পরিপূর্ণ অনুধাবনে অক্ষম। তুমি অবিশ্যি স্বীকার না-ও করতে পারো। কিন্তু আমার বক্তব্য বললাম এবং খুব ভুল বকেছি বলে মনে হয় না। পুরাতন সুবাদের রেশ আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া তুমিও জানো .....

অসম্ভব।

বন্ধু, তাই তো তোমাকে আহবান জানাই।

এসো নিবিড় নিকটে একবার এসো।

এদেশে জন্মে অখন্ড, নিরেট ব্যক্তিত্বের স্বাদ ক'জনই বা পায়?

অধিকাংশ জন বাঁচে ফন্দি এঁটে। সেই ফন্দি ফিকিরের ভোলও তাকে পাল্টাতে হয়। সেখানে সে অবিচল ঈমানদার থাকতে অপারগ।

চোর গুন্ডা ডাকাত বেশ্যা ইত্যাদিরাই এখন সৎ। তাদের ঈমানে দ্বৈততা থাকে না।

আর আমরা?

চূর্ণ বিচূর্ণ ব্যক্তিত্বের কণিকা, পদে পদে দশমায়িত, মানবতার খণ্ডিত ক্যারিকেচার।

তার মধ্যেই মোহ মরীচিকা সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত মনেব-জন্মের পরাকাষ্ঠা দেখাই এবং বিবেককে চোখ ঠেরে সান্ত্বনা পাই।

এসো। নিবিড় নিকটে এসো।

নিজের দিকে তাকাও

আমার দিকে তাকাও

এসো নিবিড় আলিঙ্গনে

যূথবদ্ধ একাকীত্বের স্বাদ-মগ্ন হই।

এসো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বিদ্যা প্রকাশ

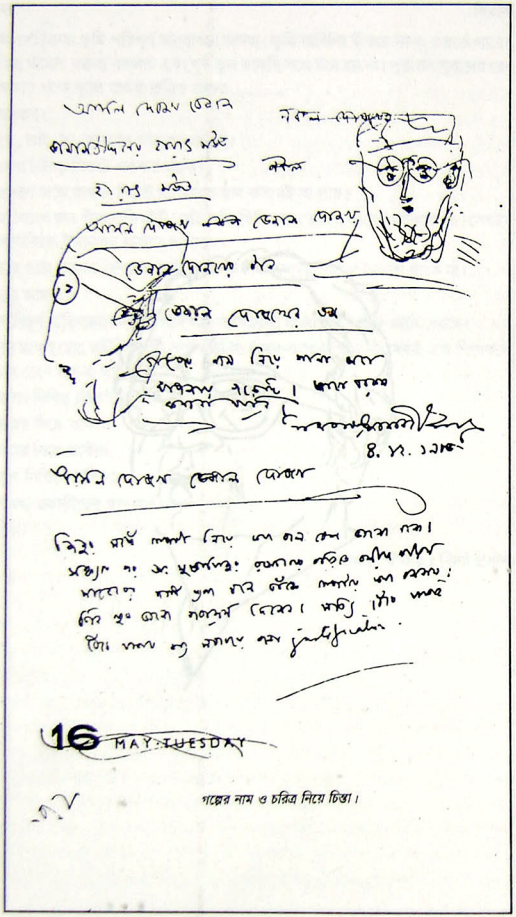

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর ডায়েরি থেকে

১৪ অক্টোবর ১৯৮৪

৭ দল ও ১৫ দলের জাতীয় সমাবেশ। ষ্টেডিয়ামের বাইরে ৭ দলের জাতীয় সমাবেশের প্রস্তুতি দেখে চাঁদ মামার ওখানে গেলাম। ওখানে কছুক্ষণ কাটিয়ে বেলা তিনটার দিকে গেলাম আসাদ গেটে। মানিক মিঞা এভিন্যু জুড়ে ১৫ দলের বিশাল সমাবেশ। রাজ্জাকের গলাবাজিতে শেখ মুজিবর রহমানকে অনুকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা খুব বিরক্তিকর। কলেজ থেকেই দেখলাম -ছেলেটা মানুষ হলো না। হাসিনার বক্তৃতা এই প্রথম শুনলাম। খুব ভালো বলে। হাসিনাকে দেখি তখন ওর বয়স বোধহয় ১৪/১৫ বছর। সালোয়ার কামিজ পরা গড়পড়তা বাঙালি মেয়ে।.... বাবার মতো ডেমাগগি করে না, আবার শেখ সাহেবের বক্তৃতার লাবণ্যও হাসিনার বক্তৃতায় নেই। সেই আবেদনও অনুপস্থিত। সামরিক শাসকদের ফ্যাসিস্ট শাসন বেশিদিন টিঁকতে পারে না। কিন্তু এরপর আসবে কারা?

২রা নভেম্বর ১৯৮৪

লেখক শিবিরের কর্মশিবির

২,৩,৪ নভেম্বর ১৯৮৪

শিক্ষা, শ্রেণী ও বাঙলাদেশের ছাত্রযুবকদের সামাজিক অবস্থান

১. ছাত্রদের সামাজিক অবস্থা ঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে ছাত্ররা নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয় না। শিক্ষাসূচি তাদের নিজেদের শ্রেণী থেকে বিচ্যুত হতে উস্কানি দেয়, পরীক্ষা পাশের পর আকাঙ্ক্ষিত শ্রেণীতে উত্তরণে ব্যর্থতার ফলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষোভ পোষণ করে। এই মনোভাব বিপ্লবী চেতনা গঠনের প্রতিকূল।

২. Syllabus নিয়ে নানা রকম experiment চলছে। এইসব কাজের সঙ্গে জড়িত লোকজন হয় অকাট মূর্খ নইলে শয়তানের বাচ্চা। আগে, যাকে আমরা ঔপনিবেশিক যুগ বলি, ইংরেজি বাঙলা পড়বার সময় লক্ষ্য রাখা হতো। এখন সেখানে জোর দেওয়া হচ্ছে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার প্রতি। কিন্তু ভাষা শেখার জন্য বিষয়বস্তু দরকার। বিষয়বস্তু যা দেওয়া হচ্ছে তা কখনো কখনো খুব আপত্তিকর, সেই সব কথা দিয়ে Social climbing -এর প্ররোচনা দেয়া হয়। Rafiq goes to sleep শীর্ষক লেখায় (p.২০২) ইংরেজি শেখার পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলো হাস্যকর।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

'দুধভাতে উৎপাত' বের হলো। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কাজ শুরু করেছিলাম, এই আড়াইটা মাস বলতে গেলে এর মধ্যেই একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। মণিপুরি পাড়ায় প্রেস হওয়ায় প্রথম থেকে আমার ভালো লেগেছে, যদিও বলতাম, 'ইস, শালার প্রেস এতোদূর !' কোষ্টারে উঠে রোজ প্রেসে যাওয়া, কোনো কোনো দিন রাত্রি সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত হয়ে যেতো। প্রেস কর্মচারীরা আমার সঙ্গে খুব co-operate করেছে, যদিও সবাই দারুন রকম আনাড়ি। খালেক সাহেব এতো ভালো ব্যবহার করেছেন যে, আমার মনে হচ্ছিলো ইনি আমার সবকটা বইয়ের প্রকাশক হলে লেখারও ইন্ধন পাওয়া যায়। টগর ছেলেটিকে patho-

logically বেয়াদব মনে হতে পারে, কিন্তু বেয়াদব যদি ধান্দাবাজ না হয় তো আমার সঙ্গে ঝট করে মিশে যায়। ওর সঙ্গে চমৎকার adjust করা যাচ্ছে, কচির মতো রাজনীতি কিম্বা শিল্প সচেতন নয়।, কিন্তু বেশ matured ছেলে। আঘাত মানুষকে গভীরতা দেয়, বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি ওকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে, পরিণতও করেছে বৈ কি!

ওর সঙ্গে বেচারাম দেউড়ি থেকে বাঁধানো বই নিয়ে রোববার অফিসে গেলাম। রফিককে এক কপি দিলাম। জ্যাককে এক কপি। সেখান থেকে বিচিত্রা। আলমগীর বইয়ের ছাপা নিয়ে খুব তীব্র ও রুক্ষভাবে অসন্তোষ জানালো। এই লোকটিও pathologically দুর্ব্যবহারকারী। ধান্দাবাজ ও careerist নয় বলে এর সঙ্গেও আমার understanding খুব ভালো। বন্ধু হিসেবে আলমগীর খুব ভালো। বিচিত্রা থেকে দৈনিক বাংলা। তারপর সন্ধানী। ওখান থেকে বংশালে সংবাদ অফিস।

সন্ধ্যায় বইমেলায় ডাক্তার খালেক, টগর ও আমি দোকানে বই নিয়ে বেড়ালাম। লেখক শিবিরের ঘরের সামনে উমর সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন রেহমান সোবহানের সঙ্গে।

রাত্রে সুশান্ত ও হরিপদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ফিরলাম। সুশান্ত মধুমিতা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। এখানকার সব নামকরা লেখকদের ও পত্রিকার উপর ছেলেটা খুব চটা। .... মনে হলো বই বের করেই জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হলো।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল ও গোবিন্দ দাস

১. লেখক শিবির গত দু'বছর থেকে এই তিনজন কবির ওপরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে আসছে। তারিখ ঠিক করা হলেই দ্যাখ্যা যায় যে একটা না একটা বিপর্যয় ঘটে। এমন কি এবারও এরসাদের পেটোয়া বাহিনীর হাতে ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়ার অকাল মৃত্যু হলো। মনে হচ্ছে, এর পরও যদি তারিখ পেছানো হয় তো ফের আরো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এবার তারিখ পেছানোর চিন্তা বাদ দেওয়া হলো।

২. এখন এই তিনজন কবির ওপর আলোচনা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য কি? কবি হিসাবে এঁরা বাঙলা সাহিত্যে বড়ো স্থান অধিকার করে আছেন বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে। এমন কি যদি গণআন্দোলনের প্রসঙ্গই কবিতার প্রধান বিবেচনা বলে মনে করি, তবু নজরুল ইসলাম , বিষ্ণু দে, বা সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সমর সেন প্রমুখ অনেক পরিশীলিত কবির নাম এদের ওপরে। তাহলে এই তিনজনকে এতো গুরুত্ব দিচ্ছি কেন?

৩. সম্প্রতি শহরবাসী মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে এক ধরনের মধ্যবিত্তের মধ্যে দেশের লোকশিল্পের প্রতি এক ধরনের অনুকূল মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যায় যে এই মনোভাব সম্পূর্ণ বানোয়াট, অন্তত একে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বলা চলে না। মধ্যবিত্তের উদ্ভট ও উটকো জীবনযাপনের সঙ্গে লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব উদ্ভট ও উটকো বলে সনাক্ত করা মোটেই কঠিন নয়। দেশবাসীর সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রতি এক ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দ্যাখানো এই সব চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য। টেলিভিশনে ও ভিসিআরে উদ্ভট ও আজগুবি, দেশ বা মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অনুষ্ঠান দেখলে

যাদের সুড়সুড়ি মেটে না, তারাই আবার পাটের দড়ি আর বাঁশের কুলো দিয়ে ঘর সাজায়, এই অসামঞ্জস্য চোখ এড়ায় না।

৩. তাহলে কি আমরা লোক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী? শিক্ষিত ও একালের সংস্কৃতিবান মানুষের হাতে লোক সংস্কৃতির হুবহু পুনরুজ্জীবন কি সম্ভব?

৪. তাহলে কেন?

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পালাবদলে সাধারণ মানুষ থেকে আমরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এমনকি এই শতাব্দীর তিরিশের দশকেও গ্রাম ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের যে যোগাযোগ ছিলো, তা এখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উৎস যে সাধারণ গণমানুষ তার সঙ্গে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের শিল্প সাহিত্যের চর্চার ধরন এমন যে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপায় নাই।

(খ) উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রের যে অনুভব বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিকশিত হয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে তার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটেনি। তা হলেও প্রচন্ড প্রতিভা একাগ্রতা,নিষ্ঠা ও সততার কারণে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু , সত্যজিত রায় প্রমুখের সাহিত্য ও শিল্পকর্মে ব্যক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে।ব্যক্তির যন্ত্রণা ও বেদনার এরা মোটামুটি সফল রূপায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

(গ) কিন্তু পঞ্চাশের সশক থেকে শিল্প সাহিত্যে এক নিদারুণ অবস্থা দ্যাখা যাচ্ছে। কেন?- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র একটি পর্যায়ে এসে কেবল আত্মকড়ুয়নে পরিণত হয়, সামাজিক দাপটকে অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবল শক্তি প্রথম দিকে দ্যাখা গিয়েছিলো, পরবর্তীকালে তা লোপ পায়। সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে ব্যক্তিসর্বস্বতা, যাকে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

(ঘ) আমাদের আলোচ্য কবিরা আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির রাহুগ্রাসের বাইরে থেকে যাবার ফলে ব্যক্তির এই অবক্ষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। কবিত্ব ছিলো এদের স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা, এই ক্ষমতাকে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন সাধারন মানুষের সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কাজে।

৫. শিল্প সংস্কৃতির এই পানসে ও রক্তশূন্য সময়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার যে সাধারণ মানুষের কথা ও ভাবনা আমাদের কতোটা সাহায্য করতে পারে। সাধারণ নিম্নবিত্তের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিতে সমগ্র দেশের মুক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু কেবল এই কারণেই দেশবাসীকে জানতে হবে, তা নয়। বরং লেখক শিল্পীরা যদি জড়তা থেকে, রক্তশূন্যতা থেকে নিজেদের শিল্পসৃষ্টিকে উদ্ধার করতে চান তা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের জীবন্ত সংস্কৃতির কাছে না গিয়ে আর কোনো উপায় নেই। শিল্প সাহিত্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আজ ব্যক্তিসর্বস্বতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে অফ্রিকার ও ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের মধ্যে। চিনুয়া আকিবি, মার্কুইজ প্রমুখ।

৬. আমাদের আলোচ্য তিনজন লোকের ভাষা লক্ষ্য করার মতো। তাঁরা পুরনো ফর্মের

বাইরে চলেন নি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ফর্মে যেসব কাব্য চর্চা হয়েছে। সেখানে পাই সামন্তযুগের অবক্ষয়ী মানসিকতার অভাব।

রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ এনেছিলেন তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পুলক চন্দ রবীন্দ্র নাথের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের কথা বলেন তখন কিন্তু কবিয়ালদের প্রকৃত অবস্থা ঐ রকমই। আসলে রবীন্দ্রনাথ যেটা খেয়াল করেন নি তা হলো এই যে ভারতচন্দ্রের সময়েই এই অবক্ষয় বা বিকৃতি শুরু হয়েছিলো। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব তাদের বিকৃতির কারণ নয়, সমস্ত যুগের অবক্ষয়ই কবিয়ালদের বিকৃতির প্রধান কারণ।

৭. মুকুন্দ দাস যে বাঙলার সাধারণ মানুষের প্রচলিত ফর্মেও নতুন জীবন দান করেন তার কারণ এই যে তখন সামন্ত যুগের খোঁয়ার ভাঙতে শুরু করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই খোঁয়ারি ভাঙার প্রথম হাতিয়ার। এতে দেখা যায় যে সামন্ত চেতনা থাকলে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেও নতুন কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না, বড়জোর বেদনার কথা প্রকাশিত হতে পারে। মুকুন্দ দাস তা করেননি। তিনি ধর্মভীরু লোক। কিন্তু নতুন যুগও তাকে স্পর্শ করেছিলো। রমেশ শীল এই ব্যাপারে আরো অনেক বেশি অগ্রসর।

১৬ মে ১৯৮৫

কেরামত মঙ্গল নাটক দেখে ভরসা পাওয়া গেলো যে ঢাকা থিয়েটার দেশবাসীর কঠিন জীবনযাপন ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকে এতোটুকু মোলায়েম না করে সরাসরি মঞ্চে নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা ও আকাঙ্ক্ষাকে এতোটুকু বিসর্জন দেয়নি। দেশ বিভাগের পটভূমি থেকে শুরু করে বাঙলাদেশের অভ্যুদয় এবং এর পরবর্তীকালের শাসকদের সঙ্গে মানুষের বিরামহীন যুদ্ধকে নানাভাবে তুলে ধরা হলো এই নাটকের প্রধান কাজ। পাকিস্তান, দাঙ্গা হাজং বিদ্রোহ, ভাষা আন্দোলন, পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানান বর্ণের নিপীড়ন-সবই একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। .....বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আধুনিক কালে মানুষের জীবনযাপনের কষ্ট ও সংগ্রাম-এখানে সবই আছে। মহাকাব্যের বিস্তৃতি এর আগে আমাদের এখানে কোনো নাটকে দেখিনি। এমনকি এদের 'কিত্তনখোলা' বা 'ফণিমনসা'তেও নয়।

কিন্তু যে সংহতি, সংযম ও নৈর্ব্যক্তিকতা এই বিশাল পটভূমিকে দর্শকের চিত্তে একই সঙ্গে অস্বস্তি ও জ্বালার সৃষ্টি করতে পারে তার অভাব মাঝে মাঝে স্পষ্ট। ধর্ম ও রাষ্ট্র-শোষণের এই পুরনো হাতিহারকে ন্যাংটো করে এদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়ার বুকের পাটা দেখিয়েও গলা থেকে কিছুক্ষণ পর পর ভদ্রলোক মার্কা বড়ো বড়ো কথা বলা তাদের মানায় না। হতে পারে সমাজ জীবনের প্রতি এই শিল্পীগোষ্ঠির সীমাহীন বিতৃষ্ণা এমন চরমে উঠেছে যে তাদের ক্রোধ মাঝে মাঝে চরিত্র ও ঘটনাকে ছাপিয়ে উঠেছে। তখন হয়কি, চরিত্রগুলো কথা বলে না, ডায়লগ ছাড়ে, যে ঘটনাগুলো নির্ভেজাল সত্যি সেও উটকো বলে মনে হয়। নাটকের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে উপচে পড়া কষ্ট বা দৃশ্যের পক্ষে তখন দর্শকের ক্রোধ উসকে দেওয়া মুশকিল।

২০ জুন ১৯৮৫

মোহম্মদ আলি হাসপাতালে সাত্তারকে দেখতে গিয়ে দেখি ব্যাটা উধাও। পরশু দিনও আমার

সঙ্গে কথা হলো, ডাক্তার যতোদিন থাকতে বলে সাত্তার ঠিক ততোদিনই থাকবে। আমার অবশ্য সন্দেহ হচ্ছিলো, এই জেদি ও গ্রাম্য প্রকৃতির লোকটি ঈদের দিন হাসপাতালে থাকবে না। যাক, ওর জন্য সেমাই-টেমাই যা নিয়ে গিয়েছিলাম, একজন রোগীর প্লেটে ঢেলে ঘরে ফিরলাম।

রিকসাওয়ালাটা (২৫ থেকে ৩০) একটু বিনয়ী টাইপের। ওর সঙ্গে বেশ জমলো। কিন্তু বেশি জমাতে গিয়ে ছোকরা প্রায় এক্সিডেন্ট করে ফেলেছিলো।

হাঁটুর এক ইঞ্চি ওপরে ওর একটা ফোঁড়া হয়েছিলো, গতকাল সেটা ফাটে। সপ্তাহখানেক রিকশা চালাতে পারে নি বলে বেচারার ঈদ-ফিদ সব মাটি। ঈদের আগের দিন ওর 'ঘর' (মানে বুঝলাম না? ঘর! পরিবার) তার বাপের বাড়ি থেকে "৩০ টাকা হাওলাতে কর‍্যা লিয়া আসিছে"। ফোড়াটা ফাটিয়ে ছোকরা এই ৩০ টাকা নিয়ে বাজারে গেলো।

চাল	:	@ ৫.৫০	:	১১.০০
চিনি	:	@ ১৫.০০	:	১০.০০
সেমাই	:		:	৬.০০
আলু	:		:	২.৫০
			মোট :	২৯.৫০

১ সের চাল ও আলু সেদ্ধ করে গতকাল এক বেলা দিব্যি চলে গেলো, ওদের একটি সুখি পরিবার-স্বামী ও ১ ছেলে। ইচ্ছা ছিলো দুই বেলা চালাবে, কিন্তু সাতদিন রোজগার না হওয়ায় খাওয়া দাওয়া ভালে হয়নি বলে খিদে ছিলো প্রকট। সুতরাং এক বেলাতেই সব সাবাড়। রইলো ১ সের চাল। রিকশাওলার বৌ জেদ ধরলো ঈদের দিন অন্তত ভাত তো রাঁধা চাই। এর মধ্যে ওর সম্বন্ধী তিনটে কৈ মাছ দিয়ে গেছে, সম্বন্ধীটা থাকে শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে, দু'দিন খুব বৃষ্টি হওয়ায় এদের বাড়ির সামনে মাঠে কৈ মাছ সারি করে বেড়াচ্ছিলো, তার সাতটা পেয়েছে সে। এদিকে রিকশাওলার কাছ থেকে সম্বন্ধী মাসখানেক আগে ১০টা টাকা ধার নিয়েছিল, রিকশাওলা ভয় পাচ্ছে যে, এই কৈ মাছগুলো বিক্রি করে বেটা ঐ টাকা শোধ করার সময় আরো বাড়িয়ে গেলো। এর চেয়ে মাছগুলো বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে দিলে বরং ভালো করতো। এই কৈ মাছের ঝোল দিয়ে ঈদের দিন ভাত খাবার আশায় রিকশাওলার বৌ কাল বিকালে ভাত রাঁধে নি। আর রিকশাওলার ছেলে জেদ ধরলো যে ঐদিনই তার সেমাই খাওয়া চাই।

ঈদের আগের দিন বিকালে তিন পোয়া চিনি ও এক টাকার মশলা দিয়ে সবটা সেমাই রান্না করে ফেললো। রান্না শেষ হতে না হতে বাপে বেটায় বসে গেলো সেমাই খেতে। কিন্তু সেমাই ভেজে নেওয়া হয়নি বলে জিনিষটা পরিণত হয়েছিল ময়দার মন্ডতে। খেয়ে সুখ হয়নি।

তো আমার ভয় হলো যে রিকশাওলা এই নিয়ে বৌকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিয়েছে। জিজ্ঞেস করতেই সে হাসলো, "না না! ম্যারা কি হবি?" আমি বললাম নিশ্চয়ই বকেছে। না, রিকশাওলা তাকে বকেওনি। বরং সান্ত্বনা দিয়েছে, 'তুই কি করবু? এই সব রেজেগে নাই, কপালোত ল্যাখা নাই।'

১ মে ১৯৮৬

গণসঙ্গীত

১. গণসঙ্গীত গণআন্দোলনের ওপর নির্ভর করে।

২. রবীন্দ্রনাথের গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিশেষ সাড়া জাগায়। কিন্তু আন্দোলন শুরু না হলে সেগুলো লেখাই হতো না।

৩. নজরুল ইসলামের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে এইসব গান লেখা সম্ভব হতো না। IPTA কোন গণ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি, গণ আন্দোলন শুরু হলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৪. গণসঙ্গীতের ভিত্তি হওয়া উচিত সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে শিল্পে পরিণত করেন লেখক, কবি, শিল্পী। সুর-লোকসঙ্গীত কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, প্রবাদ, গাথা, উপকথা প্রভৃতি ভিত্তি। মানুষের নানা কুসংস্কার থাকে, সেই সবের ভিত্তি করেও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পী তৎপর হতে পারেন।

৫. আমাদের দেশে এখন রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত বলে গণসঙ্গীত রচনা ও প্রচারে ভাটা পড়েছে। .....নিম্নরুচির গান যে বেশি পাত্তা পাচ্ছে তার কারণ সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত।

২৭ মে ১৯৮৬

টি এসসি'র ছোটো ঘরে লেখক শিবির আয়োজিত মানক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন করা হলো। উমর সাহেবের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করলাম আমি। ডঃ জহুরুল হক অনেকক্ষণ ধরে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বললেও শুনতে খারাপ লাগছিলো না। মঞ্জু সরকারারের বক্তব্যের খুব কড়া সমালোচনা করলো কায়েস। কায়েস বেশ ভালো বলেছে, চমৎকার বাচনভঙ্গি, যুক্তি দেওয়ার পদ্ধতি খুব মৌলিক। আনু মুহাম্মদ বললো যে মার্কসবাদে আকৃষ্ট না হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মান খারাপ হতে পারতো। আমারও তাই মনে হয়। এই নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবো।

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনোবিকলন যেভাবে তুলে ধরেন তাতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে লেখকের রাগ ও ক্ষোভ খুব স্পষ্ট। এই অবস্থায় বেশিদিন লেখা সম্ভব নয়। নজরুল ইসলামের সঙ্গে এই ব্যাপারে তাঁর মিল রয়েছে।

২ জুলাই ১৯৮৬

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে লেখক শিবিরের আলোচনা সভা। আনু মুহাম্মদ, মঞ্জু সরকার, হরিপদ দত্ত, আবু সাঈদ জুবেরি ও আমি উপস্থিত ছিলাম।..

২৩ জুলাই ১৯৮৬

তিস্তা এক্সপ্রেসে ঢাকা ছাড়লাম সকাল নটায়। সাড়ে চারটায় ফেরি পার হয়ে ফুলছড়ি ঘাটে নেমে বড়ো মাছের খোঁজে অনেক রেস্টুরেন্টে ঢুঁ দিলাম। না! সব জায়গায় ছোটো ছোটো 'বিজুড়ি' মাছ আর বড়োজোর ইলিশ। শেষ পর্যন্ত আব্দুস সাত্তার নামে কুড়িগ্রামবাসী একজনের হোটেলে কুঁচো চিংড়ি ও বিজুড়ি মাছ দিয়ে এক প্লেট ভাত সেরে দু'জনে হেঁটে রওয়ানা হলাম ফুলছড়ি বাজারের দিকে, আধ মাইল পথ। এই রাস্তায় বাড়িঘর খুব কম, যমুনা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে, যাদের অবস্থা খুবই খারাপ তারাই কেবল বাড়িঘর ওঠায়নি, একটু

যাদের স্বচ্ছলতা, তারা সবাই উঠে আরও উত্তরে চলে গেছে। যারা আছে তার খুব গরীব। তাদের বাসগৃহকে বাড়ি বলা খুব কঠিন, পাখির বাসাও এর চেয়ে নিরাপদ। তবে শহরের বস্তির মতো নোংরা নয়। আবার এই ভাঙা পাটখড়ির বেড়ায় শতচ্ছিন্ন কাঁথা মেলে দিয়েছে, কাঁথায় কারুকাজ দেখলে অবাক হতে হয়।

ফুলছড়ি বাজার একেবারে ছোটো। উপজেলা বলে কয়েকটা দালান উঠেছে। তবে বাজার হাট একেবারে হতশ্রী। যমুনা নদীর ভাঙন মানুষ ও পরিবেশ সবাইকে উদ্বিগ্ন ও হতাশ করে রেখেছে।

রিকশায় এক মাইলের রাস্তা পেরিয়ে খালাম্মার বাড়ি।.....নানাবাড়িটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। নানামিয়া নামাজ পড়তে বসলে সেতু ও আমি অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে এলাম। গোটা গ্রাম নিস্তব্ধ, লোকজন খুব কম। কেন? আবার এরই মধ্যে একটি বাড়িতে-TV-র এ্যান্টেনা।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

১৯৭১

নভেম্বরের রামশহর

১. শীত ঃ লেপ,

২. ধানঃ মাঠ ভরা আমন ধান (বগুড়ার চাল), নিচু জমিতে ধান পাকবো-পাকবো করছে, কিছু কিছু পেকেছে। হলুদ, সবুজ গাছ। উঁচু জমিতে চাষ দেওয়া হয়েছে, রবিশস্যের প্রস্তুতি ঃ রসুন, আলু, পেঁয়াজের পুল, পাট, ধান, শালুক, টম্যাটো, কপি। Deep tube well বসানো হয়েছে, নভেম্বর বিরতি।

৩. ধানের ফলন স্বাভাবিক।

৪. জমিতে অন্য কোন ফসল নেই ঃ উঁচু জমিতে-রবিশস্য বোনার প্রস্তুতি চলছে।

৫. শিমুল গাছে গোটা আসতে শুরু করেছে। কালো কালো মোটা সেই গোটাগুলোতে ফুল ধরবে। জংলি গাছ, ছোট, এর পুরু পাতা বেটে দিলে কানের ব্যথার উপশম ঘটে।

৬. মানুষের বস্ত্র ঃ লুঙ্গি, বুকে ও পেটেও লুঙ্গি, শীতের সকালে মাঠে যাবার সময় উগ্রগুঙের লুঙ্গি পরে ও গায়ে জড়িয়ে যায়। একটু রোদ এলে লুঙ্গিটা পুটলি করে সামনে রাখে।

৭. জমির আলে সাধারণত ঘাস ও আগাছা।

৮. পুকুর, টিউবওয়েল ও কুয়ার ব্যবহার বেশি।

৯. একটা মাঠ ও উঁচু স্তুপ পরিচিত ধন্বন্তরি নামে, এখানে ধন্বন্তরি ওঝার বাড়ি।

১০. সাপের উপদ্রব হল ধন্বন্তরি স্তুপের মাটি এনে বাড়ির চারদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। মনে করা হতো যে ধন্বন্তরির প্রভাবে সাপ পালিয়ে যাবে।

১১. কালীদহ ঃ মহাস্থান যাদুঘরের সঙ্গে লাগানো পুরনো জলাভূমি। চারদিকে জঙ্গল, চৈত্র বৈশাখেও কালীদহে পানি থাকতো। কালো জল, মাঝে মাঝে কাদা (ডাপর, থলবলে থিতানো কাদা)। অনেকে মাছ ধরতে যেতো, করতোয়ার সঙ্গে যুক্ত। এখানে কাদায় পড়ে অনেকের মৃত্যু হতো। কালীদহের সঙ্গে একটি নালায় শোল, বোয়াল, শিঙ, মাগুর, কৈ। ওখানকার মাছ

বিক্রি হতো মহাস্থান ও সক্ষুরার হাটে। কালীদহের অনেক সাপ খুব মোটা ও কালো এবং তাদের ছায়া পড়েনা।

১২. বোলের বিল ঃ হাজরাদিঘি গ্রামের পশ্চিমে। দোগাড়ে গ্রামে যাবার সময় বোলের বিলের পাশ দিয়ে শীতকালে হাত দিয়েও ঐ বিল থেকে আধঘণ্টার মধ্যে প্রচুর মাছ ধরা হতো।

১৩. ট্যাংরার বিল, থলাকের বিল; মাছ ও ভূতের সহ-অবস্থান।

১৪. রামশহর পীরসাহেবের বাড়ির পুকুরপারে রসের হাঁড়ি লাগানো হয়েছে।

১৫. পুষ্পরীতলায় ভূত পরীর আখড়া। বকুলগাছে এক পরী চুল শুকাতো, তার এক ঠ্যাং ধন্বন্তরীতে আরেক ঠ্যাং পুষ্পরীতলায়।

২ মার্চ ১৯৮৮৭

দেলদুয়ার সরকারি বিদ্যালয় ঃ ১.১৫

আসবাবপত্রের অভাব। ব্ল্যাকবোর্ড নেই।

জামুকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ বেলা ২ টা

৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ৪ জন উপস্থিত।

১ জন নৈমিত্তিক ছুটিতে আছেন। প্রধান শিক্ষক ও ৩য় শিক্ষক অনুপস্থিত।

একটি ঘর করার জন্য গ্রামবাসী নিজেরাই মাটি কেটে জায়গা প্রস্তুত করেছে, কিন্তু সরকারি উদ্যোগ সহায়তার অভাবে এই উদ্যোগ সফল করা সম্ভব নয়।

সকালের Shift-এ ১০০/১৫০ ছেলেমেয়ে সেই উঁচু জায়গায় গাছতলায় বসে ক্লাস করে।

২ মার্চ ১৯৮৭

ফটিকজানি ঃ বেলা ১১টা : ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি ভালো। পড়াশোনা খারাপ। মড্যুল পৌঁছেনি।

ফুলতলা ঃ হেডমাস্টার মনে করেন যে ঃ ইমপ্যাক্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ প্রথমদিকে ছিল, তার অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে।

কুচুটি ঃ দুপুর ১টা attendance very poor.

টাঙ্গাইল মডেল স্কুল ঃ খুব সন্তোষজনক। ইমপ্যাক্ট প্রবর্তনের দ্বিধাগ্রস্ত।

৩ মার্চ ১৯৮৭

দেলদুয়ারে মীর মশাররফ হোসেনের কর্মস্থল দেখলাম।

সকাল ৮:৪৫

জেলা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মত ঃ শিশু বা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইমপ্যাক্ট মড্যুল উপযুক্ত নয়।

বেলা ১১টা ঃ পাতরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আসবাবপত্রের অভাবে ছেলেমেয়েদের উল্লেখযোগ্য অংশ মেঝেতে বসে পাঠগ্রহণ করে। স্কুলগৃহ ভাঙা ও ছাদ চুঁয়ে পানি পড়ে। একটি ঘর ১৯৮৫ সালে নির্মাণ শুরু হয়, কিন্তু ঐ বছরেই অসম্পূর্ণ রেখে ঠিকাদার চলে যায়।

২১ মার্চ ১৯৮৭

বেলা সাড়ে এগারোটায় মিনি বাসে রওয়ানা হয়ে নওয়াবগঞ্জে পৌঁছলাম দেড়টায়। বাসে বিশ্রী রকম ভিড়। DPEO অফিসে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া সেরে সাড়ে তিনটায় তাঁর হোন্ডার পিছে বসে গেলাম শঙ্করবাটি কাটাবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখতে। স্কুলটা ভালো, মহানন্দা নদীর একটি প্রবাহের পাশে। ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং অভিভাবক সমিতির সভাপতি এসে দ্যাখা করলেন। এঁরে আগ্রহ রীতিমতো অবাক করে দেওয়ার মতো। গ্রামের নিম্নবিত্ত কৃষকের ছেলেমেয়েদের স্কুলে নেওয়ার জন্য এদের পদক্ষেপ একেবারেই নতুন। পরপর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলেই সেই ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাববকে চিঠি দেওয়া হয়, নিরক্ষর অভিভাবককে ডেকে সব জানানো হয়।

ছেলেমেয়েদের অনিয়মত উপস্থিতির কারণ হলো দারিদ্র্য। মেয়েদের বাল্য বিবাহকে একটি গৌণ কারণ বলে বলে বলা হলো।

ম্যানেজিং কমিটির উদ্যোগে চাঁদা তুলে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। গান বাজনার জন্য কোন সরঞ্জাম পরিদপ্তর থেকে সরবরাহ করা হয়নি, অথচ স্কুলে গানবাজনার চর্চা আছে। ছেলেমেয়েদের বসার জন্য যথেষ্ট আসন নেই, শিশুশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয় গাছতলায়।

২২ মার্চ ১৯৮৭

উপজেলা ঃ নবাবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর

নদী ঃ মহানন্দা, পুনর্ভবা

বিল ঃ গাওয়া, আনো, হোগলার দামুল

সকাল আটটায় DPEO -এর জিপে বেরিয়ে শঙ্করবাটি গলাডাঙা স্কুল, নয়াগেলা স্কুল ও বালিয়া ডাঙা স্কুল দেখে রওয়ানা হলাম গোমস্তাপুর উপজেলার রাঙামাটির দিকে। বরেন্দ্র এলাকার বিশাল মাঠ, মাটির থাক, তালগাছ, আমবাগান এবং মাঝে হাতের বাঁয়ে মহানন্দা। মহানন্দা যেখানে পুনর্ভবার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই জায়গাটাও দ্যাখা হলো। রহনপুর রেল স্টেশনের প্রায় ২ মাইল উত্তরে নওদা গ্রামে গেলাম শুনেছি, এককালে নওদা ও আশেপাশের গ্রাম নিয়ে বিরাট একটি নগর গড়ে উঠেছিলো। কয়েকটা ঢিবি এখনো রয়েছে। একটা ঢিবি বেশ উঁচু, ৪০/৪৫ ফিট উঁচু এবং এর base প্রায় ২/৩ বিঘা জমি জুড়ে। এটা বোধহয় কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর সঙ্গে আরেকটি ছোটো ঢিবি। এই ঢিবি থেকে একটু দূরে একটি দালান। ওপরে ১টি গম্বুজ। শুনলাম সপ্তদশ শতাব্দীর তৈরি এটা একটা মাজার।

রাঙামাটির স্কুলটির হেডমাস্টার ও অধিকাংশ শিক্ষক সাঁওতাল। ছাত্রদের শতকরা ৮০ জনই সাঁওতাল। স্কুলের কাছে একটা খৃষ্টান মিশন। মিশন প্রধান ইটালিয়ান।

১২ এপ্রিল ১৯৮৭

লেখক শিবিরের আলোচনা সভা। বিরাষ্ট্রীয়করণ।

১৩ এপ্রিল ১৯৮৭

মৌলবাদ ঃ লেখক শিবিরের আলোচনা অনুষ্ঠান

১. মৌলবাদের প্রকাশ ঃ বর্ণবাদ ও Theocracy

২. উগ্রজাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, কুলটুর কাম্প, খেলাধূলা, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্ট বেঙ্গল

৩. রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও fundamentalism practise করা হয়েছে।

৪. বুর্জোয়া গণতন্ত্র fundamentalism- এর কোনো জবাব নয়।

৫. সেনাবাহিনী যেমন রাষ্ট্রের শেষ অস্ত্র ঃ এটা তেমন প্রতিক্রিয়াশীলতার শেষ অস্ত্র।

৬. ভারতবর্ষে ধর্ম ঃ রাজনীতি ঃ দর্শন।

৭. রাজনীতিতে তিলক, শ্রীঅরবিন্দ গান্ধি, জিন্নাহ।

৭. বিজ্ঞানের কাছে ভিক্ষা।

৮. Imperialism : Unicef সাহায্য করে মসজিদে মিশনকে।

৯ জুন ১৯৮৭

দেবীগঞ্জ উপজেলা

সকাল সাড়ে ন'টায় DPEO জনাব ওয়াজেদের হোন্ডায় দেবীগঞ্জ রওয়ানা হলাম। বোদা পর্যন্ত ১০ মাইল রাস্তা মোটামুটি ভালো, এরপর ১৪/১৫ মাইল হেরিং বোন ও কাঁচা, হোন্ডার পেছনে বসে আমার উরু ও পা ব্যথায় টনটন করছিলো। সাওকি নামে একটি জায়গায় হোন্ডা থামিয়ে চা খেলাম। দোকানদার CPB- র সমর্থক, এই এলাকার MP হলেন ফরহাদ সাহেব। রাস্তার দুই ধারে জনবসতি বেশ কম, মাঝে মাঝে পোলিয়াদের বাড়ি। এরা খুব গরিব, প্রায়ই ভূমিহীন দিনমজুর। এদের মেয়েরা প্রায় অনাবৃত ও অল্প আবৃত বুকে থাকে। দেখতে ভালো না। এদের উপর বাঙালিদের শোষণ যে কিরকম deep-rooted তা এদের ঘরবাড়ি, আচরণ ও স্বভাব থেকে বোঝা যায়।

১০ জুন ১৯৮৭

তেঁতুলিয়ার নদী ঃ করতোয়া, মহানন্দা। ভালুক, তিরনই, রণচণ্ডী, ভেরসা, গাবরা, বেরেং

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

তৃণমূল বের হলো। ইকবাল না থাকলে পত্রিকাটা যে আদৌ কোনদিন বেরুতো না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। মুফাদ খুব আগ্রহ দেখিয়েছে, ওর উদ্বেগ না থাকলেও কাজ করা সম্ভব হতো না।

ব্যয় ঃ

১. মুদ্রণ ঃ ৯ ফর্মা ঃ	= ৯০০০.০০
২. কাগজ ঃ ৯ রিম + :	= ৬৪৪০.০০
৩. অফসেটে প্রচ্ছদপট ছাপা + কাগজ	= ১২৫০.০০
৪. লেটার প্রেসে কভার	= ১৫০.০০
৫. ব্লক (৩টি)	= ১০০.০০
৬. বাঁধানো	= ২০০০.০০
মোট	=১৯০২০.০০
পরিশোধ	=১৪০০০.০০
	= ৫০২০.০০

৬ জুন ১৯৯২

কায়েসের মৃত্যুতে লেখক শিবিরের শোকসভা।

সভাপতিত্ব করি আমি। বললেন ঃ শওকত ভাই, হায়াৎ মামুদ, মঞ্জু সরকার, সুশান্ত, কান্তি জিনু, বাবুল, নীলু, সমুদ্র....।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

আজ থেকে দ্বিতীয় দফা কেমোথেরাপি। আজ একটু একটু কষ্ট হচ্ছে। বমি বমি ভাব, কিন্তু বমি হচ্ছে না।

বেলা আড়াইটের দিকে ডঃ আনিসুজ্জামান এলেন। সঙ্গে আনন্দবাজর পত্রিকার অভীক সরকারের চিঠি। 'খোয়াবনামা'র জন্য আনন্দ পুরস্কার নেওয়ার ইচ্ছা আমার একটুও নেই। আনন্দবাজারকে সারাজীবন গালি দিয়ে এসেছি। এমনকি 'খোয়াবনামা'তেও আনন্দবাজারের প্রসঙ্গ রয়েছে, যেখানে বিরূপ কথাই বলা হয়েছে।

ডঃ আনিসুজ্জামান খুব করে বললেন, পুরস্কার আমি প্রত্যাখ্যান করলে তিনি বিব্রত ল অপমানিত হবেন। .....খুব জোর দিচ্ছে, আমার চিকিৎসার জন্য এর মধ্যেই ৫০,০০০ টাকা ঋণ হয়েছে। এসব শোধ হবে কি করে?

রাত্রে ঘুমের ইনজেকশন দিলো। কিন্তু আনন্দ পুরস্কারের কথা ভেবে রাতভর ছটফট করলাম। এক পলক ঘুম হলো না।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

ক্যানসারেতে হলো আমার দক্ষিণ পদ কুপোকাৎ

বাম পা খানি নিশ্চল ছিলো উঠলো জেগে অকস্মাৎ

ডঃ স্থবির দাশগুপ্তকে বললাম, আনন্দ পুরস্কার আমার স্বস্তি ও ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কি যে করি।.....

ক্যান্সারটা হয়ে আমার সর্বনাশ করে দিলো। আনন্দ পুরস্কার না নিয়ে করি কি?

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

আজ দ্বিতীয় কেমোথেরাপির শেষ দিন। শরীর খুব খারাপ। আনন্দ পুরস্কার নেবো বলেই সিদ্ধান্ত নিলাম। উপায় নেই আনন্দবাজারের নিখিল সরকালর (শ্রী পান্থ) ফোন করেছিলেন, তুতুলকে বলেছেন, বইটা ভালো করে পড়েই তারা পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে কি আসে যায়?

১৫ মার্চ ১৯৯৬

ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত এসে বলে গেলেন যে, আমার ডান পা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

১৯ মার্চ ১৯৯৬

.....রাত্রে ঘুমের ইনজেকশন দিলো। কিন্তু সারারাত ঘুম হলো খুব ছাড়া ছাড়া। দুঃস্বপ্ন দেখলাম। তুতুল পাশে দাঁড়িয়ে নানভাবে দুঃস্বপ্নের ধার ভোঁতা করতে চেষ্টা করলো, পারলো না।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬

আজ বাঁ হাতে লেখা চর্চা শুরুকরলাম। দেখি, শালার ডান হাতের হারামিপনাকে টিট করতে পারি কিনা।

নভেম্বরের ১ তারিখে দুর্ঘটনা, আজ দেড় মাস হয়ে গেলো ঃ এখনো ডান হাতে লেখা যাচ্ছে না। আর কাঁহাতক সহ্য করবো?

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬

এক পাতা ঘুম হলো না। বান্দরবান থেকে মুফাদ পাহাড়িদের একটা রূপকথা, ছোট্ট বই নিয়ে এসেছে। রাতভর ঐটাই পড়লাম। এক ঘণ্টার বই শেষ হতে রাত কাবার।.....

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর অপ্রকাশিত লেখা

একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি
সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকার
রাষ্ট্রপ্রভুর সচিবালয়

স্মারক নং ১৮/৪/৬/৭ রা প্র/১৬৬০/৮৯ তাং ২৩-১১-১৯৮৯ ইং

সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল গত এক বৎসর যাবৎ কয়েকটি উন্নত দেশে সশ্রম তদন্ত সম্পন্ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আগামী বৎসর থেকে বর্তমান শতাব্দীর সর্বশেষ দশকের শুভ সূত্রপাত ঘটতে যাচ্ছে। গভীর অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিবেচনার পর মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু এই সিদ্ধান্তে সহৃদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। তাঁর অনুমোদিত এই সিদ্ধান্ত প্রচারের পর মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু উদ্বেগ ও উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান শতাব্দীর শেষ দশক শুরু হওয়ার আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী শতাব্দীতে নিরাপদ অবতরণের উদ্দেশ্যে সরকারি বা বেসরকারি, নাগরিক বা গ্রাম্য, বিভাগীয় বা উপবিভাগীয়, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত, পাইকারী বা খুচরা, সাংস্কৃতিক বা অসাংস্কৃতিক, সুস্থ বা অসুস্থ, সামরিক বা বেসামরিক—কোথাও কোনোপ্রকার উদ্যোগ এ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। এই নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু এই কারণে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। তাঁর সদয় ও সহৃদয় নির্দেশে আগামী দশক দেশবাসীর জন্য ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যময় করে তোলা এবং বিশ্বে কনকদ্বীপের ভাবমূর্তিকে উন্নত করার মহান লক্ষ্যে এই প্রজ্ঞাপন প্রচার করা হলো।

১. মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভুর কঠোর নির্দেশে মাননীয় মন্ত্রী ও উপমাননীয় নিমমন্ত্রীদের সবাই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই মত পোষণ করেন যে আমাদের মত অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশের যথাযথ উন্নয়ন ও কল্যাণে শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার হল ধর্ম। ধর্মমাত্রেই অত্যন্ত টেকসই অস্ত্র এবং ধারাবাহিক, বিচিত্র ও বহুব্যবহারে এর ধার বাড়ে বৈ-কমে না। একবিংশ শতাব্দীকে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু ঘোষণা করেছেন পবিত্র শতাব্দী রূপে এবং পবিত্রতা রক্ষার প্রসূতি গৃহণের জন্য আগামী দশককে পরিণত করতে হবে মুক্তির দশকে। মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আনুগত্য অন্ধ করে তোলার সাহায্যেই কাঙ্খিত মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। মানুষকে সকল জিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি, প্রতিবাদের স্পৃহা থেকে মুক্তি এবং প্রতিরোধের সাহস থেকে মুক্তি দিয়ে মানবজীবন থেকে তার পরম মুক্তিলাভের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হলো ধর্ম। নব্বুই দশকের স্লোগান স্থির করা হয়েছে "ধর্মেই মুক্তি, আর নয় যুক্তি"। "ছোটো পরিবার সুখী পরিবার"—জনপ্রিয় এই স্লোগানের সঙ্গে দেশের আনাচে কানাচে, পাহাড়ে সমতলে, অরণ্যে জনপদে এবং জলে ডাঙায় এই নতুন স্লোগানটির

গগনবিদারী প্রচারের ব্যবস্থা করলে যুক্তি, জিজ্ঞাসা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবাঞ্ছিত এলাকা থেকে মানুষ সজোরে নিক্ষিপ্ত হবে আত্মসমর্পণের নিরাপদ কোণে। কনকদ্বীপে প্রচলিত ধর্মসমূহের ব্যাখ্যা নানাভাবে করা যায়। এইসব ধর্মের বাণী, অনুশাসন ও বিধিনিষেধের ভাষাগুলি বর্তমানে দুর্বোধ্য বিধায় একই বাক্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দেশবাসীকে সর্বকালের জন্য অবনত, অনুগত ও বশবর্তী করে রাখা যায়। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রধান ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী, চতুর, সহজবশ্য ও আত্মমর্যাদা বোধহীন ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে নিয়োগ করার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নিজের দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা, নিজের মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীদের ধর্ষণে বিদেশী নরখাদক সেনাবাহিনীকে সহায়তাকারী কয়েকটি সারমেয় জাতীয় ইতর প্রাণী ২০.৩৪.১৫ উত্তর থেকে ২৬.৩৭ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮.৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ২.৪০.৫৫ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রজাতন্ত্রে সলাঙ্গুল বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। ধর্মের অপব্যাখ্যায় বিশ্বে এরা অদ্বিতীয়। হত্যা, ধর্ষণ, নরখাদক সেনাবাহিনীকে মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নী সরবরাহ প্রভৃতি মহৎ কর্ম থেকে শুরু করে চুরি, পকেটমার ও জালিয়াতি ইত্যাদি নিমমহৎ পেশায় কর্তব্য পালনের স্বার্থে ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদানে এরা বিরতিহীনভাবে পারদর্শিতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আসছে। এইসব ক্ষতবিশিষ্ট সারমেয় শাবকের অন্তত ২ ডজন অবিলম্বে সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে তাদের মহান রাষ্ট্রপতি সমীপে পত্র পাঠাবার জন্য ধর্ম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতি জরুরি নির্দেশ দেওয়া হলো।

২.০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুরের গভীর আগ্রহ গত এক দশকে বিশ্বের দেশে দেশে প্রশংসিত হয়েছে। এই দুটিকে তিনি একই মায়ের গর্ভজাত এবং/অথবা একই পিতার ঔরসজাত বিবেচনা করেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার মাননীয় ও উপমাননীয় নানা স্তরের ও নানা পর্যায়ের সদস্যগণ তাঁর কঠোর আদেশে একই মনোভাব পোষণ করেন। একই দুই ভাই বা ভাইবোন বা দুই বোনের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পরবর্তী শতাব্দীতে নিরাপদ অবতরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আগামী দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধনে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভুর আগ্রহ ও উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা এমন কি তাঁর পবিত্র দেহকমলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। কিন্তু পেশাগত কারণে ব্যায়াম, লম্ফঝম্প, দৌড় ও সাঁতারে অভিজ্ঞ মহামান্য প্রভু বাহাদুর শরীরকে সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষভাবে পারঙ্গম। উপরন্তু দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় দেহকে অগ্রাহ্য করতে তিনি সদা প্রস্তুত।

২.১. আগামী দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার শূন্য হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য মহান দাতা দেশগুলির সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধ ডজন মাননীয় মন্ত্রী, উপমাননীয় নিমমন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের

দিকবিদিক প্রেরণ করা হয়েছে। দাতা দেশসমূহের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা কখনোই তাদের ওপর থেকে আমাদের নির্ভরশীলতা বিন্দুমাত্র লাঘব করবে না। তাদের অর্থে গৃহীত প্রকল্পগুলি তাদের সদয় নির্দেশে এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে আমরা অনন্তকাল তাদের ওপরেই নির্ভরশীল থাকি। তাদের অধীনে থাকার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই, বড়োভাই আগে জন্ম গ্রহণ করেছে বলে ছোটোভাই কিছুমাত্র অপমান বোধ করে না। পিতার হাতে চপেটাঘাত ও শিক্ষকের হাতে বেত্রাঘাত প্রাপ্তির মতো দাতা দেশসমূহের পদাঘাত সেবন আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক। মহান রাষ্ট্রপ্রভু সেই প্রাচীন ধর্মমতের সেই বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল যেখানে জন্মসূত্রে নিম্নবর্ণের মানুষের পরম মোক্ষলাভ সম্ভব হয় কেবল উচ্চবর্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে। দাতাদেশ জন্মসূত্রে আমাদের প্রভু, তাদের পদাঘাতই আমাদের পরম আরাধ্য। তাদের পদাঘাত সেবনে কারো কারো অরুচি দেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, এমন কি নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিদেশী অনুদানের একটি সিংহভাগ অথবা ন্যূনপক্ষে মার্জারভাগ দান করে তাদের এই অরুচিব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা করা যায়। এতেও যারা আরোগ্য লাভ করবে না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুষ্ঠু চর্চা ও প্রয়োগের জন্য কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, কর্মচারী ও কর্মী নিয়োগের সময় সতর্ক থাকা দরকার যাতে ঐসব অনভিপ্রেত ব্যক্তিরা, কোনোক্রমেই স্থান না পায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতি আদেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন সহজবশ্য ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তুত করে ততোধিক জরুরি ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করে।

৩.০. আগামী দশক বর্তমান শতাব্দীর সর্বশেষ দশক হিসাবে অনুমোদন করায় দেশে শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ, শ্রম ও মনোযোগ বরাদ্দ করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুর সহৃদয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো অবগত করেছেন যে শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। একই সঙ্গে ক্ষোভ ও বিরক্তির সদয় প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি জানান যে মেরুদণ্ড সোজা রাখার পক্ষে একটি প্রচারণা দীর্ঘকাল ধরে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে। পেশাগত কারণে নানা প্রকারের দণ্ডের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে মেরুদণ্ড সোজা করে রাখা কখনোই স্বাস্থ্যসম্মত নয় এবং শিক্ষালাভ বা শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে সোজা মেরুদণ্ড অনুকূল হতে পারে না। ঋজু মেরুদণ্ডধারী ব্যক্তি ঝুঁকে বসতে নিতান্তই অক্ষম। অথচ পড়া ও লেখা-বিদ্যাচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় এই দুটি কাজ করতে হলে ঝুঁকে বসতে পারাটা একান্ত অপরিহার্য। এমন কি পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করে তিনি অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করেছেন যে সেখানে কাজ করতে হলে মেরুদণ্ডটিকে নানাভাব বাঁকাতে হয়। সুতরাং নব্বুই দশকে নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা নিয়ে দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে দেশের সকল শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষার্থীদের মেরুদণ্ড বাঁকা করার উদ্দেশ্যে

আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে তাদের সহায়তা করার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসককে প্রেষণে প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো। সন্তোষের সঙ্গে মহামান্য প্রভু বাহাদুর লক্ষ্য করেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রশাসনিক তৎপরতায় লিপ্ত কয়েকজন শিক্ষাবিদ যথার্থই বজ্রমেরুদণ্ডী প্রাণী। মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু থেকে শুরু করে মাননীয় মন্ত্রী, উপমাননীয় নিমমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্তা-ব্যক্তিদের পদলেহনে নিয়োজিত এই নধর মণীষীগণ মেরুদণ্ডের উৎপাতমুক্ত হওয়ায় নানা অঙ্গে নানা ভঙ্গিতে এই কর্ম সমাপনে দক্ষ। সদা এই মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয় বলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না, সেই প্রবণতা থেকেও এঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে দেশের শিক্ষার্থীগণ শিক্ষালাভের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হতে পারে। এইসব অনুগত বজ্রমেরুদণ্ডীগণ যাতে শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের আদর্শ বলে পরিগণিত হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.১. শতাব্দীর সর্বশেষ দশকে শিক্ষাখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি কিংবা একাধিক প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করে বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দাতা দেশসমূহ বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হস্তক্ষেপ আহ্বান করে একজন মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও বজ্রমেরুদণ্ডী শিক্ষাবিদকে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু স্বাক্ষরিত কাতর আমন্ত্রণলিপিসহ কয়েকটি উন্নত দেশে পাঠানো হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষায় তাদের উৎপাদনমুখী অবদান রাখার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষাপদ্ধতি নির্ণয়, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের যোগ্যতা নির্ধারণ, এমন কি শিক্ষক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য দাতা দেশসমূহের প্রতি করজোড়ে আবেদন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও পুঁজি বিনিয়োগকারীদের প্রত্যক্ষ ও যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে শতাব্দীর শেষ দশকটি সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপের স্মরণীয় কাল রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

৪. সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুর তীব্র ক্রোধ ও গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে আসছে। মেরুদণ্ড সোজা করে রাখার বাতিল ও পরিত্যক্ত নীতিকে এরা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, মহান দাতা দেশসমূহের অবাধ হস্তক্ষেপকে এরা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচনা করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারে এরা আপত্তি জানায় এবং ধর্মের রাষ্ট্রীয় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে প্রতিরোধের স্পৃহা এদের এখনো প্রবল! স্বাধীনচেতা বলে স্বঘোষিত এই জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভুর সরকার দৃঢ়সংকল্প। "স্বাধীনচেতা" কথাটি অস্বস্তিকর, সুদীর্ঘকাল ধরে শব্দটি দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে আসছে। এই অস্বস্তি ও বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আগামী দশক অর্থাৎ ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিন

অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখ থেকে শব্দটিকে বেয়াদব শব্দের সমার্থক বলে গণ্য করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। ঐদিন থেকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার বা তাদের বাক্য, কার্যকলাপ বা আচরণে স্বাধীনচেতা প্রমাণিত হলে তাকে বা তাদের সেই শাস্তি প্রদান করা হবে যা বর্তমানে বেয়াদবদের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যে এই ভাষার যে কোনো শব্দের অর্থ পরিবর্তন সাধনে সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার একটি সংশোধনীর দ্বারা এই সেনাপ্রজাতন্ত্রীর সংশোধনী-শোভিত শাসনতন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৫. সরকারী আদেশ পালনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভুর চক্ষুশূল। একবিংশ শতাব্দীতে নিরাপদ ও সফল অবতরণের লক্ষ্যে বর্তমান শতাব্দীর শেষ দশকে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকল্প যে কোনো মূল্যেই হোক এই দশকেই সম্পন্ন করতে হবে। এই দশকের মেয়াদকাল কোনোক্রমেই বৃদ্ধি করা হবে না বলে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভু বাহাদুর তাঁর কঠোর ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন প্রচারিত হলো।

স্বাক্ষর / অস্পষ্ট
প্রধান সচিব
রাষ্ট্রপ্রভুর সচিবালয়
সেনাপ্রজাতন্ত্রী কনকদ্বীপ সরকার।*

* "কনকদ্বীপ" নামটি সম্ভবত প্রতীকী

আমি ও আমার সময়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

No! I am not prince Hamlet, nor was meant to be; am an attendant Lord...

আমি কিন্তু তাও নই। ডেনমার্কের দোদুলচিত্ত রাজকুমারের পারিষদ পদের জন্যে দরখাস্ত করার মুরোদও আমার নেই।

১৯১৭ সালে টি, এস, এলিয়ট ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজকুমার হ্যামলেট চিরকালের জন্যে নির্বাসিত হয়েছে। নিজের সময়কে এলিয়ট ঠিক সনাক্ত করে ফেলেন, তার একটি নামকরণও করেছিলেন, জে, এ্যালফ্রেড প্রুফ্রক। নিজের বার্ধক্যের ভাবনায় সে নুয়ে পড়েছে, নিজের পরিণতির কথা ভেবে সে বড়ো ক্লান্ত। লোকটা দিব্যি দেখতে পারে, শাদা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার নিচের দিকে একটু গুটিয়ে পরে সে হেঁটে চলেছে সমুদ্র-সৈকত ধরে। তার চুল পেছনদিকে আঁচড়ানো। অগ্নিমান্দ্যের রোগী, প্রিয় ফলটি খেতে ভরসা হয় না। সে শুনছে যে মৎস্যকুমারীরা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গান করে, কিন্তু তার মনে হয় না যে তারা তার উদ্দেশ্যেও গান গাইতে পারে।

রেনেসাঁর জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষা এবং সংশয় ও সংকল্প নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, 'ব্যক্তি' বিশ শতকে তার ভাঙাচোরা চেহারা দেখে বিলাতের বিদগ্ধ কবি বিষণ্ণ হয়েছিলেন। বিষণ্ণ হওয়া সব লোকের সাজে না, তা হতে হলেও একজনের খানিকটা ওজন দরকার, আমার মতো মানুষ বড়োজোর মন খারাপ করতে পারে। কিন্তু আজ এই শতাব্দীর শেষে গরীব বাংলাদেশের তোতলা এক কলমচির সেভাবে মন খারাপ করার জো নেই, তার নিজের সময়ের সঙ্গে চার পাঁচজনকে যে পরিচয় করিয়ে দেবে কি করে কিছুতেই ঠাহর করতে পারে না।

আমার সময় মানে তো একেবারে অল্পস্বল্প ব্যাপার নয়। মানুষ যতোদিন কাজ করে সবটাই তার সময়ের আওতায় ভেতরেই পড়ে। জন্মের পর প্রথম কান্না থেকে শুরু করে শেষ নিশ্বাসটি ছাড়া পর্যন্ত সবই তার কাজের অন্তর্গত। চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেষবারের মতো ছাদের সিলিং দেখে নেওয়া-মুমূর্ষ মানুষের পক্ষে তাও কি কম শ্রমসাধ্য কাজ?

যতোদিন বাঁচি, সবটা সময় আমার বলেই গণ্য করবো।

কিন্তু এতোকাল ধরে বাঁচবার পরও বুঝতে পাচ্ছি না, এই সময়কে সনাক্ত করবো কি দিয়ে? এর কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে একে পরিচিত করি? আলো, অন্ধকার, সাদা, কালো, লাল, নীল, খাকি, সবুজ, উজ্জ্বল, ম্লান-এর নানান চেহারার মধ্যে আসল কোনটা? কোনটা ঠিক?

তাহলে শুরু করতে হয় শুরু থেকে। জন্ম হয়েছিলো দুর্ভিক্ষের সময়। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে বাঙলার লাখ লাখ লোক স্রেফ না খেতে পেয়ে সাফ হয়ে গেলো, সেই সুযোগে মায়ের পেট থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে তাদের একজনের জায়গা দখল করে বসি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন চার বছর চলছে, যদি মহাপুরুষ হতাম তো জন্মের মুহূর্তে যুদ্ধ থেমে যেতো। না, সেরকম কোনো লক্ষণ ছিলো না, যুদ্ধ অব্যাহত রইলো। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির জন্যে দেশবাসীর সংগ্রাম চলছিলো, আমার জন্মের ঠিক সাড়ে চার বছর পর স্বাধীনতা অর্বিভূত হলেন। সঙ্গে এলেন কে?-না, দাঙ্গা। যে বিপুল জনগোষ্ঠি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ

করে তারাই আবার দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে একে অপরের ঘাড় মটকায়। -এই দুটো ব্যাপার কি এক হলো? আমার সময়কে আমি চিহ্নিত করবো কোনটা দিয়ে? স্বাধীনতা আসে, সঙ্গে গৃহহীন হয় কোটি-কোটি মানুষ। কোনটাকে গুরুত্ব দেবো? যে লোকটি নিজের বন্ধুর হাতে খুন হয় তার কাছে নিজের প্রাণের দাম কি স্বাধীনতার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো? স্বাধীনতা যে মানুষের মুক্তিকে সঙ্গে করে আনেনি তা বুঝতে বেশিদিন লাগলো না। মানুষের হতাশাকেই কি পরম সত্য বলে বিবেচনা করবো?-দেখতে দেখতে ভাষা আন্দোলন নতুন করে নাড়া দিলো। তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, কিন্তু মানুষের বিক্ষোভের মাত্রা দেখে বুঝতে পারি যে দেশের সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ধাক্কাটা গিয়ে লেগেছিলো নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিতে, সেখানে চিড় ধরে তখনি, দিন গেছে এই চিড় পরিণত হতে ফাটলে।

ভাষা আন্দোলনের বিজয় দেখতে না দেখতে নেতাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়, বড়ো নেতাদের ছোটালোকামি দেখে কে বলবে যে এদেরই সামনে রেখে দেশের মানুষ কি শক্ত দুর্গের পতন ঘটিয়েছিলো। এদের মারামারি অছিলা করে আসে সামরিক শাসন। কৈশোর পার হচ্ছি তখন, সদ্য কলেজে ঢুকেছি, ঐ যে সেনাবাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম, সারাটা যৌবনকালে চলে গেলো তারই সাঁড়াশির ভেতর, আজও তা থেকে রেহাই মিললো না। মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে, যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ যে পক্বকেশ প্রৌঢ়, তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা দেশের মানুষের মতো হতে পারে? তার ক্ষোভ তার গ্লানি, তার ব্যর্থতা, তার অসহায়ত্ব, তার অসন্তোষ-এসবই কি আমার সময়ের প্রধান পরিচয়?

কিন্তু এই পাথর-চাপা জনগোষ্ঠি স্রেফ বাঁচার তাগিদেই মাথা ঝাঁকায়। ১৯৬২ সালের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন আমরা ঘোরতর যুবক। একেকটা দিন যায় আর এই প্রতিরোধ ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে। ফুলে-ফেঁপে উঠতে উঠতে এটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোথায়? ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্যানভাস করার কাজে। সামরিক শাসন মানুষকে যে কতোটা অসহায় করে তোলে তার প্রমাণ এই যে, আইয়ুব খানকে হটানো ছাড়া মানুষের এই বিক্ষোভ আর কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। আইয়ুব খান কিন্তু টিঁকে থাকে। বন্দুকের জোর ছিলো, আর নির্বাচনের কল্যাণে গ্রামে-গ্রামে তার ভৃত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, এরা নতুন এলিট, এদের নাম বেসিক ডেমোক্র্যাট। আইয়ুব খানের রাষ্ট্র প্রসারিত হয় নিভৃত গ্রামে, চুরি-জোচ্চুরি ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে কানাচে। রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নির্যাতনই যদি সেই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করি তবে ১৯৬৯ সালের বিদ্রোহকে ঠাঁই দিই কোথায়? আমার জীবনে, এই প্রথম একটি আন্দোলন দেখেছি যেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এসেছিলো যাতে শুধু রাষ্ট্র নয়, সামাজিক শোষণ পদ্ধতিটিই আক্রান্ত হয়েছিলো। সেখানে শোষক বলে চিহ্নিত হয় তারাই যারা যুগ যুগ ধরে শোষণের কর্মটি করে এসেছে। সে বাঙালি না পাঞ্জাবি, বিহারি না হিন্দু এ নিয়ে কারো মাথাব্যাথা ছিলো না। এই আন্দোলনই কি আমার সময়কে পরিচিত করিয়ে দেবে? তাহলে কি তাদের কথা বলবো, না যারা এই বিশাল বিক্ষোভকে কেটে-ছেঁটে ব্যবহার করলো মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবোধ চাগিয়ে তোলার কর্মে, তাদেরও ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে, রক্ত দিয়ে কার্ফ্যু

ধুয়ে মানুষ যাদের ছিনিয়ে আনে; বেরিয়ে এসে তারা তৎপর হয় আন্দোলানকে নেতিয়ে দেওয়ার কাজে, -এটাও তো ঘটেছে আমার সময়েই। আমার সময় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ দিয়ে আঁকা। সাড়ে চার বছর বয়স থেকে 'চাঁদ তার শাদা আর সবুজ নিশান' বলে গলা হাঁকড়িয়ে মারেছি, সেই নিশানের ফাঁস দিয়ে মারা হলো অসংখ্য মানুষকে।

ফের স্বাধীনতা আসে। এবার স্বাধীনতা নম্বর ২।

সঙ্গে আসে কে? মুক্তি? -না, সঙ্গে আসে নতুন লাঠি কোমর বেঁধেছে। নতুন পতাকার দণ্ড হাতে নিয়ে নতুন শাসক সেই ডাণ্ডা চালায় দেশের মার-খাওয়া মানুষের ওপর। কখনো মাথায় বাড়ি, কখনো পেটে লাথি। আবার দুর্ভিক্ষ। এবার জন্ম হলো আমার ছেলের। ছেলে জন্মে দেখে হাজার হাজার মানুষ মরে যাচ্ছে স্রেফ না খেতে পেয়ে। পাশাপাশি রাজার মেয়ের বিয়ে হয়, মাথায় তার সোনার মুকুট। -কোনটা ঠিক? -স্বাধীনতা? না দুর্ভিক্ষ ও রাজরাজড়ার বিয়ে সোনার মুকুট দিয়ে?

আবার এক রাতে রাতারাতি ডাণ্ডার হাত বদল ঘটে। ডাণ্ডা, তুমি কার? -না, যে আমাকে কব্জা করতে পারে তার। এবার ডাণ্ডা দখল করেছে পেশাদার ঠ্যাঙাড়েরা। এদের মনিব থাকে বাইরে, সমুদ্রের ওপার পাহাড়ের ওপার। মনিবের লেলিয়ে দেওয়া ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশবাসীর ওপর। দেশবাসীর, যারা নিরন্ন, যাদের পরনে জামা নেই, হাতে হাতিয়ার নেই। মেশিনগান, স্টেনগান, ট্যাঙ্ক চালিয়ে ঠ্যাঙাড়েরা দফায় দফায় আসে। ঘেউ ঘেউ করে হুঙ্কার ছাড়ে, কিছুদিন খুব তোড়ে মানুষ মেরে হয়রান হয়ে পড়লে রিমোট কন্ট্রোল থেকে মালিকহুজুর তু তু করে হুকুম ছাড়ে, এবার গণতন্ত্র ছাড়ো। ঠ্যাঙাড়েরা তখন ট্যাঙ্কের ওপর বসে গণতন্ত্র বিলি করে। তাতে কাজ একটা হয় বৈকি। কতো বড়ো-বড়ো নেতাদের কতো রঙ যে তখন দেখা যায়। আমার প্রথম যৌবনে সমাজকাঠামো বদলে দেয়ার জন্যে যাদের হাঁক-ডাক শুনে মহামানব বলে গণ্য করেছি, আজ মালপানি আর ডাণ্ডার ভাগ নেওয়ার লোভে তারাই আবার নিজেদের মুখু থেকে ল্যাজ পর্যন্ত বিক্রি করে দিল ঠ্যাঙাড়েদের কাছে। তাদের যে জিভ আগুনের শিখা হয়ে ধক ধক করে জ্বলতো আজ তাই আবার লোমচাঁছা ল্যাজ হয়ে নড়াচড়া করে মালিক-হুজুরের স্তুতিতে। -এদের সম্বন্ধে কি বলবো? এও তো সত্যি যে, তাদের কেউ কেউ সত্যি একদিন মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। আজ তারা লুটেরা লুম্পেন। আমার সময় তাদের কোন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবে?

কোনটা সত্যি? মধ্যযুগীয় নরখাদকদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া জন্যে মরণপণ যুদ্ধে মেতেছিলো সমগ্র দেশবাসী-সেটা? নাকি নিজেদের মা বোন বৌকে ভোগ করার জন্যে নরখাদকদের হাতে তুলে দিয়েছিলো যেসব ধার্মান্ধ জানোয়ার তাদের দেশ দখলের সদর্প আয়োজন? কোনটা?

যে সময় আমার কাছে কোনো নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয় না, আমিই বা সেখানে বিশিষ্ট হবো কোন শক্তিতে? আমার সময়ের দেওয়ালের ভেতর আমি শুধু হাঁসফাঁস করি। এভাবে বাঁচা মুশকিল। তাই কোনো বড় কিছু করার জন্যে নয়, এমনি বাঁচার তাগিদে, নিশ্বাস দেওয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দেওয়ালের ওপারটা দেখার চেষ্টা করি। ওপারে কি?-আমার জন্মমৃত্যুর বাইরে, বিশাল ও অনন্ত সময়। যতোদূর দেখা যায়, আমার এই +২ ও -৩ পাওয়ারের বাইফোকল চশমা-চাপা যতোটা পারি দেখে নিই। দেখতে-দেখতে বুক

কাঁপে। আরে, সেখানেও আমি। অতীতের যতোটা চোখে পড়ে ততোটা জায়গা জুড়ে আমার বসবাস। দেখতে-দেখতে দিব্যি চলে যাই সেই আদিম সময়ে, বোধহয় তারো ওপারে, যেখানে বিশাল জলরাশির ভেতর প্রাণের একটি বিন্দু হয়ে বুদ্‌বুদ্‌ করে ভাসছি। তারপর দেখি আরো কতোজনের সঙ্গে আমি, হ্যাঁ এই ভীতু ও মন-খারাপ-করা আমি, ডাঙায় ওঠার জন্যে তীরের মাটি ধরার চেষ্টায় একনিষ্ঠভাবে মগ্ন। শেষ পর্যন্ত ডাঙায় উঠেও পড়েছি। তার পর কতো সব জানোয়ারের মার খেয়ে, কতো জানোয়ারকে মেরে, বৃষ্টিতে ধুয়ে, রোদে পুড়ে এতোটা পথ পেরিয়ে আটক পড়েছি এখানে এসে। এখানে আমার ওপর পাথরের মতো চেপে বসতে চাইছে অতিকায় কোনো জীব। আমার সমান বয়সি এক কবি জ্বরের মধ্যে বিড়বিড় করে,

সারারাত ভরে এই হাতিটি (মূলত ইঁদুর)
আমার বুকে দুটি ভারি পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে
অনড়, নিশ্চল-

তার কথা শুনে বুজতে পারি আমি একা নই। ওদিকে জানোয়ারটির দাপট ক্রমেই বাড়ে। আমার সময়ের দেওয়ালের ওপার দেখার কোনো সুযোগই সে আমাকে দেবে না। প্রথমে তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি গা ঝাড়া দিই। তাকে গুওরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলে খিস্তি ঝাড়ি। গুওরের বাচ্চা তবু যাবে না। এদিকে আমার তো মরণ দশা। তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে চাই। আমার জোড়া হাতে ঠেলে ফেলার উদ্যোগ নিলে বুঝতে পারি অতো বড়ো আকারের জানোয়ার সেটা নয়। না, সেটা হাতি নয়। রফিক আজাদের মতো আমিও ওটাকে হাতি বলে ভুল করেছিলাম। এমনকি গুওর বা গুওরের বাচ্চাও নয়। ইঁদুরের পয়দা হয়ে ইতর জীবটি কি না 'দাঁতে কেটে কুটে দর্পভরে হাঁটাচলা করে!'

ইঁদুরটার বাড়াবাড়ি সমস্ত সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। তাই তাকে একেবারে শেষ করে ফেলার তাগিদও ক্রমে জোরালো হচ্ছে। তাকে শেষ করতে পারি কি নাই পরি মরিয়া হয়ে আমাকে একবার লাগতে তো হবেই। হয়তো কে জানে, ভবিষ্যতের সময় আমার এই টুটাফাটা, পঙ্গু ও রুগ্ন সময়কে সেই ইতর জীবটির সঙ্গে লড়াই করার সময় বলে সনাক্ত করবে। সেই ভরসাতেই বাঁচি। তোতলা কলম নিয়েও তাই একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করি!!

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিঠিপত্র

১অগাষ্ট ১৯৯৬

প্রিয় মহাশ্বেতাদি,

আপনার পঞ্চাশটি গল্পের সংকলন উর্মি ও সাগর আমাকে দিয়ে গেছেন যথাসময়ে। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার চিঠি লেখা উচিত ছিলো। কিন্তু বাদ সাধলো বইটিতে আপনার স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠায় আমার'চিলেকোঠার সেপাই' সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য। ওটা পড়ে আমি দারুন উচ্ছাসিত হয়ে পড়ি, উচ্ছাসের সঙ্গে থাকে প্রবল উত্তেজনা। অতো উত্তেজনা নিয়ে কিছু লেখা মুশকিল। দিন যায়, উত্তেজনা আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ে। আপনার মন্তব্য তখন হয়ে ওঠে প্রেরণা। প্রায় ছয় মাস পর আমার বহুকালের প্ল্যান করা উপন্যাসটি লিখতে শুরু করি। এই প্রেরণার জন্যে আপনি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানবেন।

এই উপন্যাসের লোকজন যেখানে বাস করে ঐ জায়গাটি আপনার চেনা, 'এককড়ির সাধ'-এর নায়কের বাড়িও সেখানেই। মহাস্থান আমার বাড়ি বগুড়া থেকে মাত্র ছয় মাইল। ছেলেবেলা থেকেই প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর বিশাল ধ্বংসাবশের প্রায় সবটাই আমি চষে বেড়াচ্ছি, বেশির ভাগ সময় একা, মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে। বগুড়া শহরের উত্তরে সুবিল একটা জায়গা আছে, পুন্ড্রনগরীর শুরু বলতে গেলে সেখান থেকেই। তারপর গোকুল, সেখানে বিশাল একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তুপ, গোকুল পেরিয়ে মহাস্থান ওখানে এখন একটা মিউজিয়াম, মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে আরো মাইল ছয়েক গেলে শিবগঞ্জ, সেটাও কিন্তু প্রাচীন পুন্ড্রনগরীর অংশ। আপনার এককড়ি করতোয়ার জলে মহাস্থানের ভাঙাচোরা প্রাসাদের লাল ইঁটের ছায়া দেখেছিলো, মনে আছে? আমার উপন্যাসের লোকজন বাস করে সেই করতোয়ার তীরে। তবে ঐ লাল ছায়া কতোবার যে কায়া পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই দিব্যোক আর ভীমের কৈবর্ত বিদ্রোহের আমল থেকে মজনু শাহের ফকির বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অজস্র মানুষের রক্তে। এমন কি, শুনেছি যে, বৌদ্ধদের অহিংসা ধর্ম প্রচারের সময় এখানে কয়েক হাজার জৈন সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছে ।

ঐসব জায়গায় অনেক ঘুরেছি । দেখেছি, কি করে একটি গল্প পরিণত হয় মিথে। এই গল্পটা একটু বলি? -গোকুলের বৌদ্ধ বিহারের বিশাল ধ্বংসাবশেষকে ওখানকার মানুষ মনে করে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি, লখিন্দরকে সাপে কাটে ওখানেই। এটা একেবারেই গল্প। কিন্তু এই গল্পের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য ওখানে একটি হাটের নাম চাঁদ সওদাগরের হাট। আবার বিলের নাম কালিদহ সাগর, সেখানে নাকি অনেক সাপের বসবাস। আবর একটি টিলা, সেটা খুঁড়লে প্রাচীনকালের কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। ঐ টিলাকে বলা হয় ধন্বন্তরির বাড়ি এবং পাশের একটি ভাঙাচোরা বাড়ি হয়ে গেছে ধন্বন্তরির ওষুধের কারখানা। গোটা এলাকার মানুষ এখন পর্যন্ত সাপ তাড়াবার জন্যে ধন্বন্তরির ভিটে থেকে মাটি নিয়ে ছড়িয়ে দেয় নিজেদের বাড়ির চারপাশে।

আমি অবশ্য থাকতে চাই ১৯৭১-এর যুদ্ধের মধ্যে। কিন্তু তা হলে কি জায়গাটিকে ইজ্জত করা হবে? তাই বড়ো বিপাকে পড়েছি। উপন্যাস লেখার আগে আমি মেলা নোট

টোট নিই, স্কিমও একটা করে ফেলি। কিন্তু একবার লিখতে শুরু করলে সব ওলট পালট হয়ে যায়, চরিত্ররা বাহাদুর হয়ে ওঠে, আমার শাসন মানতে চায় না। আর একটা মুশকিল হয়েছে। লেখার সময়, মানে লিখতে লিখতে ঐ জায়গাটায় আমাকে বারবার যেতে হবে। আরো মানুষের মুখের গল্প শুনতে হবে। কিন্তু এই মার্চে ক্যানসারের উৎপাত থেকে রেহাই দিতে ডাক্তাররা আমার ডান পায়ের গোটাটাই কেটে ফেলেছেন। এখন ক্রাচে ভর করে হাঁটি। কিন্তু এভাবে কি ওখানকার উঁচু নিচু জায়গাগুলো পেরুতে পারবো? বলতে কি, ওখানে যাবার জন্যই আমি প্রাণপনে ক্রাচে হাঁটা রপ্ত করার চেষ্টা করছি। মাস দুয়েক পর বগুড়া যাবো, তখন মহাস্থানে গিয়ে দেখবো কতোটা হাঁটা যায়।

এবার কলকাতা গিয়ে পুরো তিন মাস ছিলাম। সবটা সময় কেটেছে শুয়ে শুয়ে, কখনো পার্ক সার্কাসে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে, কখনো কোনো নার্সিং হোমে। তবে কলকাতার পুরনো ও নতুন বন্ধুরা প্রত্যেক দিন আমার কাছে আসতেন। খুব আড্ডা দিয়েছি, প্রাণ খুলে কথা বলেছি। কিন্তু কোথাও যাওয়া হয়নি।

আপনি এখন কি লিখছেন? এখানে আপনার অনুরাগী পাঠক অনেক, তাদের মধ্যে আমিও একজন। আপনার কি ঢাকায় আসতে ইচ্ছা করে না? একবার আসুন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। আশা করি ভালো আছেন। সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা ও ভালোবাস জানাবেন। ইতি

প্রিয় শান্তিময়বাবু,

আপনার সংকলিত চাকমা রূপকথা 'টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ' আমার খুব ভালো লাগলো। আপনার রচনারীতি অত্যন্ত পরিণত, গল্প বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয়। এই লেখাটির জন্য আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

মৃত্তিকাবাবুর কাছে হয়তো শুনেছেন যে ১৯৯৪ সালে প্রচলনের উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড যে বাঙলা পাঠ্য বই প্রণয়ন করছে তার একজন লেখক ও সম্পাদক হিসাবে আমি কাজ করছি। কয়েক বছর আগে ওরা সব ক্লাসের পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে, সেখান থেকে এক চুল সরা খুব কঠিন কাজ। আর আমি ওদের কোনো কাজে জড়িত হলাম জীবনে এই প্রথম। যাক, তবু অনেক বলে চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইতে রূপকথা হিসাবে ওদের নির্ধারিত গালিভারের গল্প বাদ দিয়েএকটি চাকমা রূপকথা সংযোজন করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করানো গেছে। আপনার ঐ গল্পটিকে আমি একটু সম্পাদনা করে এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। তবে এই বইতে খুব প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান লেখক ছাড়া (যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী ও সুকুমার রায়) কোনো গদ্য রচনায় কারেরা নাম তাকবে না। গল্পটি সম্পাদনা করার সময় ছোটো ছেলেমেয়েদের উপযোগী করার জন্যে কিছু অদলবদল করতে হবে। আপনি দয়া করে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

১.গল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন এলাকায় এবং আনুমানিক কতোদিন হলো প্রচলিত রয়েছে? আপনি আপনার ছেলেবেলায় গল্পটি কি শুনেছেন? গল্পটি আগে কি কোথাও কোনো পত্রিকায় বা কোনো বইতে ছাপা হয়েছে? হয়ে থাকলে মুদিত কাগজের ফটোকপি পাঠাবেন।

২.রোংরাং কি পৌরাণিক পাখি? না-কি এই নামে সত্যি সত্যি কোন পাখি পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনো ছিলো? এই পাখি দেখতে কেমন? আমাদের পরিচিত কোনো পাখির সঙ্গে এর কি তুলনা দেওয়া চলে?

৩.চিবিদ গাছ কি? এই গাছ কি কাল্পনিক বা পৌরাণিক? গাছটি দেখতে আমাদের পরিচিত কোন গাছের মতো?

৪.রাঙামাটির উপজাতি সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউটের প্রকাশিত চাকমা রূপকথার কোনো বইতে কি গল্পটা পাওয়া যায়? পেলে আপনি কি ঐ বইয়ের এক কপি আমাকে দয়া করে পাঠাতে পারেন?

৪.রাঙামাটির উপজাতি সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউটের প্রকাশিত চাকমা রূপকথার কোনো বই তে কি গল্পটা পাওয়া যায়? পেলে আপনি কি ঐ বইয়ের এক কপি আমাকে দয়া করে পাঠাতে পারেন?

আপনাকে আমার বলি যে, বইয়ের ইনারে সম্পাদক ও লেখক হিসাবে আমাদের পাঁচজন নিযুক্ত সম্পাদক ও লেখকের নাম থাকলেও কে কোন গদ্যরচনা লিখলো তা'র কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে আমি ঢাকার প্রথম শ্রেণীর কোনো পত্রিকায় মর্যদার সঙ্গে আপনার নামে এই লেখাটি প্রকাশের আয়োজন করবো যাতে এই চমৎকার রচনাটির সংকলক ও কথক হিসাবে আপনি আপনার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত না হন।

এবার একটি অপ্রিয় কাজ করতে অনুরোধ করি। এই অনুরোধ আমি মৃত্তিকাবাবুকেও করেছি। আপনার লেখাটি যে যথাযত একটি চাকমা রূপকথা এব্যাপারে আমি নিশ্চিত বলেই লেখাটি রূপকথা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে এ সম্বন্ধে আরো দলিল দাবি করেছে। রাঙামাটি উপজাতি সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে ওদের ওপর বোর্ড সম্পূর্ণ আস্থা পোষণ করে। আপনি যদি একটু কষ্ট করে ওদের প্রধান কিংবা আর কাউকে দিয়ে এই মর্মে একটি চিঠি লিখিয়ে নেন তো ভালো হয়। ঐ চিঠি আমার ঠিকানায় পাঠালে ভালো হয়। আপনার মতামত, অনুমতি ও ঐ অনুমোদন এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার হাতে পৌঁছানো খুব দরকার। আশা করি কিছু মনে না করে আপনি পাঠিয়ে দেবেন।

বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সঙ্গে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'তৃণমূল' সম্পাদনা করি আমি। আমাদের এই পত্রিকায় লেখার জন্যে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। চাকমা ভাষার প্রচলিত ছড়া, গান বা লোকগাথা কি অনুবাদ করে পাঠাতে পারেন? আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতির ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আপনি কি এই উদ্যোগে আমাদের সাহায্য করবেন? চাকমা ভাষার লোকসাহিত্য, ছড়া কিংবা কবিতা নিয়ে যদি একটি আলোচনা লিখে পাঠান তা হলেও খুব ভালো হয়।

আপনি কি চাকমা ভাষাতেও সাহিত্যচর্চা করেন? আপনার বাঙলা গদ্য অত্যন্ত উঁচু মানের। চাকমা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির বাংলা অনুবাদ করলে তা আমাদের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে বলে আমি নিশ্চিত।

আপনার লেখা পড়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে। আমি নিজেও বাঙলা ভাষায় কথা সাহিত্যের একটু আধটু চর্চা করি।

এখন কি লিখছেন? চাকমা ভাষায় লেখেন তো বাঙলা অনুবাদ করে পাঠাবেন। আমি এবং আমার বন্ধুরা পড়তে পারলে সত্যি খুশি হবো।

আশা করি ভালো আছেন। এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ প্রশ্নগুলির জবাব এবং চাকমা সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের ঐ চিঠিটি পাঠিয়ে দেন তো আমার কাজ করতে সুবিধা হতো। এখানে আমি ওদের আস্থা অর্জন করতে পারলে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস, সমাজপাঠ প্রভৃতি বইতে চাকমা, মুরং, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতিসমূহ সম্বন্ধে লেখা সংযোজন করার উদ্যোগ নিতে পারি।

এর মধ্যে ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমার টেলিফোন নম্বর ২৪২ ৯৮৮।

আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা নেবেন। ইতি -

আখতারুজ্জমান ইলিয়াস।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯১

প্রিয় মামুন,

তোমার ১১ তারিখে লেখা চিঠি পেলাম আজ, আমার এই চিঠি পেতে তোমার কতদিন যে লাগবে কিংবা আদৌ পাবে কি-না কে জানে? চিঠিটা যদি শেষ পর্যন্ত তোমার ঘর পর্যন্ত যায় তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিও।

'লিরিক' যে কেন আমাকে নিয়ে সংখ্যা বের করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমার লেখা যদি ওদের ভালো লাগে তো বারবার পড়লেই তো পারে। এজাজ ইউসুফী এবং ওদের আরো কয়েকজন ছেলে ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করেছে, আড্ডা দিয়ে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু অনেক যুক্তি দিয়েও ওদের নিরস্ত করতে পারিনি। ওরা তোমাকেও ধরবে আমার ওপর লিখতে তা আমি কখনোই ভাবিনি। কয়েকদিন আগে এজাজের চিঠিতে এই খবরটি পেয়ে খুব বিব্রত হই, তোমার চিঠি পড়ে রীতিমতো অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। আমার মনে হয় এসব ফালতু কাজে তুমি না জড়ালেই ভালো করতে। তোমাকে অনেক বড়ো কাজ করতে হবে এবং এই লেখকদের নিয়ে মাতামাতি করতে গেলে আসল কাজ বিঘ্নিত হবে। বিখ্যাত লোকে পরিণত হওয়ার পর এমন অনেক জিনিষ আমাকে লিখতে হয় যাকে সাহিত্যিক কাজ বলা যায় না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর লিখতে রাজি হওয়ার খেসারত আজও চলেছি। পত্রিকাগুলো যে কেন গাদা গাদা প্রশ্ন পাঠায় আমার মাথায় ঢোকে না। এসব প্রশ্নের জবাব কে পড়ে, পড়ে যে কি লাভ হয়, তা বোধহয় পত্রিকাওয়ালারাও জানে না। আমার লেখা কজন লোক পড়েছে যে আমার সাহিত্যকর্মের ওপর প্রবন্ধ লিখতে হবে? এর মধ্যে আবার ছোটগল্প মরে যাচ্ছে কি-না, এই নিয়ে একটা বস্তু খাড়া করতে গিয়ে আমার যে কি নাকানি চোবানি খেতে হলো সে তোমাকে কি বলবো। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে এসব কাজ আমার কাছে অসহ্য ঠেকে, কেবল লোকের সঙ্গে

খারাপ ব্যবহার করতে পারি না বলে এবং দুর্বল ব্যক্তিত্বের চরিত্র বলে হেঁ হেঁ করে সব মেনে নিই। মাঝে মাঝে মনে হয়, বদলি নিয়ে বগুড়া চলে যাই। তা সে জন্যেও বুকের পাটা দরকার, ওটা থাকলে ঢাকায় বসেও নিজের মতো করে কাজ করা যেতো।

যাক, লিরিকের ফাঁদে যখন পা দিয়েছি, না পেরে হোক কিংবা লোভে হোক একবার আত্মসমর্পণ করেই ফেলেছি, তখন ওদের দীর্ঘ প্রশ্নমালার জবাব যথাসাধ্য ঠিকমতো দেওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। তবে ভরসা এই যে, শাহদুজ্জামান একবার ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে জবাবগুলো শুনে নেবে। ওর ওপর আমার আস্থা খুব দৃঢ়, মিউজিক কলেজে বসে অনেক দিন ঘন্টার পর ঘন্টা ওর সঙ্গে তুমুল আড্ডা দিয়েছি। প্রখর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ছেলে, প্রচুর পড়াশোনা করে, সাহিত্যবোধও তীক্ষ্ণ ও গভীর। আবার বেশ বুদ্ধিমানও বটে, আমার মুখ থেকে এখন সব কথা বের করে নিতে পারবে যা আমি একা একা ভাবতেও পারবো না।

'সায়েবদের গান্ধি' নামে আমার একটি লেখা বেড়িয়েছিল 'সংস্কৃতি' পত্রিকায়, বেশ কয়েক বছর আগে। এটা ছিলো 'গান্ধি' নামে সেই বিখ্যাত চলচ্চিত্রের আলোচনা। তোমার চিঠি পেয়ে লেখাটা অনেক খুঁজলাম, কোথাও পেলাম না। নিশ্চয়ই বইপত্রের স্তূপে কোথাও আছে, পরে পেলে তোমাকে ফটোকপি পাঠিয়ে দেবো। যদ্দুর মনে পড়ে ১৯৮১/৮২ সালে লেখা, বদরুদ্দীন উমর সাহেবের সঙ্গে তখনো আমার পরিচয় হয়নি, ডিলু দেশে ছিলো, কারণ ওর হাতেই লেখাটি উমর সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার এই লেখাটি মোটের ওপর ভালোই। তা এটা দিয়ে তুমি করবে কি?

আমার ওপর কিছু লেখার জন্যে তোমার প্রাণ যদি একেবারে আইঢাই করে তো আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করলে খুশি হবো। তবে মুশকিল হলো এই যে, আমার মরতে এখনো ঢের দেরি। শরীরটা গ্রাম্য ধরণের টাইট, জন্ডিস হতে না হতে এমনি সারা সারলো যে অনেক দিন জ্বরটর কিছুই হয় না। ডায়াবেটিস একবার উঁকি দিয়ে সেই যে ডুব দিলো, ব্লাড শুগার ৮০-এর ওপর চড়ে না। তবে তুতুল এবং আম্মা বোধহয় আমার নিরোগ হওয়ার দন্ড দিচ্ছেন নিজেরা রোগে ভুগে ভুগে। একজনের ব্লাডপ্রেশার ভয়ানক ওঠানামা করছে, রক্তে ক্রিটিনাইনের (উচ্চারণ ঠিক হলো?)অনুপাত বেড়ে যাওয়ায় ওর কিডনি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আর আমার ইউরিন ইনফেকশন, এতো এতো এ্যান্টিবায়োটিকেও ঠেকানো যাচ্ছে না।

দুটো খবর দিই। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর১৯৯১ তারিখে মহিবুল আজিজ বিয়ে করলো। ভাগ্যবতী কন্যাটি ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ায়, এবার কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছে, পি.এইচ.ডি করতে আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর লন্ডন রওয়ানা হচ্ছে। বিয়ে হলো কন্যার বাবার বাড়িতে, মোহাম্মদপুরে। দুই একদিনের নোটিশেই শুভকর্মটি সম্পন্ন করলো বলে তেমন কাউকে বলতেও পারেনি। এদিক থেকে উমর সাহেব, আনু এবং আমি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।খাওয়া দাওয়া অতি চমৎকার। ২৬ তারিখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নববধূকে এ্যারোপ্লেনে উঠিয়ে দিয়ে মহীবুল চট্টগ্রাম ফিরে যাবে। মনে হয় কয়েক মাস পর মহিবুলও ইংল্যান্ড যাবে।

পার্থ ষ্টার নিয়ে এস. এস. সি পাশ করেছে, গণিত, উচ্চতর গণিত এবং বিজ্ঞানে লেটার পেয়েছে। আমি বেশ খুশি, তবে ওর টিচাররা আশা করেছিলেন যে ও ইংরেজি ও ভূগোলেও লেটার পাবে। তুতুলও ওর আরো ভালো রেজাল্ট আশা করছিলো। আমার তো মনে হয় ভলোই করেছে। ওর ভাষা শিক্ষার সাধনা সন্তোষজনক। ক্লাস ওয়ান থেকে টুতে উঠেছে ফার্স্ট হয়ে। একদিন বাসে অশোকের সঙ্গে দ্যাখা, অশোকও ফ্রেঞ্চ পড়ে, এবার ক্লাস ফোরে।

কলেজে এইচ. এস. সি পরীক্ষা পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব আমার ওপর চাপানো হয়েছে বলে দিনরাত কলেজেই থাকি। সকাল সাড়ে সাতটায় বাড়ি থেকে বেরুই, ফিরি রাত নটায়, ২৮ তারিখ পর্যন্ত এরকম চলবে। তোমার শিবরামপুরের কথা এবার কিছুই লেখোনি কেন? কি লিখছো এখন? লেখার শ্রেষ্ঠ সময় চলে যাচ্ছে, যতো পারো লিখবে। গল্প লিখবে। গল্প লিখলে একটা আজই পাঠিয়ে দাও, আমার সম্পাদনায় লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা বেরুবে আগামী নভেম্বরে। তোমার গল্প চাইতেও ভয় করে। একটা পাঠাবে? আজই পাঠাও। আর নতুন পোষ্টিং-এর কথা লিখেছো, এর মানে কি? আবার কোথায় পাঠাচ্ছে? কেমন আছো, জানাবে। চিঠি দিও, গল্প দিও। অন্তত একটা ভালো পত্রিকা সম্পাদনার সুযোগ আমাকে দাও। ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে।

ইতি

২০ অগাষ্ট ১৯৯৬

প্রিয় ঝিমলি,

কয়েকদিন আগে তোমাদের চিঠি দিয়েছি, আশা করি পেয়েছো। শাহীন এর কধ্যে একদিন এসে তোমাদের প্রস্তাবিত সংকলনের কয়েকটি লেখা দিয়ে গেছে। সবগুলো পড়লাম। আরো লেখা পেলে ভূমিকা লেখার কাজটা শুরু করবো। তবে তোমাকে ফের বলি, এই কাজের জন্যে তোমরা উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করোনি। আমার বোলচাল বাখোয়াজি দেখে তোমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছো। এখনো সময় আছে, যোগ্য লোক বেছে নাও। আমার লেখা ভূমিকা দেখে তখন পস্তাবার চেয়ে আগে ভাগে সাবধান হওয়া কি ভালো নয়?

তোমাকে একটি পুরনো বইয়ের ফটোকপি পাঠাচ্ছি। ' বিধবা গঞ্জনা' নামে এই বইটির লেখক মুনসি মেহেরুল্লাহ্ । পন্ডিত লোকদের কাছে শুনেছি ১৮৯০-এর দশকে কলকাতা থেকে বইটি ছাপা হয়। মেহেরুল্লাহ্ যশোরের লোক। খুব গোঁড়া মুসলমান, তাঁর প্রধান কাজ ছিলো খৃষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারে বাধা দেওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মের গৌরব ও মহাত্ম প্রচার করে ছোটো ছোটো বই লেখা।

এই বইটাতেও ইসলাম ধর্মের মাহাত্মই খানিকটা আছে বটে, কিন্তু বিধবাদের জন্য লেখকের গভীর বেদনা ও সমাজের প্রতি তাঁর তীব্র ক্রোধের নিচে চাপা পড়ে গেছে ইসলাম ধর্ম। একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর ভাষারীতি লক্ষ্য করো। আনুষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা তাঁর ছিলো কি না সন্দেহ, কিন্তু বাঙলা পদ্যটা তিনি রপ্ত করেছিলেন ভালোভাবেই। বিধবাদের

যন্ত্রণা প্রকাশের জন্যে তিনি এই রোগা বইটিতেও সাহিত্যের কয়েকটি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। কখনো কথপোকথনের ভঙ্গি, সংলাপগুলো খুবই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল। আবার পয়ারের ছন্দে টুকরো টুকরো কবিতাও লিখেছেন। এই সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সরাসরি নেমে পড়েছেন প্রবন্ধ লিখতে। বইয়ের মাঝে মাঝে টিকাগুলোকে খুচরো প্রবন্ধ বলতে কি তুমি আপত্তি করবে?

মেহেরুল্লার বইটা মাঝে মাঝে এলোমেলো, কিন্তু তাঁর ভাবনা আগাগোড়া কনসিসটেন্ট। খেয়াল করো, ভাষায় হুতোম প্যাঁচার নকশা এবং আলালের ঘরের দুলালের ছায়া বেশ স্পষ্ট। অথচ বইটি লেখা হয় গত শতাব্দীর শেষ দশকে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির দাপট চলছে বাঙলা গদ্যে। মেহেরুল্লাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে এড়াতে পারলেন, এটা কম কথা নয়। এর অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি উপন্যাস লেখেন ১৯৩০ দশকে। রায়নন্দিনী নামে এই উপন্যাসটি অত্যন্ত নিম্নমানের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকাতে তিনি নিজেই আরো বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছেন। আর সবচেয়ে মজার কথা, সিরাজি অনুকরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি।

এদিক থেকে মেহেরুল্লাহ অনেক আধুনিক এবং অসাম্প্রদায়িক। ১৮৯০ -এর দশকে একজন গোঁড়া, রক্ষণশীল ও খুব সাধারণ ঘরের মুসলমান যে-কোনো সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য কতোটা গভীর বেদনা অনুভব করতেন 'বিধবা গঞ্জনা' তার একটি শক্ত প্রমাণ।

উর্দুতে কবি আলতাফ হোসেন হালি এর একটু আগে একটি বই লেখেন, 'মুনাজাত-ই-বেওয়া' মানে বিধবার প্রার্থনা। তোমাদের মতো সত্যিকার অর্থে লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা যখন নারীদের ওপর সামাজিক, ধর্মীয়, পারিবারিক, এবং কি রাষ্ট্রীয় নির্যাতন নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করছে, তখন আমার মনে হয় ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতেও এ নিয়ে কি ধরনের কাজ হয়েছে তার একটু খোঁজ খবর নিলে ভালো হয়। অবশ্য তোমরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তবু কথাটা বলে রাখলাম।

বইটা বাঁধিয়ে দিলে ভালো হতো, কিন্তু গৌরাঙ্গ আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছে বলে সময় পাওয়া গেলো না।

আমার প্রিয় বন্ধু শীতলদাস জোয়ারদারকে আমার নতুন ঠিকানা না দেওয়াই নিরাপদ। এই মাসের ২৭ তারিখ আমরা আমাদের এই ১৯ বছরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজিমপুরে সরকারি বাড়িতে। ঐ বাড়ির ঠিকানা ঃ ৭০এ আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা ১২০৫।

এই সঙ্গে নাজেসকেও চিঠি লিখছি। আর্জানের জন্যে আরেকটি কবিতা মাথায় কামড়াচ্ছে, লেখা হলেই পাঠিয়ে দেবো। আমার হয়ে ওকে আদর করে দিও এবং অন্তত দুটো দুষ্টুমি মাফ করে দিও।

আমরা ভালো আছি। তোমরা তিনজন আমার ভালোবাসা নিও।

ইতি

সাক্ষাৎকার

রূপম। সম্পাদক ঃ আনওয়ার আহমদ। ২৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা। ২০ অক্টোবর ১৯৮৮।

প্রঃ বিশ্বের সমকালীন ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ইংরেজি ভাষার কল্যাণে ইউরোপের আর দু'একটি ভাষার সমকালীন ছোটগল্প যেটুকু পড়তে পাই তাতে মনে হয় গল্প সেখানে ক্রমেই ইমেজ, রূপক ও প্রতীকের কব্জায় বন্দী হয়ে পড়ছে। ব্যক্তির অবক্ষয়ের ক্ষত জানাবার জন্য দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ওরা এতো বেশি ব্যবহার করেছেন যে ওদের যান্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন লেখকদের আর আকৃষ্ট করতে পারছে না। নতুন প্রকরণ খোঁজার জন্যে তারা হন্যে হয়ে উঠেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটলে নতুন প্রকরণ খোঁজা আর নতুন নতুন ফন্দি বার করার মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

বাঙলা ভাষায় ছোটগল্প ঠিক সেই অবস্থায় আসেনি। তবে আমাদের কথা-সাহিত্যেও একমাত্র বক্তব্য হলো ব্যক্তির ক্ষয় ও ব্যক্তির গ্লানি। বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার সুস্থ ও ইতিবাচক বিকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। ব্যক্তির যে বেদনা ও দুঃখকে আমরা সুস্থ বলে মনে করি তার সবচেয়ে সফল প্রকাশ পাই রবীন্দ্রনাথের লেখায়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সব সময় 'নিতান্তই সহজ সরল' নয়, তবে ব্যক্তির বাস্তব ও অস্তিত্বিক জটিলতাকে তা সব সময় এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই বাঙলা সাহিত্যে ব্যক্তির ক্ষয় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ব্যক্তির গভীর ভেতরে অনুসন্ধান করার অপ্রীতিকর ও পরিশ্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবল ও শক্তিশালী না হলেও স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন যে ব্যক্তি গড়ে উঠেছিলো পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তার ভেতরকার গ্লানি ও অবক্ষয়কে একেবারে ন্যাংটো করে তুলে ধরেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঔপনিবেশিক শাসনে খোঁড়া পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিণত হয় ব্যক্তিসর্বস্বতায়, হ্যাঁ, স্বার্থপর নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ ব্যক্তিসর্বস্বতায়; এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গৌরবান্বিত করার কিছু নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘৃণা ও বিক্ষোভের ভেতর এই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, এই উপলব্ধি শিল্পীকে প্রতিরোধের স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙলা ছোটগল্প পাঠকের ভেতর এই ঘৃণা বা ক্ষোভ তো দূরের কথা, অস্বস্তি পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না। এখনকার বেশির ভাগ গল্পে ব্যক্তির গ্লানি ও ক্ষয়কেই তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু লেখকদের ভেতর ক্ষোভ, ঘৃণা বা ক্রোধের উত্তাপ অনুপস্থিত। ফলে ব্যক্তির গ্লানি ও অবক্ষয় প্রকাশিত হয় এক ধরনের বিরহমার্কা কোমল মোড়কের ভেতর। পাঠক এতে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পায়। কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে না।

এদিক থেকে ল্যাটিন আমেরিকার গল্প অনেক বেশি সৎ ও গভীর। ঐ মহাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ঔপনিবেশিক আমলের গ্লানি ও জড়তা ঝেড়ে ফেলার জন্য তৎপর। ওখানে সামরিক ও বেসামরিক শোষণ ও নিপীড়ন আমাদের এখানকার চেয়ে কম নয়। তবে ওদের শিল্পীদের মধ্যে প্রতিরোধের স্পৃহা খুব প্রবল। ইউরোপ-আমেরিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছদ্মবেশে ব্যক্তি-সর্বস্বতার ঢাক পেটানো ওদের শিল্পীরা মহৎ কাজ বলে গণ্য করেন না। আবার বাঙালি

লেখকদের মতো চটচটে বানোয়াট অনুভূতি দিয়ে পাঠককে গল্পের সঙ্গে সেঁটে রাখার ফন্দি করার কাজ তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না। ল্যাটিন আমেরিকার গল্পে ব্যক্তিকে দেখা যায় সমাজের ও সময়ের, শোষণ ও নিপীড়নের প্রেক্ষিতে।

তবে আমাদের ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। খোঁড়া পুঁজিবাদের রুগ্ন বিকাশ ভালোভাবে ঘটার আগেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে যে ভয়াবহ ব্যক্তিসর্বস্বতায় রূপ নিচ্ছে তাতে আজ হোক্ কাল হোক লেখকদের নড়েচড়ে উঠতেই হবে। এর প্রতিকারের পথ যে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে, তা নয়। কিন্তু এর প্রতিরোধের স্পৃহা তাঁর মধ্যে জেগে উঠতে বাধ্য।

সামন্ত আমলের সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ শিল্পসাহিত্যের বিকাশে এককালে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলো। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে ব্যক্তিসর্বস্বতায়, তা থেকেও আরোগ্যের পথ খুঁজতে হবে বৈকি। হয়তো অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু সমাজ তো বসে থাকে না, লেখকরাও একই গল্প নিয়ে আর কতোদিন বসে থাকবেন?

প্রঃ তা'হলে বাংলা ছোটগল্প কোনদিক থেকে আপনার মনোযোগ পাচ্ছে? কোনদিক থেকেই বা আপনাকে পীড়িত করছে?

বাঙলা ভাষার বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে পশ্চিম বাঙলায়। সেখানকার সাম্প্রতিক লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। এদিক-ওদিক থেকে যেসব বই হাতে আসে তার প্রায় সবই প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা। তরুণদের লেখা এখানে প্রায় একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই আমি যাঁদের লেখা সম্বন্ধে বলতে পারি তাঁরা অন্তত পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগ বা ষাটের দশক থেকে লিখতে শুরু করেছেন, এর আগে নয়।

পাঠকদের ধরে রাখার ক্ষমতা ওঁদের হাতের মুঠোয়। হ্যাঁ, তাঁদের বেশির ভাগ লেখার কথা বলছি। পাঠককে আঠার মতো সেঁটে থাকতে হয়, পড়তে পড়তে হয় চটচটে না হয়, ফুরফুরে নেশা ধরে যায়। কিন্তু মুণ্ডুটা ভালো করে ঝাঁকালে নেশা কাটতে সময় লাগে না। বেশির ভাগ নামকরা বইতে লেখকের নতুন কোনো উপলব্ধি নেই। পাঠকের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এরকম মৌলিক রচনা চোখে পড়েই না। বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস সেকেন্ড-হ্যাণ্ড এক্সপেরিয়েন্সের ওপর ভিত্তি করে বানানো। বাঙলা কথাসাহিত্যে তিরিশের দশকে স্থাপিত অবিস্মরণীয় কীর্তিসমূহ থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া হয়। বেশির ভাগ বই সেই সব শ্রেষ্ঠ শিল্পীর উপলব্ধির মোটা বা মিহি চটকানো রূপ। নানাভঙ্গি দিয়ে লেখকগণ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। যতো ঝানু যাদুকর ততো বড়ো শিল্পী তাঁরা নন।

আবার এর বিপরীতে কয়েকজন লেখক আছেন যাঁদের অসাধারণ প্রতিভার অনেকটা ব্যবহৃত হয় পাঠককে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টায়। খুব সাহস করে তাঁদের রচনার ভেতর একবার ঢুকতে পারলে গভীর উপলব্ধিকে অনুভব করা যায়। মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে এরকম গভীর খননকার্য কমলকুমার মজুমদার ছাড়া আর কে করতে পারেন? কিন্তু তখনো তাঁর দুর্ভেদ্য ভাষারীতিকে সমর্থন করা যায় না। মানুষের বেঁচে থাকার মূল বীজগুলোকে উপড়ে এনে গল্প-উপন্যাসে তাই বুনে দেওয়ার জন্য অল্প কয়েকজন লেখকের মেধাবী তৎপরতা গভীর শ্রদ্ধা দাবী করে। কিন্তু এঁদের রচনার উগ্র বুদ্ধিপ্রধান বুনোট পাঠককে মগ্ন হতে দেয় না। পাঠকের নেশার

মতো মগ্নতা কাম্যও নয়, গল্পের ভেতরে না থেকে পাঠক তার পাশাপাশি চললেই লেখকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর ও অর্থময় হতে পারে। কিন্তু পাঠককে পাশে ঘেঁষতে না দেওয়া কি তাঁকে অবজ্ঞা করা নয়? একে সিনিক প্রবণতা ছাড়া আর কি বলতে পারি? সিনিক প্রতিভাবান লেখক মানুষের কতোটা উন্মীলন ঘটাতে পারেন? বাঙলাদেশের কথাসাহিত্যে গত দুই দশক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। মানুষের অস্তিত্বের গভীর ভেতরে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ'র সৎ ও একনিষ্ঠ অভিযানের ফল 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' বাঙলাদেশের কথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই সময়কালে কাহিনী বর্ণনায় সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি ব্যবহার করেন সৈয়দ শামসুল হক। বাঙলা কথাসাহিত্যে নিম্নবিত্ত মানুষের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতিত মানুষের প্রতিরোধের কথা বলার যে চেষ্টা চলছে দীর্ঘকাল ধরে, তার উল্লেখযোগ্য সফলতা দ্যাখা গেলো হাসান আজিজুল হকের গল্পে। কি পশ্চিম বাঙলায় কি বাঙলাদেশে সমাজবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকদের কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়া ছাড়া মানুষ আর কোনো মর্যাদা পায় না। হাসান আজিজুল হকের কাছে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ হলো মানুষের বাঁচার হাতিয়ার। সমগ্র মানুষ এর চেয়ে অনেক বড়ো ও জীবন্ত। মানুষকে কেবল আইডিয়া বা থিওরির বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে তিনি অস্বীকার করেন। শোষিত মানুষ নিয়ে গল্প-উপন্যাস যা দেখি তার বেশির ভাগই মিষ্টি মিষ্টি ভাষায় লেখা। আদুরে ও তুলুতুলু ভাষায় শোষিত মানুষ কখনো রক্তমাংসের শরীর পায় না। হাসান আজিজুল হকের লেখার আকর্ষণ এইখানে যে একটি পরিণত দৃষ্টির ফলে তাঁর রচনা অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন হয়নি।

গল্পের প্রকরণ ও উপন্যাসের গদ্যভঙ্গি নিয়ে নানারকম পরিশ্রমী নিরীক্ষা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ ও মাহমুদুল হক। এই সময়কালেই বাঙলাদেশের গদ্য স্বচ্ছন্দ হতে শুরু করে। বাঙলাদেশের গদ্যের যে আড়ষ্টতা ও স্থূলতা এককালে খুব বিরক্তিকর ঠেকতো, একেবারে তরুণদের বেশির ভাগ লেখাই তা থেকে মুক্ত। এর ফলে গল্প-উপন্যাস সুখপাঠ্য হবার প্রবণতা লেখাকে তরল করে তুলতে পারে। সে রকম ভয় হওয়ার কারণ মাঝে মাঝে ঘটে বৈকি? এই তরলতার আর একটি প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করার সততা সত্ত্বেও বিষয়বস্তু, এমনকি নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীর সংলগ্নতা অনেকেরই নেই! ফলে লেখায় নৈর্ব্যক্তিকতা পাওয়া যায় না। ঝরঝরে গদ্য সত্ত্বেও লেখা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ওঠে। ঝরঝরে গদ্য তখন কোনো কাজে লাগে না।

প্রঃ এ সময়ের কিছু তরুণ দাবী করছে বাংলা ছোটগল্প বদলে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় বাংলা ছোটগল্প দ্রুত বদলে যাচ্ছে? আর এই পরিবর্তনে আপনি কি পিছিয়ে পড়ার গ্লানি বোধ করেন?

বাঙলা ছোটগল্প কি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে? এর বিবর্তন অবশ্যই ঘটছে, কিন্তু মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে তা কি একই কদমে চলতে পারছে? পশ্চিম বাঙলার মানুষের জীবন ও মানসিকতার যে পরিবর্তন আমরা এখান থেকেও আঁচ করতে পারি তার কতোটা পরিচয় সেখানকার গল্পে পাওয়া যায়? মানুষের এই পরিবর্তন তুলে ধরার জন্য গল্পের প্রকরণ কি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে? না। তবে কিসের বদলে যাওয়া?

বাঙলাদেশের বেলায় এই কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। গত চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে এখানে যে পরিবর্তন ঘটে কোথাও তার তুলনা পাওয়া কঠিন। আড়াই দশকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পাল্টালো দু'বার, দু'বারই মানুষের প্রত্যাশা ছিলো আকাশচুম্বী। দু'বারই আকাশভঙ্গও হয়েছে চূড়ান্ত রকম। সমস্ত সমাজে, মানুষের মানসিকতায় যে দারুণ রকম ওলটপালট ঘটলো তার কতোটা চিহ্ন ছোটগল্পের শরীরে দেখতে পাই?

সমগ্র বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বলা যায় যে মানুষের জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন তুলে ধরার জন্য ছোটগল্প তৎপর হয়নি। কেবল নতুন ঘটনা বা নতুন বিষয়ের দিকে ভাসা ভাসা মনোযোগ দিয়ে মানুষের পরিবর্তিত মানসিকতাকে কোনোভাবেই স্পর্শ করা যাবে না। স্পর্শ করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয় বটে, তবে একটু নাড়াচাড়া করলেই গল্পের ভেতরকার মেজাজটি ধরা পড়ে। সেখানে বাঙালি মধ্যবিত্তের ছিঁচকাদুনে স্বর ঘ্যানর ঘ্যানর করে। আমাদের সমকালের জীবন-যাপনে এই প্যানপ্যানে স্বভাবের লালন পালন কি পোযায়?

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙলা গল্পের মেজাজে যে পরিবর্তন আসে তার তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা দেশভাগের পরবর্তী পরিবর্তন অনেক শ্লথগতি ও তাৎপর্যহীন। আমাদের বাঙলাদেশে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তির মানসিকতার যে রদবদল ঘটে, একটি জেনারেশনে এরকম পরিবর্তন খুব কম দেশেই ঘটেছে। এর সঙ্গে ছোটগল্প বদলাচ্ছে কোথাও?

এই অবস্থায় পিছিয়ে পড়ার গ্লানি আমার হয় কিনা? দেশ, সমাজ ও ব্যক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে আমার গল্প পা মিলিয়ে চলতে পারে না বলে গ্লানি বোধ করি বৈ কি!

প্রঃ সমাজ প্রেক্ষিতের দারুণ ওলটপালটের কারণে লেখকের সামাজিক অঙ্গীকার বিষয়ে তা'হলে আপনার কথা আছে?

কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, রাজনীতিবিদ-যে কোনো পেশায় নিয়োজিত যে কোনো মানুষ যদি সততার সঙ্গে কাজ করেন তো সমাজের প্রতি দায়িত্ব থেকে তিনি রেহাই পেতে পারেন না। কৃষক যদি চাষের কাজে ফাঁকি দেন, শ্রমিক যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, ডাক্তার যদি রোগের চিকিৎসা না করে মানুষকে আরো রুগ্ন করে তোলেন, শিক্ষক যদি ক্রমাগত ক্লাসে না যান, রাজনীতিবিদ যদি মিলিটারির দালালি করেন, মিলিটারির লোকজন যদি নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর অস্ত্র ঘোরানোকে বীর্যপ্রকাশের প্রধান কাজ বলে গণ্য করে, তবে এরা শেষ পর্যন্ত নিজেরাও মরবে, দেশেরও বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। নিজেদের পেশায় সৎ থাকলে সমাজের প্রতি দায়িত্বও ঠিকভাবে পালন করা হয়। লেখকের কাজ হলো মানুষের কাছে জীবনকে অর্থময় করে তোলা। বেঁচে থাকা একটি বড় কাজ, সকলের সঙ্গে বাঁচাটা সবচেয়ে জরুরি—এই কথাটি সবাইকে উপলব্ধি করিয়ে দেওয়াই লেখকের কর্তব্য। মায়ের পেট খুব নিরাপদ জায়গা, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় না। আবার আর দশজন মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে না পারলে সারাজীবন নিজের খোলসের মধ্যে বাস করলে তাকে বাঁচা বলা মুশকিল। লেখক যখন অবক্ষয় ও নিঃসঙ্গতার কথা বলেন তখনও কিন্তু পাঠককে তিনি আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেন না। বরং পরোক্ষভাবে হলেও এই কথাই বলেন যে আরো পাঁচজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সংঘবদ্ধভাবে এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারেন। জীবন এতে অর্থময় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিকে

স্থাপন করতে হয় সমাজের প্রেক্ষিতেই, ব্যক্তির ভেতর দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়, আবার সমাজ গড়ে তোলে ব্যক্তিকে। সামাজিক অঙ্গীকার বোধ না করলে কোনো লেখকের পক্ষে এই সত্যটি প্রকাশ সম্ভব হয় না।

প্রঃ গল্প রচনায় গল্পের কাঠামো, বিষয়বস্তু বা কথাবস্তু, স্টাইল বা লিপিকৌশল—কোনটার উপর আপনি জোর দিয়ে থাকেন? আপনার লেখায় কথাবস্তু ও রূপ সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছেন? সমস্যাটি কি আদৌ আছে আপনার জন্য?

গল্পের কাঠামো, বিষয়বস্তু বা লিপিকৌশল এর সবগুলো নিয়ে গল্প, তাই সবগুলোর ওপরেই জোর দিতে হয়। এর কোনটির ব্যাপারেই উদাসীন থাকা কোনো লেখকের পক্ষেই অসম্ভব। বিষয়বস্তু বা বক্তব্য লেখককে লিখতে সবচেয়ে বেশি উস্কানি দেয়। কিন্তু লিখিত হওয়ার আগে এর দাম কি? সমর্থ কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপযুক্ত লিপিকৌশলের সাহায্য না পেলে তার প্রকাশই বা ঘটে কি করে? আবার বিষয়বস্তু যদি লেখকের গভীর ভেতরে সাড়া তুলতে না পারে বা বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে লেখক যদি জিনিসটাকে নিজের করে তুলতে না পারেন তো কোন লিপিকৌশলের সাধ্য নাই যে তাকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারে। ভাবনারহিত কথামালা বেশিদূর যেতে পারে না, রঙের একটুখানি ঝিলিক দেখিয়ে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, তার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। আবার উপযুক্ত লিপিকৌশলের অভাবে কতো সিরিয়াস বিষয়বস্তু মুখ থুবড়ে নিচেই পড়ে থাকে—-তাও কি কাউকে আকর্ষণ করতে পারে? আর কথাবস্তু ও রূপ কি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার? কথাবস্তু যখন আমাকে গভীরভাব নাড়া দেয় তখন তা একটি রূপের মধ্যে দিয়েই আসে। বস্তুটি যদি আরোপিত না হয়, সৌখিন না হয় কিম্বা কেতাবী থিওরির আদেশজাত না হয়, তাহলে উপযুক্ত রূপ আমি লাভ করবোই। এখানে এই চান্সে চল্লিশ দশকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বাচাল হতে চাই। ঐ দশকে বাঙালি লেখকদের মধ্যে সচেতন রাজনৈতিক ভাবনা দ্যাখা যায়, তাদের অনেকেই সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং শোষিত মানুষের বঞ্চনা ও সংগ্রামের বাণী ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পশ্চাদপসরণ ঘটলো এই দশকে। তিরিশের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের পাশে এই দশকের রচনাকে বামন না বলে উপায় কি? 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কি 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কথা ছেড়ে দিলাম, একটি শশী কি একটি কুবের নির্মাণ করার মতো শক্তসমর্থ মানুষ তো গণ্ডায় গণ্ডায় পয়দা হয় না! কিন্তু দেশের শোষিত মানুষের বৃহত্তর ভাগ কৃষকের পরিচয় লাভের জন্য যেতে হয় তারাশঙ্করের কাছে। গ্রামের মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য ও গ্লানির রূপদান করেন বিভূতিভূষণ। কবিতায় এত শপথ ঘোষণা আর শ্লোগানের ডঙ্কা পেটানো হলো-কিন্তু তিরিশ দশকের শেষভাগ ও চল্লিশ দশকের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশভাগের যন্ত্রণা হৃদপিণ্ডের আমূল বিঁধে নিতে হয় একজন তথাকথিত 'নির্জনতার কবি'কে। এই সময়ের বেদনার পরিণত ও শোকবিধুর প্রকাশ ঘটে 'রূপসী বাঙলা'য়। সংকল্পবদ্ধ ও উচ্চকণ্ঠ কোনো কবির লেখায় নয়। কিন্তু রাজনীতিসচেতনতা তো সাহিত্যকে সব সময় নতুন মাত্রা দিয়ে এসেছে। তাহলে এঁদের রাজনীতিবোধ ও মানুষের জন্য ভালবাসা কি অনেকটাই সৌখিন ছিলো? সৌখিন দুঃখ, সৌখিন ভালোবাসা ও পুস্তকী অনুভব সফল রূপ পায় না। রূপ লাভ করা যায় কেবল কথাবস্তুর সঙ্গে লেখকের অবিচ্ছিন্ন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের

দ্বারাই। যাকে লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা বলে তাও আসে বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীর সংলগ্নতার সাহায্যে।

আমার কথাবস্তু যাতে আমার সখের ব্যাপার না হয় সেজন্য সচেতন থাকতে চেষ্টা করি বৈকি! কোনো নতুন ভাবনা মাথায় এলে সেটা আমাকে কতোটা নাড়া দিতে পারে একটু অপেক্ষা করে তা দেখতে চাই। তবে সব সময় কি ধৈর্য ধরা যায়? ঠিকঠাক রূপ নেওয়ার আগেই কথাবস্তু লিখে ফেলি, তখন ছাপা হলে অন্যে তো দূরের কথা নিজেই সেই লেখা পড়তে গেলে বিরক্ত হয়ে উঠি।

রাডার পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৯২

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি কতখানি অবগত?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঃ সরকারি প্রচার মাধ্যম যতোই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক আর বেসরকারি কাগজপত্র যতোই এড়িয়ে চলুক, দেশবাসী আজ জানে যে গত কয়েক বছর ধরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরতিহীনভাবে রক্তপাত ঘটে চলেছে। সেখানকার অধিবাসীদের নিজ নিজ জাতিসত্তা নিয়ে টিকে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে গণ্য করা হয় ঔদ্ধত্য বলে এবং তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি বিবেচিত হয় অপরাধ হিসাবে। তাদের ঐ অধিকার, ইচ্ছা ও দাবিকে সমূলে উৎপাটনের জন্যে শাসকদের নির্যাতন শুরু হয় পাকিস্তানী আমলে। বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাই রূপ নিয়েছে হিংস্র আক্রমণে। প্রথমে নিজভূমে তাদের পরবাসী করে রাখার জন্য এবং পরে ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার খবরও পাই বৈকি। ১৯৮১ সালে আমি রাঙামাটি ও বান্দরবনের কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলাম। বান্দরবনে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুরং ছাত্রকে। তখন নিজের চোখে দেখে এবং পাহাড়ি ও বাঙালি অধিবাসীদের মুখে কখনো একইরকম কখনো পরস্পরবিরোধী কথা শুনে ওখানকার অবস্থা অনেকটাই আঁচ করতে পারি। এরপর প্রায় কয়েক মাস কেটে গেলো। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছি। আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থার প্রতিবেদন পড়েছি। রাডার পড়ার সুযোগও পাই। এ ছাড়া সরকারের পরিবেশিত তথ্য থেকেও কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করি, তবু খুব লজ্জা ও গ্লানির সঙ্গে বলি, আমাদের এই ছোট দেশটির ঐ এলাকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও জরুরি অনেক কিছুই আমার জানা নাই। ভালো করে যেটুকু জানি তার ওপর ভিত্তি করেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন ঃ এ দেশের সংবাদ মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলির সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করেন?

আ. ই : সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে বলার মানে হয় না। সেখানে মন্ত্রী, নিমমন্ত্রী, আমলা এবং নিম্ন আমলার মামাতো ভাইয়ের বাড়িওয়ালার শালার বিড়ালের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা যাবে, কিন্তু গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি করে অনুষ্ঠিত গণআদালতের বিশাল সমাবেশের খবরটা বেমালুম চেপে যেতে হবে। তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হত্যাযজ্ঞের খবর দেবে কি করে? কিন্তু দেশে বেসরকারি ও বিরোধী দলের খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সাময়িকী এবং মাসিক পত্রিকার তো অভাব নেই। সেসব জায়গায় পার্বত্য এলাকার সংঘর্ষ, হত্যা ও নারী নির্যাতনের ব্যাপারে টু শব্দটি করা হয় না কেন? শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এক ধরনের উগ্র ও উদ্ভট জাতীয়তাবাদী উন্নাসিকতা আছে যার ফলে একটু ভিন্ন সংস্কৃতির নিকটতম প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখেন। নিজের দেশের সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যদের সম্বন্ধে এঁদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের যে অংশটি বিদ্যাচর্চা করেন, সাহিত্য সৃষ্টি

করেন কিংবা শিল্পের নানা মাধ্যমে নিয়োজিত রয়েছেন দেশেরই কোনো কোনো অংশের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা এবং উন্নাসিকতাই পাহাড়ি মানুষের সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের একটা অঞ্চল, অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অঞ্চলের জনশক্তি ও সম্পদকে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে লাগাবার পরিবর্তে বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করা হচ্ছে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে দাবিয়ে রাখতে। বনজ সম্পদসহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ তছনছ হচ্ছে। এর শেষ কোথায়?

আ. ই ঃ আমিও জানতে চাই এর শেষ কোথায়? শুধু সরকারকে দোষ দেবো কেন? দেশের রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, ছাত্র—কেউই কি বুঝতে পান যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান অবস্থা জারি থাকলে দেশের অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত কোথায় মুখ থুবড়ে পড়বে? এই দরিদ্র দেশের মানুষের দারিদ্র্য নামবে কোন পর্যায়ে? মধ্যবিত্তের লেখাপড়া, বিদ্যাচর্চা যাবে কোন রসাতলে? পার্বত্য চট্টগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তার আঁচ থেকে বাঁচবে কে?

প্রশ্ন ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পেশকৃত ৫ দফা সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

আ. ই ঃ পাঁচ দফায় পাহাড়ি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক মনোভাব ও বিবেচনাবোধের পরিচয় পাই। তবে জাতীয় সংসদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি কি করতে পারে? তাদের কাজ করতে হবে সংবিধান অনুসারে। সংবিধানে দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার কোনো ব্যবস্থা আছে কি? আর জাতীয় সংসদে পাহাড়ি প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে পাহাড়ি রাজাকার বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনো কাজ হবে? ৩ নম্বর দফা সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজই ব্যবস্থা নিতে পারে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা কে কোন বিষয় পড়বে, কার যোগ্যতা কতটুকু তার বিচার করার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকা উচিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করবে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, তা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র, হিংস্র বা নিরীহ যাই হোক না কেন, এই ব্যাপারে তাদের কোনোরকম নাক গলানো বরদাস্ত করা উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ দেশের লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি প্রমুখের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে দায়দায়িত্ব কতখানি বলে মনে করেন?

আ. ই ঃ বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের লেখক, বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই দেশের ছোট জাতিসত্তাগুলির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে নস্যাৎ করার জন্যে যখন নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলে তখন ঐ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উদাসীনতা শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জার বিষয়ও বটে। ভারতে হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরি মসজিদে ইতর আক্রমণ চালালে আমরা সঙ্গতভাবেই তার প্রতিবাদ করি। বাঙলাদেশে মুসলমান মৌলবাদীদের পাশবিক আস্ফালনে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হলে আমরা রুখে দাঁড়াই। এ সবই বাঙালি লেখকদের দায়িত্ববোধ ও সাহসের পরিচয় দেয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে গত

কয়েক বছর ধরে যে অবিরাম নির্যাতন চলছে তা নিয়ে এরা নীরব কেন? গত বছর অক্টোবরে খাগড়াছড়ির দুটো গ্রামের একটিতে দুর্গাপূজার জন্যে তৈরি মূর্তি ভেঙে ফেলা হলো, আরেকটি বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাঙা হলো, একই জেলায় একই মাসে একটি গ্রামে অপারেশন চালাতে গিয়ে একটি বাড়িতে পুরুষদের বেঁধে রেখে মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে বলাৎকার করা হলো। লেখকদের মধ্যে এসব ক্ষোভের সঞ্চার করে না কেন? কয়েক বছর আগে জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস ঢাকায় এসে আমাদের লেখকদের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনা নিয়ে গভীর আক্ষেপ করে যান। আমরা কিন্তু তাঁর আক্ষেপে সাড়া দিইনি। লেখকদের এই প্রতিক্রিয়া কিংবা প্রতিক্রিয়ার অভাব মোটেই শিল্পীসুলভ নয়।

একই দেশের এবং স্বতন্ত্র হলেও কাছাকাছি সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় রাখা লেখকদের অপরিহার্য কর্তব্য। যেখানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সংস্কৃতি বিপন্ন হলে যে কোনো শিল্পী তাতে উদ্বেগ বোধ না করে পারেন না, সেখানে আমাদেরই কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হলে সমগ্র জাতির স্বার্থেই তাদের এর প্রতিকারে উচ্চকণ্ঠ হওয়া উচিত। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্বের কথা যদি নাও বলি, কেবল তার শিল্পচর্চার জন্যেও নিজের দেশের অধিবাসীদের ওপর নির্যাতন নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার। দেশের ভেতরেই ভয়াবহ, রক্তাক্ত ও বিভীষিকাময় এবং একই সাথে সাহসী ও সংকল্পবদ্ধ ঘটনা ঘটে চলেছে, এ নিয়ে লেখক ও শিল্পী, বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মীরা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলার কাজে অবশ্যই এগিয়ে আসতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হতে পারে। আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

আ. ই ঃ সমাধান বাৎলানো আমার সাধ্য ও এখতিয়ারের বাইরে। একজন লেখক হিসাবে আমি কেবল সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার অনুভূতির কথা বলতে পারি।

প্রথমত ও প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যাকে প্রত্যেক বাঙালিকে নিজের সমস্যা বলে অনুভব করতে হবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ ও ঘরে ঘরে অগ্নি সংযোগের ঘটনা আজো আমাদের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, রাজাকার আলবদরদের আমরা এখনো ফাঁসি দাবি করি। আমাদের দেশের যে কোন জাতিসত্তার ওপর নির্যাতন আমাদের মধ্যে একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা উচিত, তা হলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এর প্রতিকারে প্রতিরোধের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন।

পাহাড়িদের জমিতে জোর করে যাঁদের বসানো হচ্ছে তাঁরা হলেন নিরীহ ও গরিব বাঙালি কৃষক। এঁদের প্রতি কোনো ভালোবাসা থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার জন্যে এঁদের ব্যবহার করা হচ্ছে। পাহাড়িদের যদি নিশ্চিহ্ন করা যায় তো তার পর পরই এদেরও ঐসব জমি থেকে নির্মূল করা হবে, ঐ জমি দখলের জন্যে তখন হামলে পড়বে দেশের ধনী, বুর্জোয়া সুবিধাভোগীর দল। এই ধরনের ব্যাপার এই উপমহাদেশে আগেও ঘটেছে। বাঙালি নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সঙ্গে বাঙালি বুর্জোয়া, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নির্যাতিত ও শোষিত পাহাড়ি এবং নির্যাতিত ও শোষিত প্রতারিত বাঙালি শ্রমজীবি অনেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই সত্যটি সবার মধ্যে উপলব্ধি করাবার

দায়িত্ব বাঙালি ও পাহাড়ি লেখক, শিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর।

এখন বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম। এটা খুব দুঃখজনক। উভয় সংস্কৃতির জন্যেই এটা ক্ষতিকর। পরস্পরের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল হতে হবে, পরস্পরকে না চিনলে কেউ কারো সমস্যা বুঝতে পারবেন না, শুধু তথ্য জেনে কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতিসত্তার সমস্যা সম্বন্ধে কেউ উদ্বিগ্ন হতে পারে না। এই ব্যাপারে পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে বাঙালিদের অবগত করার দায়িত্ব তাঁরাই নেবেন। হিল লিটারেচার ফোরামের মুখপত্র 'রাডার' এই ব্যাপারে উদাসীন। পাহাড়িদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটি সফলভাবে প্রকাশ করলেও তাদের সাহিত্যকর্ম বা সংস্কৃতির কোনো পরিচয় দেওয়ার উদ্যোগ সেখানে নেই। বিভিন্ন জাতিসত্তার রূপকথা, গাথা, গল্প, কবিতা, নাটক, গান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হলেই বাঙালি তাদের আত্মীয় বলে পাহাড়িদের চিনতে পারবে। রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাজগুলো করতে হবে।

পাহাড়িরা ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দিবস হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। বাঙালিরা কিন্তু এই দিনটিকেশুধু বাঙলা ভাষা আদায়ের আন্দোলনের দিবস হিসাবে বিবেচনা করেন না, তা হলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাঙলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গেই এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে যেতো। বাঙালির প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলন প্রত্যেক বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নতুন গতি ও উত্তাপ লাভ করেছে। পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহ যদি ঐ দিনই তাঁদের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেন তাহলে বাঙালিরা একদিকে তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন এবং অন্যদিকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে তাঁরা অন্য ভাষাভাষীদের ভাষার দাবিকে সম্মান করতে শিখবেন। পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের প্রত্যেকের ইতিহাস সম্বন্ধে দেশের সবাইকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। এদের বিদ্রোহের ঐতিহ্যও দীর্ঘদিনের। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণের বিরুদ্ধে চাকমা জাতির বিদ্রোহের বিবরণ অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। তাদের এই বীরত্বব্যঞ্জক ও সাহসী প্রতিরোধের ঐতিহ্যে চাকমাদের সঙ্গে বাঙালিও গৌরব বোধ করতে পারেন যদি এই ইতিহাস যথাযথভাবে প্রচার করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক কার্যকলাপের তুলনায় শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নতুন মূল্যায়ন কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ইলিয়াসের পুড্রদর্শন

শোয়েব শাহরিয়ার

ইলিয়াস একজনই ছিলেন। অন্তত আমার জীবনে। আমি দেবতা দেখিনি, দেখতেও চাইনা, কেননা আমি ইলিয়াসকে দেখেছি! আমার ভেতরে ছোট্ট একটি মৃৎ-মন্দিরের অবস্থান, ইলিয়াস যার জাগ্রত দেবতা, এখনো।

ইলিয়াস: ইতিহাস-বোধ ও পরম্পরা

ইলিয়াস এক বিশাল ঐতিহাসিক পরম্পরা। তিনি অনার্যের জ্ঞাতি, দ্রাবিড়ের বন্ধু, নিষাদের ছিলা থেকে ছুটে যাওয়া ছুটন্ত তীর, নীলনদের অববাহিকায় তাঁর অনেক কাল কেটেছে, খুফুর পিরামিডে পাথর টানা ঘর্মাক্ত কলেবর অভুক্ত দাসশ্রমিক, গঙ্গারিডাই রাজ্যের হস্তীবাহিনীর দর্পিত মাহুত, ব্যাবিলন- বাইজান্টিয়াম - গ্রীসের বন্দী শিল্পী। সর্বোপরি ইলিয়াস পুড্রনগরের একজন সার্বজনীন ব্রাত্যজন।

ইতিহাসের নিরন্তর প্রবহমান ধারার ওপর তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস। ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ও স্কন্ধ প্রগতিতে তাঁর চিন্তা-চেতনার স্ফূর্তি ছিল অসাধারণ। ইতিহাসকে আশেকড় জানায় যেমন তাঁর বিরতিহীন আকাঙ্ক্ষা ছিল, তেমনি পরিশীলিত প্রজ্ঞারশ্মির মাধ্যমে প্রচলিত ইতিহাসের গতানুগতিক ঘটনাপঞ্জির ইতিবৃত্ত সরিয়ে অকথিত ও অলিখিত ভাব ও বস্তুসত্য তুলে আনবার অসাধারণ শক্তিও তাঁর ছিল। মহাস্থান, ভাসুবিহার, বিহার গ্রাম, গোকুল মেড়, ভীমের জাঙ্গাল, যোগীর ভবন, ভবানীপুর ভ্রমণের সময় অসংখ্যবার সেই দৃষ্টিশক্তির প্রমাণ আমি পেয়েছি।

অলিখিত মহাকাব্যের কবি

ইলিয়াসের অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি অমার ব্যক্তিগত ক্ষতিও সীমাহীন। 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর পর ইলিয়াস বগুড়া অঞ্চলের দুটি ভিন্ন অথচ সমান্তরাল কাহিনীবৃত্ত দ্বারা তাড়িত হন। একটি ঘটনা করতোয়া নদীর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ পলল এলাকাকেন্দ্রিক, যা তাঁর অসাধারণ শিল্পসিদ্ধ উপন্যাস 'খোয়াব নামা'য় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। অন্যটি ইতিহাসের পাতায় অলিখিত থেকে গেল। পুণ্যতোয়া করতোয়া নদীর বিস্তীর্ণ পশ্চিম এলাকা, যে এলাকার মাটির উপরের একটা স্তর তুললেই রক্ত মৃত্তিকার দর্প স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সে এলাকার নতুন মাত্রিক শিল্পিত-ইতিহাস ইলিয়াসের অণুবীক্ষণিক শরদৃষ্টির প্রাখর্যে বিনির্মিত হবার অপেক্ষায় ছিল, তা আর হল না। জাতীয় সমূহ ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতি হল আমার; পুণ্ড্রনগর, বেহুলা-লখিন্দরের বাসর-ঘর, মথুরা বৃন্দাবনপাড়া, গোকুল প্রভৃতি বিশাল এলাকার বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে পরবর্তী যে উপন্যাস তিনি বয়ন করবার দীর্ঘকালীন মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাসের মূল নিয়ামক ঘটনা হিসেবে তিনি নির্ধারণ করেছিলেন আমার বাড়ির এক মর্মন্তুদ

কাহিনী। মূলত সেটা ছিল আমার নানা বাড়ি। আযৌবন নানাবাড়িতেই মানুষ হয়েছি বলেই আমার বাড়ি বললাম। একান্তরে ১৩ নভেম্বর, ২৩ রমজান, ২৬ কার্তিক, আমার নানা-মামাসহ, আমার ছোটনানা সর্বজনশ্রদ্ধেয় পীর ছিলেন, সাতজন ও গ্রামের চারজন—মোট ১১ জনকে পাকিস্তানি কুকুরেরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইলিয়াসের যাদুকরী হাতের স্পর্শে ও সীমাহীন নির্লিপ্ততায় এই মর্মন্তুদ কাহিনী কি অসাধারণ রূপই না পেত! ইলিয়াস কেন্দ্রীভূত গভীর মনোযোগের সঙ্গে, চাই কি শিশুর মগ্ন তন্ময়তা নিয়ে সে সব ঘটনা শুনেছেন আমার কাছ থেকে। বন্দুক লুকানোর অপরাধে ছোটনানার ছেলে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মুকুল, আমার অসুস্থ নানা, যাকে তাহাজ্জুতের নামাজরত অবস্থা থেকে তুলে আনা হয়েছিল; ছোট নানা যিনি গদীনশীন পীর ছিলেন—মাত্র সেহেরী খেতে বসেছেন, অন্য মামারা হয়ত কেবল সেহেরী সেরেছেন, এমনি অবস্থা থেকে ধরে এনে কার্তিকের কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরবেলায়, সারিবদ্ধভাবে, পুকুর পাড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমার একজন নানাই প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন যাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি ছুঁড়েছিল পাষণ্ডরা, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, নানাজি পাঁচিল টপকে পার হয়ে প্রাণে বাঁচেন, অথচ তাঁর মত স্থূলাঙ্গের পক্ষে সাত ফুট পাঁচিল টপকানোর বিষয়টি এখনও রীতিমত বিস্ময়ের। এসব ঘটনা ইলিয়াস শুনেছেন ক্লান্তিহীনভাবে, শুনতে শুনতে চশমার নীচে শানিত চক্ষু তাঁর কখনো বিস্ফারিত, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো সুদূর দিগন্তে ধৃসরিত। ছোট নানাঘরের বেশ পুরনো কাঠের কারুকার্যময় দরজা ভেদ করে একটা গুলি ঘরের ভেতরে আছড়ে পড়ে, সেই ছিদ্র এখনো পাকিস্তানিদের নৃশংসতার চিহ্ন বহন করছে। ইলিয়াস পোকায় খাওয়া গর্তের মত অনেকটা চুপসে যাওয়া যান্ত্রিক ছিদ্রটা হাতে নেড়েচেড়ে দেখেছেন। হবিবর নানার বুকের রক্ত ভেজা পাকিস্তানী ১ টাকার নোট গুঁকেছেন, রক্ত একেবারে শুকিয়ে-সেধিয়ে কালচে রং ধারণ করেছে। এখনো বিশ-বাইশ বছর পর সযত্নে রাখা শহীদদের পরিধেয় বস্ত্রগুলো, রক্তে জবজবে বস্ত্রগুলো, শুকিয়ে পোড়া পোড়া কালো মাটির রং ধারণ করেছে। সংরক্ষিত পাঞ্জাবি ও লুঙ্গির কথা তিনি শুনেছেন। আড়াই হাজার বছর আগে মহামতি অশোক যেমন প্রতিহিংসাবশত এই পুড্রের নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেছিলেন, তেমনি জাত্যাভিমানী পাকিস্তানি বর্বরেরা স্বাধীনতা সমর্থক আধুনিক পুড্রের ধর্মপরায়ণ এক বীরবাঙালির ১২ বছরের কিশোর থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। পুকুরপাড়ের লাল রং আরও ঘনীভূত হয়েছিল। ইলিয়াস সে জায়গাটি গভীর দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন। সেদিন ঘন কুয়াশার মধ্যে ছোট্ট একজন কাজের মেয়ে। গোলাপি, দৌড়ে এক বারান্দা থেকে অন্য বারান্দায় পার হবার সময় গুলিতে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, আজও খোঁড়া হয়েই বেঁচে আছে। ইলিয়াস ওকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাকে দেখাতে পারিনি।

প্রকৃতি ও জনজীবনের আলোকিত ক্যানভাস

স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাসের জন্য ইলিয়াসের পরিকল্পনা ছিল ব্যাপক-বিশাল, তবে কখনই তা সাড়ম্বরে নয়, নেপথ্যে-আবডালে। আমার গ্রামটার নাম রামশহর। রামশহরের হেমন্তকালীন পরিপার্শ্বের রূপ-বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল সে সম্পর্কে ইলিয়াস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং শুনেছেন। শিশিরার্দ্র ঘাসের ডগা, কলাপাতা, শিমুল ডাল, আমপাতা বাঁশঝাড়,

উঁচু ভিটে জমিতে রবিশস্যের জন্য প্রস্তুতি, আলু-বেগুন-কপি-টমেটো-লাউ-এর জমির চালচিত্র, পেয়াঁজের পুলের(চারা) জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার তৈরি করা জমি সম্পর্কে একজন কৃষিবিদের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জেনেছিলেন এবং ডাইরিতে নোট করেছিলেন। রামশহরকে কেন্দ্রভূমি করে আশেপাশের অনেক গ্রামজীবন তাঁর জানা হয়েছিল। হাজরাদিঘি, ঘোড়াধাপের হাট, আশাকোলা, শশীবদনী, রজাকপুর, চাঁদমুহা, পলাশবাড়ি, মধুরা, বিহার, বামনপাড়া, হরিপুর, পাঁচপীরতলা, বাঘোপাড়া, বারোপুর, দশটিকা প্রভৃতি গ্রামগুলো সম্পর্কে বাস্তব ভ্রমণাভিজ্ঞতা থেকে যতটা জেনে নিচ্ছিলেন তার অনেক বেশি তিনি গ্রামগুলোকে ভেতরে ভেতরে তৈরি করছিলেন, পুনর্নির্মাণ করছিলেন। এ এলাকার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম সম্পর্কে কিছু না কিছু কিংবদন্তী বা প্রত্নতত্ত্বীয় ব্যাপার আছে। বাঘোপাড়াতে স্কন্দের মন্দির আর কমলা সুন্দরীর বাড়ি, রজাকপুরে ধনভাণ্ডার, চাঁদের ভিটা, সিংঘিনাথের ধাপ, এ ছাড়াও রজাকপুরে পুড্রনগরের রঞ্জকদের বসবাস, বামন-পাড়ায় কানাই ধাপ, চিঙ্গাসপুরে যোগীর ধাপ, মাদারী গড়, ধনিকের ধাপ। পদ্মাবতীর ধাপ সেকেন্দ্রাবাদে খুলনা ও লহনার ধাপ, হরিপুরের রাসজলা ও ষষ্ঠীতলার ঢিবি, বাঘোহলি গ্রামে শালবান রাজার কাচারির ঢিবি, রামশহরের খামার ধাপ সম্পর্কে ইলিয়াসের স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে জানা ছিলনা। পুরাণ-আশ্রিত এই জায়গাগুলো সম্পর্কে ইলিয়াসের স্বপ্ন-কল্পনা-রহস্য-অস্পষ্টতা-দুরাশ্রিত অতীত শত শতাব্দীর পরিবর্তমানতার মিথস্ক্রিয়ায় ঘোর লাগা অদ্ভুত কুহকী ইন্দ্রজালের মোহ ছিল। আর কাতলাহারের মতই ট্যাংরার বিল, খলসে গাড়ি, তাড়াতগাড়ি, বোলের বিল, শব্দল দিঘি, ঝিঁঝরাইলের দিঘি, মলপুকুর, ঘোড়াধাপের দিঘিও তাঁর ভেতরে অনেক উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলো। নুনগোলা হাটের ইজারাদারের নিত্য শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ঘোড়াধাপের হাটের পত্তন এবং এ নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং শেষ পর্যন্ত ঘোড়াধাপের বিজয়ের কাহিনীর প্রতিও তাঁর তুমুল আকর্ষণ ছিল।

ওঝা ধন্বন্তরীর ভিটে ও নির্জন মধ্যাহ্ন

রামশহর থেকে পোয়া মাইল পশ্চিমেই একটা প্রাচীন পুকুরের উত্তর পাড়ে ওঝা ধন্বন্তরীর ভিটে। এক সময় ছোটখাটো একটা হাট বসত, সপ্তাহে দু'বার। স্থানীয় উচ্চারণে এ স্থানের নামের অপভ্রংশ হলো ধরমতলি। বেশ কয়েকবার গেছি আমরা সেখানে। বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু ভিটার উপরে একবার উঠে দেখি উঠতি বয়সের একটা দীঘল পাকুড় গাছের মিষ্টি ছায়ায় এক বৃদ্ধ বাঁশ থেকে বাতা তৈরি করছে। ইলিয়াস ভাই বগুড়ার টিপিক্যাল আঞ্চলিক উচ্চারণে বৃদ্ধকে বললেন, চাচা মিয়া, এ ভিটেডা কিসের ভিটে, কবার পারেন? প্রশ্ন শুনে বাতা কাটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, হামরা কি সিডে কবার পারমুরে বাবা। হামরা বাপদাদার কাছ থাক্যে যা শুনছি তাই কই। ইডা বলে ওজা ধন্তুর বাড়ি আছলো। তামান দুনেত এ্যাতো বড় ওজা আর আছলো না। মরা মানষেক্ বাঁচাপার পারিচ্ছিলো। ইলিয়াস কৌতূহল মেটাবার জন্য ফের জিজ্ঞেস করলেন, এখনো কি সাপ-টাপের অত্যাচার হয় নাকি? এ জাতীয় প্রশ্ন করা একেবারে নির্বুদ্ধিতা, চোখ-মুখে এমন একটা ভাব এনে ভিটার ঠিক মাঝখানে ছোট ছোট কয়েকটা গর্ত দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল, ঐ যে দ্যাখেন না, মাটি লিয়ে গেছে। বাড়ীতে সাপের অত্যাচার হলেই মানষেরা এই ভিটের মাটি

নিয়ে বাড়ীর চতুর্মুখে ছিটে দ্যায়, দিলে সাপের ক্ষমতা নাই আর আসে। ফিরতে ফিরতে তন্ময়াবিষ্ট ইলিয়াস বললেন, দেখো, মানুষের কী অগাধ বিশ্বাস। শত শত বছর ধরে বাঙালি সমাজের অভ্যন্তরে গোপন সূত্রের মত কাজ করছে। এ বিশ্বাসে ধর্ম কোন বাধা হচ্ছে না। এভাবেই ধর্মীয় সংকীর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সুস্থ ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ক্রিয়াশীল ছিল। বর্তমানে মৌলবাদী শক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিবিড় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

ভীমের জাঙ্গাল ও পুষ্পড়ীতলায় কিছুক্ষণ

ধন্বন্তরীর বাড়ি পেছনে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে কয়েক শ' গজ পশ্চিমে অগ্রসর হলাম। ধরমতলির সংলগ্নই বলা যায় এখানে আর এক মহান কীর্তির অবস্থান-ভীমের জাঙ্গাল। এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। কেটে কেটে ধানি জমি বাড়ানো হচ্ছে বা জাঙ্গালের উপর ঘর-বাড়ি বানানো হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিয়াস শুধু বললেন, গভর্নমেন্ট কত বড় দায়িত্বহীন এ তারই প্রামণ। কোন সভ্যজাতি এ জাতীয় ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার কখনই নষ্ট করবে না। ভীমের জাঙ্গাল সংলগ্ন সংস্কার-আচ্ছাদিত একটি জায়গা ছোটকালে আমরা যে চেহারায় দেখেছি, ইলিয়াস যখন দেখতে গেলেন তখন তার কিছুই ছিল না। জায়গা ছোটকালে আমরা যে চেহারায় দেখেছি, ইলিয়াস যখন দেখতে গেলেন তখন তা কিছুই ছিল না। জায়গার নাম ছিল পুষড়ীতলা। দীর্ঘদেহী-স্থূলাঙ্গ, কয়েক শতাব্দীর সাক্ষী ৫টা কি ৬টা বকুল ফুলের গাছ ছিল গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। গোড়ায় ছিল কিছু নল খাগড়া, বেত ও অনেক লতাগুল্মাদির সমাবেশ। পর্যাপ্ত ফুল ফুটতো। বিপুল সৌন্দর্য আর গন্ধের ঔদার্যে বাতাসকে ভারি করে তুলতো। আমরা খুব ভোরে কোছা ভর্তি করে বকুল কুড়িয়ে এনে পানিতে ভিজিয়ে রাখতাম। মালা গাঁথতাম। বকুল গাছে মধ্যরাতে এক বিশালাকৃতির সন্ন্যাসিনী তার চুল শুকাতো। চুলের শেষ প্রান্ত ঝুলত আশাকোলা গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত আর এক মস্ত বটগাছের উপর। কখনো কখনো সেখানে গভীর রাত্রে দুই গ্রামের দুই প্রান্তের বকুল আর বটবৃক্ষের উপর পদযুগল বিছিয়ে আকাশ স্পর্শ করতো কোন এক অলৌকিক নারী, মুখ থেকে অনবরত বেরুত নীল আর লাল বর্ণের শিখা।

ইতিহাস ও কিংবদন্তী

এ এলাকায় ইতিহাস কিংবদন্তী একাকার হয়ে আছে। আলাদা করার প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের মধ্যে ইতিহাসের চেয়ে কিংবদন্তী বেশি জীবন্ত। মহাস্থান, গোকুল মেড়কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া আখ্যান শত শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে তার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুসত্য নিতান্তই অল্প। বেহুলা-লখিন্দরের লোককাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি দেবার জন্য নেতাই ধোপানীর পাট, কালীদহে সাগর, চাঁদ সদাগরের বাড়ি, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি প্রভৃতি পৌরাণিক স্থান ও চরিত্রকে স্থানিক রূপ দেয়া হয়েছে।

লোককাহিনীকে ভিত্তি করে অত্র এলাকার জায়গার নাম পরিবর্তন করাকে ইলিয়াস প্রাচীন বাংলার জনগণের উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হবার সামান্য আগে পৌন্ড্রের রাজা ছিলেন বাসুদেব। রাজা বাসুদেব নিজেকে কৃষ্ণ

বলে দাবি করে পুরাণস্বীকৃত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "এই গোপনন্দন কৃষ্ণ কোন সাহসে আমার নাম গ্রহণ করিয়াছে? জগতে একমাত্র আমিই 'পুরুষোত্তম বাসুদেব', এই উপাধি এবং চিহ্ন সে কেন গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার সুদর্শন অতি তীক্ষ্ণ আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র, আমারই শার্ঙ্গ নামক মহারব ধনু ও কৌমুদিকী নামক বৃহৎ গদা- আমিই গদাধর-এই উপাধি গ্রহণের আর কাহারও অধিকার নাই।' এর স্বীকৃতি মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণও দিয়েছেন এই বলে, "এই দুরাত্মা মহাবল ও পরাক্রান্ত, আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মোহবশতঃ আমার শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে, এই রাজা জগতে বাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌন্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি" (সভা, ১৩অঃ) (এই দুটি উদ্ধৃতি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' থেকে গৃহীত)। বাসুদেব শুধু প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে কৃষ্ণত্বের দাবিই করেননি, তার দাবিকে ঐতিহাসিক প্রমাণের জন্য পুন্ড্র এলাকায় কিছু নতুন নামকরণ করেছিলেন। যেমন, বৃন্দাবন পাড়া, গোকুল, মথুরা, কৃষ্ণপুর, শ্যামপুর, রামশহর ইত্যাদি গ্রামগুলি এখনো তার সাক্ষ্য বহন করছে। কৈবর্ত বিদ্রোহও পুন্ড্রের এক অসাধারণ অধ্যায়। এই সমস্ত বিষয়ে ইলিয়াসের গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহকে তিনি রাজশক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়িত নিম্নবর্ণের আত্মজাগরণ বলে বিশ্বাস করতেন। ব্রাহ্মণ কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি তিনিই পড়েছিলেন। মহাস্থান যাদুঘরের কর্মকর্তার সঙ্গে অনেক আলোচনা করার পর বইটা দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন। সম্ভবত গ্রন্থটিতে সুনীতিকুমার বাবুর ইংরেজী অনুবাদ সংযোজিত রয়েছে। বইটি পাবার পর প্রথম দিনে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পড়েছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত-বিদ্বেষী ছিলেন বলে রাজশক্তি হিসেবে ওদের সুনজরে দেখেননি। কিন্তু দিব্বোক, রুদোক ও ভীম ইলিয়াসের সহানুভূতি কাড়তে পেরেছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহকে তিনি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানেন নি। এই উত্থানের সঙ্গে তিনি হাজার বছরের ইতিহাসের এক ঐক্যসূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মহাস্থানে গেছি অসংখ্যবার। আমার মনে হয় প্রতিটি মুহূর্তেই এই নগরী তাঁকে ডেকেছে, মোহময়ী সে ডাক। প্রতিবারই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি কিছু না কিছু অন্বেষণে ফিরেছে। দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির ভেঙে উঠতে উঠতে প্রতিবারই তীব্র উত্মা বলক দিয়ে উঠত তাঁর কণ্ঠে ঐতিহাসিক মসজিদটি ধ্বংস করার জন্য। ১৭১৯ সালে ফররুখ শিয়রের আমলে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্প্রসারণের প্রয়োজনে মূল মসজিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইলিয়াসের বিশ্বাস, সম্প্রসারণ যত ঘটবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের জায়গা তত কমবে। খোদার পাথর ভিটায় এসে স্থানীয় সংস্কারাচ্ছন্ন লোকজনের নতুন বিয়ানো গরুর প্রথম দোহনকৃত দুধ এনে পাথরের উপরে পরবে বিশ্বাসে ঢেলে দিতে দেখেছেন।

গড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ইঁটগুলোর ব্যক্তিস্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার ও পাচার করার মধ্যে পুরাকীর্তি নিশ্চিহ্নকরণের প্রবণতা ও প্রতিযোগিতা তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। উত্তর দিকে নব পর্যায়ে খননের ফলে যে মূল ফটকটি বের হয়েছে, যাকে তিনি 'ঘাঘুড় দুয়ার' বলেছিলেন, তা দেখে তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ফরাসি খননকারী দলের খননের ফলে পাতকুয়া পাওয়া গেছে, একই এলাকায় বেশ কয়েকটি, তাঁর ধারণশ কূপগুলো এক একটা অলাদা আলাদা স্তরের ও কালের। রামশহরে গ্রামের পুকুরের ঠিক মাঝখানে এমনি

একটি প্রাচীন পাতকুয়া আছে, এখনো আছে, ছোটকালে মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে গোসলের সময় ঐ কুয়ার ভেতর ডুব দিয়ে মাছ ধরা একটা নেশার ব্যাপার ছিল। ইলিয়াসের ধারণা, পুণ্ড্রনগরকে কেন্দ্র করেই তদানীন্তন সময়ে বা পরবর্তীতে রামশহরে কোন জনপদ গড়ে উঠেছিল এটা নিশ্চিত। চীনের প্রাচীরের মত অনেকটা দেখতে মহাস্থানের পাঁচিলের ওপর দিয়ে একেবারে পশ্চিমে প্রান্তে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ কালীদহের সাগর দেখেছি আমরা। প্রচলিত লোক বিশ্বাসের কথা শুনিয়েছি আমি। এই কালীদহের বিলে এখনও কালসাপ দেখা যায়, যাদের কোন ছায়া নেই। এই ছায়াহীন সাপ দংশকন করলে এমন কোন লৌকিক-অলৌকিক শক্তি নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে। ছোটকালে গল্প শুনেছি, প্রতি বছর এই বিলের একটা করে মানুষ খাওয়া চাই-ই।

জয়াপীড়ের কমলা সুন্দরী ও সূর্যভান

প্রতিবারই বেবিটাক্সি থেকে নেমে গোকুলের ছোট্ট একটি রেস্টুরেন্টে তাঁর চা খাওয়া চাই। তারপর সোজা পশ্চিমের রাস্তা ধরে হাঁটা। হাঁটাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ব্যাগ কাঁধে জুতা পায়ে হাঁটতে এবং গল্প বলতে তিনি ক্লান্তিহীন। কোন কোনদিন ৭/৮ থেকে ১০/১২ এমনকি ১৫ মাইল পর্যন্ত হাঁটার অভিজ্ঞতা আছে। গোকুল মোড়ে এসে একবার অন্তত উপরে ওঠা বাধ্যকতামূলক। তারপর হাজার বছরের পুরানো প্রশ্নের সাথে চেতনার কথা বলাবলি কিছুক্ষণ। একটু দূরেই সূর্যভানের বাড়ি। একসময় সূর্যভানের ভরা যৌবন ছিল, যৌবনের তুমুল দাপটও ছিল বোঝা যায়। হালকা-পাতলা গড়ন, টিকোলো নাক, চোখে-মুখে এখনো সচকিত করে তোলার ক্ষমতা রাখে বোধহয়। সূর্যভান স্ত্রীরোগ বিষয়ক কবিরাজ। পারিবারিক সূত্রে ইলিয়াস ভাই সূর্যকে জানাতেন। আমরা চিনতাম এমনিতেই। বাড়িতে গিয়ে দেখি সূর্যভান পুত্রবধূর সাথে কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে গোটা বাড়ি লেপে দিচ্ছে। মইয়ের উপরে উঠে দেয়ালগুলো ছবি আঁকার মত করে লেপছে। জিনিসপত্তর সব আগোছালো। বসতে দিতে পারলো না বলে সূর্যের সঙ্কোচের সীমা নেই। চাঁদ সদাগরের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়াস বললেন, সূর্যভানের মধ্যে জয়াপীড়ের কমলা নর্তকীর ছায়া খুব স্পষ্ট মনে হয়।

চাঁদ সওদাগরের ভিটে ও প্রজ্ঞাবান ইলিয়াস

পলাশবাড়ি পার হয়ে চাঁদমুহা হাট ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে যে উঁচু ভিটার উপর অনেকক্ষণ দু'জনে বসেছিলাম সেটা ছিল চাঁদ সদাগরের বাড়ি। ইলিয়াস বললেন, এখন আমরা চাঁদ বাবুর অতিথি, ইলিয়াস ভাই সঙ্গে সামান্য শুকলো খাবর এনেছিলেন। দু'জনে ভাগ করে খেলাম। তারপর বহু-মাত্রিক রসের উৎস পাইপ যন্ত্রের সাথে তৈরি করে টানতে টানতে ইলিয়াস বললেন, হাজার দুই বছর আগে এই সওদার বিল একটা বিশাল বন্দর ছিল। কল্পনা করো, দেশী-বিদেশী জাহাজে হয়ত চিনি-মশলা, রেশম, কাপড় রপ্তানির জন্য বোঝাই হচ্ছে, চতুর্দিকে অজস্র লোকজন, হৈ চৈ, কোন কোন জাহাজ থেকে হয়ত মালামাল নামানো হচ্ছে, জীবন্ত সব-অথচ আজ সব মৃত। ভাবতেই কেমন লাগে। সেই ইতিহাস পুরাণের মোড়কে নতুন মাত্রা পেয়ে আমাদের জাতিগত কল্পনাকে উজ্জীবিত করে স্থায়ী করেছে বটে, কিন্তু

সহস্র শতাব্দী এখানে মৃত্তিকা-লগ্ন হয়ে বন্দীদশা প্রাপ্ত। আবেগ আর্দ্র কণ্ঠে ইলিয়াস বললেন, মাটির নিচে স্তূপীকৃত ইঁটে স্রষ্টার আঙুলে টোকা দিলেই অমৃতের ফল্গুধারা বেরিয়ে আসবে। শুধু একজন মহা স্রষ্টার প্রয়োজন। তখন আমার মনে একটি কথাই বারবার পাক খাচ্ছিল, সে মহৎ স্রষ্টা ইলিয়াস ছাড়া অন্য কেউ কি?

বরজ শিল্প ও আহম্মদ আলি মাস্টার

এক সময় আমাদের এলাকায় প্রচুর পান উৎপাদিত হত। ছোটকালে আমি নিজেও সদ্য লাগানো পান গাছের গোড়ায় পানি দিয়েছি। এখন কমে গেলেও রাস্তার দু'পাশে পানের বরজ চোখে পড়ে। পানের গাছ বড় হয়ে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছুলে চয়নযোগ্য পানপাতা সংগ্রহ শেষে লতানো কাণ্ডটাকে গুটিয়ে মাটির নিচে গাঁথতে হয়। জৈবসার সহ লতাবৃক্ষকে কুণ্ডলি পাকিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখার প্রক্রিয়াকে স্থানীয় ভাষায় 'বরো পোতা' বলা হয়। একটা ছোট্ট পিঁড়ি ও বাঁশের তৈরি খন্তি মারফত পোঁতার কাজ সেরে পেছন দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। বরো পোঁতার সময়টা বেশ মজার। দশ-বারোজন কামলা এক একটা গলিতে কাজ করতো আর পাগলা মোজাম মদ্দিখানে বসে গলা ছেড়ে কেচ্ছা শোনাতো। আমরা স্কুল কামাই করে কাশের খড়ের ছাদের নিচে আধো ছায়া আধো রোদের মধ্যে বসে মোজাম পাগলার কেচ্ছা শুনতাম। ওর গলা উত্তেজনা ও ভাঙা কান্নার কষ্টে মোহাবিষ্ট হয়ে থাকত যা আমাদের আকর্ষণের মূল বিষয় ছিল। ইলিয়াস বরো পোঁতার কৌশল বরজের ভেতর গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলেন, নিজে বসে থেকে পেছন দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন এবং এ প্রক্রিয়াকে ব্যাক গিয়ারে যাওয়া বলে হাসলেন। বিড়ি ও খন্তা থাকলে তিনিও পুঁততে পারতেন বলে কৃত্রিম দম্ভও প্রদর্শন করলেন। পানপাতা বেড়ে ওঠার সাপোর্ট বা খুঁটি হিসেবে জ্যামিতির চতুর্ভুজের আকৃতিতে বাঁশের তৈরি চারটি পাতলা বাতা মাটিতে গেঁথে দিতে হয়। ছাদ বরাবর এসে চারটি বাতা একই জায়গায় মিলিত হয়। গোটা বরজ চারটি চারটি করে বাতার মিলনে সুদৃশ্য বন্য শোভার মত এবং বেড়া দিয়ে ঢাকা আধো শীতল ছায়ার ব্যাপারটি ইলিয়াসের শিল্প বলে মনে হয়েছিল।

বরজ-সৌন্দর্য দর্শনের পর আমরা আহম্মদ আলি মাস্টারের বাড়িতে গেলাম। এককালে এই আহম্মদ মাস্টার আমাদের সবার প্রাণের রাজা ছিলেন। বিশালদেহী উচ্ছল মানুষ একটা হেরিকেন হাতে চৌদ্দ মাইল হেঁটে বগুড়া শহরে এসে থার্ড ক্লাসে সিনেমা দেখা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। রাত জেগে জেগে বাইরে মাচাং-এ বসে সিনেমার গল্প শোনাতেন। বেহুলা লখিন্দরের বাসর ঘরের সামনেই তাঁরই প্রচেষ্টায় একটা ছোট হাট বসতো, সেখানে প্রতি বছরই তিনি যাত্রা দল আনতেন। সে এক মহাব্যাপার! সত্যিকার অর্থেই আহম্মদ মাস্টার একজন ক্যারেক্টার ছিলেন। ইলিয়াসের একটা আকর্ষণ ছিল। বাড়িতে গেলে ঘরে বসতে দিলেন। ইলিয়াস ভাইয়ের আব্বাকে ভাল করে চিনলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসলেন। সেই দেহ নেই, উচ্ছলতা, উজ্জ্বলতা, প্রাণবন্ততা, সব নিঃশেষ। খুব খারাপ লাগলো। একযুগ পরে চৌকির নিচ থেকে চাঁপা কলা বের করে খেতে দিলেন। শেষ বয়সের অসহায়ত্বকে গোপন বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, এত বড় মানুষকে তুই নিয়ে আলু, কি দিয়ে সমাদর করমু...। কথার মধ্যে যে গভীর

আন্তরিকতা লুকিয়ে ছিলো তা আমি ভুলিনি।

কোন একবার ফেরার পথে হরিপুর গ্রামে বন্ধু ডাক্তারের ছেলের বাড়িতে কিছুক্ষণ অবসর নিচ্ছিলাম। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুপাড়া। একসময়ে বেশ জমজমাট ছিল। সন্ধ্যা থেকেই শুরু হত কীর্তন ভজনের মচ্ছব। এখন আর কিসসু নেই। বর্তমান বাংলাদেশে সংখ্যলঘু হিসেবে হিন্দুরা কীরকম আছে একথা ইলিয়াস কিছুতেই ওদের সন্দেহপ্রবণ মুখ থেকে বরে করতে পারছেন না। ওরা কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস করছিল না, ঘন্টাখানেক কথাবার্তার পর একটা পর্যায়ে যখন বুজল যে এরা ক্ষতিকারক তেমন কিছু নয়, তখন তারা ভয়ঙ্কর কিছু কথা শোনালো। ওরা বলল : আমরা কি করে এখানে থাকব বলুন। রাত্রে গান টান করতে বসলে ঢিল ছোঁড়ে। দুর্গাপূজা বা অন্য কোন পার্বণে কোন না কোনভাবে মানসিক ভীতির মধ্যে থাকতে হয়। একবার কালীর জিব ভেঙে ফেলেছিল। এ-জাতীয় অত্যাচারের মধ্যে এখানে থাকা অসম্ভব। ইলিয়াস ভাই ওদের অনেক বোঝালেন। অস্তিত্ব টেঁকানোর জন্য তীব্র প্রতিরোধী ভূমিকা নেবার সাহস জোগালেন। আশি বছরের এক বৃদ্ধের কাছ থেকে তার যৌবনের কিছু গান ডাইরিতে টুকে নিলেন। ফিরতে ফিরতে বললেন, সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান মৌলবাদী দৃষ্টিকে ছোট করতে বাধ্য করে। ওরা চলে গেলে বাংলাদেশে একচক্ষু গাড়লের সংখ্যা বেড়ে যাবে, সাংস্কৃতিক বৈকল্য তথা ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। ওদের এদেশে থাকার প্রয়োজন। পুন্ড্রকেন্দ্রিক ইলিয়াস অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা করেন। আমার তা নেই। অনেক খুঁটিনাটি বিষয় যা হয়ত আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অথবা আমার বোধের বাইরে ছিল-ধরতে পারিনি। কোন কোন জায়গায় হয়ত অপব্যাখ্যাও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি আগাগোড়া সৎ থাকার চেষ্টা করেছি।

ভ্রমণে ইলিয়াছের সঙ্গী হওয়া এক বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে আমি মনে করি। তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ। তাঁর রসিকতাপূর্ণ এক একটি কথা গগনবিদারী হাসির জ্বালানি তো হতই, নতুন মাত্রিকতা দেখে মুগ্ধও হতাম। কারণ তাঁর অপরিমেয় রসায়নে হাসির ঝলকে ঝলকে থাকত বৈদগ্ধ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, আক্রমণের শানিত অথচ অদৃশ্য ধার। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তার ধারাল রসিকতায় ঋদ্ধ হয়েছি।

ইলিয়াস সম্পর্কে আমার ব্যক্তিকথন শেষ হয়নি। অনিঃশেষ ইলিয়াসকে নিয়ে পৌণ্ডীয় প্রেক্ষাপটে আমাকে আরও লিখতে হবে- আমি আরও লিখব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আয়াতুল্লাহ সাঙ্গালজীর সাক্ষাৎকার

মূল ফার্সী থেকে অনুবাদ : আনিসুর রহমান স্বপন

রবীন্দ্রনাথের পারস্য সফর - সে দেশের শুধু প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক অংগনেই নয়; বরং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অংগনেও প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে কবি হিসেবে যতটা, ঠিক ততটাই একজন ভারতীয় দার্শনিক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রমানস ও রচনার সাথে মরমীয়া সুফীবাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং রবীন্দ্রনাথের বংশ ও পরিবারে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার খবর পারস্যের সুধীজনরা রাখতেন। ধর্মীয় বিষয়ে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী রবীন্দ্রনাথের উদার নৈতিকতা এবং মুক্ত দার্শনিক চিন্তার জন্যে পারস্য সফরের সময় তৎকালীন ইরানের দার্শনিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনায় মিলিত হন। সমসাময়িক ইরানের প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আল্লামায়ে মোয়াজ্জেম মোসলেহে কবীর হাজ্ব শরিয়ত সাঙ্গালজী গাফুরুল্লাহ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনাকারী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা ও মতামত বিনিময়ের বিবরণ ফার্সী ১৩১১ সালের ১৮ই ওর্দীবেহেস্ত, ২রা মহরম আল হারাম ১৩৫১ হিজরীতে রোজনামেহ (ফার্সী দৈনিক) 'ইরান': ১৬শ বর্ষ:৩৭৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়[১]। পরবর্তীকালে আয়াতুল্লা সাঙ্গালজীর গ্রন্থ 'ইসলাম ও মুসিকী'- তে এ সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে[২]। নীচে মূল ফার্সী হতে অনুদিত এ সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেয়া হলো:

"সকাল ন'টায় আমার গুরু হযরত ওস্তাদে মোয়াজ্জেম জনাব শরিয়ত সাঙ্গালজী এবং আরো কয়েকজন ফকীহ্ কে (উচ্চমার্গের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব) নিয়ে বাগে নিরুদ্দৌলার আঞ্জুমানে আদবীয়াত (সাহিত্য সংস্থা) ভবনের একটি কক্ষে বসেছিলাম এবং পরস্পরের সাথে খোশগল্প করছিলাম। কামরায় শুধুমাত্র একটি চেয়ারই খালি ছিলো। ভারতীয় দার্শনিক ডক্টর তাগোর (ড: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে কখন এসে উপবেশন করবেন, আমরা তারই অপেক্ষায় ছিলাম। কয়েক মিনিট পরেই দীর্ঘদেহী, ঈষৎস্থূল, ভাস্কর্যের মতো শ্বেতশুভ্র চুলদাড়িতে সুশোভিত, মাথায় কালো মখমলের টুপী ও লম্বা ওভার কোট পরা বয়োবৃদ্ধ মণীষী বিশাল দরজা অতিক্রম করে আস্তে আস্তে কামরায় প্রবেশ করলেন। মুহূর্ত খানেক বাদেই ভারতীয়দের স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচার অনুযায়ী সৌজন্য প্রকাশের ভংগীতে দু'হাত উঁচু করে অভ্যাগতদের স্বাগত জানালেন। এরপর এলো উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়ের পালা। ডক্টর সবার সাথে সৌজন্য বিনিময় করে নিজ আসনে এসে বসলেন।

জনাব শরিয়ত সাঙ্গালজীকে আগেই ডক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো বিশিষ্ট মহান ইসলামী চিন্তাবিদ এবং যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে পান্ডিত্যের অধিকারী প্রথম কাতারের আলেম হিসেবে। ডক্টর এরপর জনাব শরিয়তের দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

একদিকে দর্শন এবং অন্যদিকে প্রাচ্য ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আপনার মতো বিশিষ্ট ও মহান ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সীমাহীন সৌভাগ্যের

অধিকারী হয়েছি। বিশেষ করে এ সাক্ষাৎকারকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ সম্মানের বিষয় হিসেবে মনে করছি।

জনাব শরিয়ত : বহু বছর ধরে আমি আপনার নাম শুনে আসছি। আমার মন মগজে সব সময়েই এমন এক দিনের স্বপ্ন লালন করে আসছিলাম যেদিন, আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে; প্রশান্ত মনে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কিত আমার জিজ্ঞাসার জবাব জেনে নেবো আপনার কাছ থেকে।

ডক্টর তাগোর : আমিও সীমাহীন উৎসাহ ও অধীর আগ্রহ নিয়ে এমন একদিনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, যেদিন ইরান পৌঁছাতে পারবো, ইরানের জ্ঞানী-গুণীজনদের সাথে পরিচিত হবো। বিশেষ করে আমার অসীম আকাংখা ছিলো ইরানের জ্ঞান বিজ্ঞান জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে জানবো, চিনবো। এ কারণে শিরাজ পৌঁছা মাত্রই আমি ছুটে গিয়েছি হাফেজ ও সাদার সমাধি পরিদর্শনে।

জনাব শরিয়ত : মানুষ যখন দুনিয়ার মহান ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের — আপনার মতো একজন পূর্ণাংগমানব ও মহাত্মার — যার অস্তিত্বই হলো মানবতার জন্যে সুফলদায়ক — যার সমস্ত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এবং জীবনচারণ হলো মানবতার জন্যে কল্যাণকর — এমন একজনের সাক্ষাৎ পায় — তখন তার উচিৎ এ দুর্লভ সুযোগকে যতদুর সম্ভব বেশী করে কাজে লাগানো। তাই এখন আমারো একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা হলো আপনার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, যা কিনা বিজ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রে চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং উদ্যোগ ও ক্ষেত্র তৈরীর কারণ হয়েছে — তার কাছ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্নের জবাব জেনে নেবো। এখন আমি এ প্রশ্নই করতে চাই যে, আপনার মতে কোন জিনিস অধিকতর বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ বয়ে আনে? কিসে মানুষের সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে?

ডক্টর তাগোর : অবশ্য এ ব্যাপারে এবং এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি যা মনে করি — সম্ভবত: তা আপনাদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সাথে মিলবে না বা আপনারা হয়তো এ জবাবের সাথে একমত হবেন না। তবু যখন আপনি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছেন — তাই এর জবাবে বলছি :

মানুষ এক চিরঞ্জীব শাশ্বত অসীম অনন্ত হতে — জানিনা সে অমৃত পুরুষোত্তম কে বা কি এবং সে ব্যাপারে আমার কোনো ভাবনা-চিন্তার কাজও নেই — এ দুনিয়ায় এসেছে। এ দুনিয়া হলো মানুষের জন্যে এক পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র বা উপসনালয়ের মতো। মানুষ এখানে এক তীর্থযাত্রী এবং তাকে এ তীর্থে অবশ্যই আসতে হয় ও হচ্ছে। পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণ করতে হয় এ তীর্থাঙ্গণের চক্রবৃত্তে। এখানেই অতিবাহিত করতে হয় ইহলৌকিক জীবন। মানুষ সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-কারণ মূলত: এই যে, তাকে সাফল্যের সাথে এ পরিভ্রমণ বা তীর্থ পরিক্রমণ শেষ করতে হবে। এ তীর্থ সমাধিতে মানুষের যাত্রা বিরতি বা অবস্থান একান্ত সাময়িক এবং এখানে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিবাহিত করতে হয়। চতুস্পদ প্রাণী বা অন্যান্য জীবজন্তুও এ দুনিয়াতে আসে, চলে যায় এ দুনিয়া থেকে। কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে মানুষের পার্থক্য হলো — ওরা শুধুমাত্র আহার-নিদ্রা-মৈথুনের জন্যেই

আসে এবং তারপর পৃথিবী থেকে চলে যায়। তারা শুধুই সৃষ্টি এবং এক মহাসৃষ্টির অংশমাত্র। রক্ত-মাংস-পশম-চামড়ায় আবৃত এক প্রাণ। কিন্তু যে মানুষ অন্যান্য প্রাণীকূল হতে শ্রেষ্ঠতর— তার জন্যে এমনটা ঠিক নয় যে, মানব নামক প্রতিটি সৃষ্টিই মনুষ্য পদবাচ্য। বরং যে মানুষ বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ও চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং অন্যান্য প্রাণীকূল হতে এসব গুণাবলী যার মধ্যে নূন্যতম হলেও বেশী সেই হলো সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। এ মানুষের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, মানবতার শাশ্বত কল্যাণ কামনা স্বতত: তার মধ্য হতেই উৎসারিত হবে। মানবতাকে করবে তার স্বভাব ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে ঘনিষ্ট। এর ফলে তিনি মানবতার সেবা করবেন। তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব মানবতার ততটুকু সেবা করতে তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। যে কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন শাখাতেই বুৎপত্তি অর্জন করুন না কেন — তার সুফলটুকুকে তিনি অবশ্যই মানবতার কাছে পৌঁছে দেবেন। বিজ্ঞানী তার বিজ্ঞান সাধনার মাঝে, চিকিৎসক নিজের চিকিৎসা কর্মের মধ্য দিয়ে, চিত্রকর তার চিত্রাংকনের ভিতরে, কবি তার কাব্যের মাধ্যমে, সংগীতজ্ঞ তার গায়ন-বাদন-সংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে যাতে মানবতার সেবা করতে পারে — তার জন্যে ঐশী মহাপ্রভু এক স্বাভাবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য তৈরী করে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ যে কেউ যে কোন পথ ও পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক না কেন মানবতার সেবা, মানুষকে সাহায্য করতে পারে। আর এ সেবা ও সাহায্যই মানুষকে স্বীয় সিদ্ধি এবং উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সবার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য একই। সবাই একই দিকে অভীষ্ট সন্ধানী, একই উদ্দেশ্য লক্ষ্যেরই অভিযাত্রী হয়ে ধাবমান। যখন আমরা মানবতা সম্পর্কে কথা বলি তখন নি:সন্দেহে তা দিয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতি সম্পর্কে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে কারো সম্পর্কে কথা বলিনা। আমরা বলি এক সামগ্রিক ও সার্বজনীন মানবতার কথা। আমি যখন ইউরোপে গেছি তখন দেখেছি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল উন্নতি সেখানকার মানুষকে আবিষ্ট ও গ্রাস করে রেখেছে। নি:সন্দেহে ইউরোপীয়রা এসব দিকে প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে এবং দু:খজনক হলেও সত্য যে, এসব দিক নিছক বস্তুগত ও ভোগবাদী। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইউরোপীয়রা আত্মিক ও আধ্যাত্মিকদিক হতে কোন উন্নতিই সাধন করতে পারেনি। এদিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্য অনেক বড়, বহুদূর আগানো। যাই হোক সবাই মানবতার সেবা করছে, কোন না কোন ভাবে এটা মানবতার জন্যে সুফল বয়ে আনছে। তারা একভাবে মানবতার সেবা করছে। আবার অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করছে। এসব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নি:সন্দেহে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন — যারা মান-মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যান্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর স্থানের অধিকারী। তারা এসেছেন মানবতাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্যে। মানবতাকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমেই তারা মানুষের প্রতি সেবামূলক দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাদের রয়েছে রেসালাত বা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা, তাবলীগ বা ধর্মীয় নীতি-আদর্শ প্রচারের দায়-দায়িত্ব, আর রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক শক্তি। তাদের কাছে পৌঁছে ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশের বাণী। ঐ প্রত্যাদেশের হুকুম বা নির্দেশ অনুযায়ী তারা মানুষকে এক ও একক উপাস্যের — যিনি কিনা সবার জন্যে একই — তাঁর উপাসনার জন্যে আহ্বান জানান। একথা বলার পেছনে আমার উদ্দেশ্য

হলো : সত্যিকার রেসালাত এবং রুহানিয়াতকে তুলে ধরা। যারা মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার আবেগ অনুভূতিকে বিকশিত করেন, তারা মানুষকে এক ও একক উপাস্যের প্রতি — যিনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও সবার জন্যে একই, যাকে যে কেউ স্ব স্ব পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করতে পারেন — তার উপাসনার জন্যে আহ্বান জানান। এ উপাসনা বা উপাস্যের কাছে পৌঁছানোর পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ দিয়ে থাকেন নবী-রাসূলরা এবং যাদের কাছে ঐশী বাণীর প্রত্যাদেশ পৌঁছেছে তারা। আমি নিজেও তাদের ঐ সুউচ্চ শীর্ষ মর্যাদা সম্পর্কে জানি। আমি কোন প্রকৃতি বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ নই। আমার জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য এবং আমার কাছেও পৌঁছায় ঐশী নির্দেশনার বাণী। আমি ও আমার অনুসারীদেরকে, আমার স্বদেশবাসীদেরকে আহ্বান জানাই শাশ্বত কল্যাণের পথে। মোট কথা এর মাধ্যমেও আমি কিছু মানব সেবার আনজাম দিয়ে থাকি। আমি হলাম এক তীর্থ যাত্রী — যে এ তীর্থ ক্ষেত্রে এসেছে এবং এখানে সাময়িক অবস্থান ও তীর্থ পরিক্রমা কালে আমার উপরেও বর্তিয়েছে মানব সেবার দায়-দায়িত্ব। আর সে অনুসারে আমিও জনগণকে দিচ্ছি পথ-নির্দেশনা। একথা আমাদের বুঝতে হবে যে, মানব-কল্যাণের অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তির কল্যাণ নয়। বরং এক সার্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণ। আর সবাই যদি স্ব স্ব শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষের সেবা করে এবং নিজেদেরকে পৌঁছায় পরিপূর্ণতায়, তাহলেই তা বয়ে আনে মানবতার সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ। আর এভাবে সবাই-ই স্ব স্ব মেধা, যোগ্যতা, সামর্থানুযায়ী কাঙ্খিত পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ হতে পারে।

জনাব শরিয়ত : খুব ভালো। এসব কথা ঠিকই। সুফীরাও এধরনের কথাই বলে গেছেন। মহা মনীষীরা পরিপূর্ণ শাশ্বত কল্যাণ সম্পর্কে যেসব অনুসন্ধান ও সাধনা চালিয়েছেন তাও প্রায়শ:ই এ পরিপূর্ণতা অর্জন সম্পর্কেই। তবু আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে...

ডক্টর তাগোর : আমাকে আরেকটু বলার অনুমতি দিন। উল্লেখিত উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে তীর্থ পরিক্রমায় বহু প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা রয়েছে. এসব সমস্যা-সংকট মানুষকে তার কাঙ্খিত চূড়ান্ত উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা দেয়। মানুষের কামনা-বাসনা-লালসা-ভোগ স্পৃহা হলো এ ধরনের এক বাধা। অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-মূর্খতা হলো এপথে আরেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা। অবশ্য একথাও ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বা মানুষের মধ্যেই ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক বা রুহানী প্রবণতার অস্তিত্ব থাকেনা। বরং অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই থাকে পাশবিকতা, ভোগ-লালসার অবাধ আধিপত্য। যে মানুষ বিচার-বিবেক-বুদ্ধির পরিশীলিত স্তরে পৌঁছেছে, সে অন্যান্যদেরকে ঐসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণে অনেক সহায়তা করতে পারে। এ আশংকাও রয়েছে যে, এসব প্রতিবন্ধকতা এবং ভোগ ও বস্তুবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা — কাঙ্খিত ঐ পরম কল্যাণকে বিপর্যস্ত করে দেবে। সুতরাং বিচার-বিবেক-বুদ্ধির স্তরে পৌঁছানো মানুষ, যারা ঐশী প্রত্যাদেশের অধিকারী এবং যারা ঐ প্রত্যাদেশের আহ্বান শুনতে পেয়েছেন — তাদের সবারই দায়িত্ব কর্তব্য হলো, উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো মানব সমাজ হতে দূর করার ব্যবস্থা করা; এজন্যে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালানো; এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন অব্যাহত রাখা।

জনাব শরিয়ত : এসব বক্তব্য ঠিকই এবং এতে আমরা কোন অসুবিধেও দেখছি না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে কথাটি আসে তা হলো — আমরা সবাই জানি সত্যিকার মানুষের পরিপূর্ণতা এবং যথার্থ কল্যাণ অর্জনের একটি সঠিক পথ রয়েছে। ঐ পথ অনুসরণ করে সত্যিই মানুষ পরিপূর্ণতার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যেহেতু সবাই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে চায়, সেহেতু তারা ঐ পথের দিকেই ধেয়ে যান। আর এ পরিপূর্ণতা তা-ই, যার সম্পর্কে পবিত্র কোরান শরীফে বলা হয়েছে : ' হে মানুষ। তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অত:পর তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে। (আল- কোরান : ৮৪:৬)। ' পরিপূর্ণতা অর্জনের এ সফরে বা পথ পরিক্রমণের জন্যে অবশ্য মানুষকে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ নির্দেশাবলী অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হয়। এ পথের প্রতিবন্ধকতাগুলোও আমরা জানি। কিন্তু এখন আমি জানতে চাই, কোন জিনিষ আমাদেরকে এ পথে পৌঁছে দেবে? আমাদের পরিপূর্ণতা বা অপূর্ণতা কোথায় ও কিসে? আমাদের পরম উপাস্য বা প্রভূ কে? এ সম্পর্কিত সঠিক বিধি-বিধানগুলো আমরা কোথা হতে পাবো? কার কাছ হতে আমরা গ্রহণ করবো এ সম্পর্কিত নির্দেশনা? কোন নির্দেশনাকে দেব অগ্রাধিকার এবং কোনগুলোকে করবো বিশ্বাস — যে তা আমাদেরকে ভুল ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করবে না? সত্যিকার কল্যাণ অর্জন যার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হবে না? এখন বলুন কোন দার্শনিক, কোন জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী, কোন নবী-রাসূল এ পথকে সুষ্ঠুতর, সুন্দরতর ও সঠিকতরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন?

ডক্টর তাগোর : (মুহূর্তখানেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তাভাবনা এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে ও ঠোটে তর্জনী রেখে বললেন) অবশ্যই এ ঐশী আসমানী প্রত্যাদেশ মানব ইতিহাসের শুরু হতে এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে। ঐসব মহান ব্যক্তিত্ববর্গের সবাই ছিলেন এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাদের সবারই কর্তব্য ছিলো এ সংক্রান্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন এবং এ পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। এরপর আমরা বলতে পারি—এ ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বা শ্রবণকারী প্রত্যেক মহান ব্যক্তিই সমমর্যাদা সম্পন্ন, সমান শ্রদ্ধেয়। যারাই মানবতার এ মহাতীর্থ সঠিকভাবে পরিক্রমণ করেছেন, মানবতার পরম উপাস্যের উপাসকদের সেবা করেছেন — তারা সবাই হলেন সৎকর্মশীল, মংগলকারী। মানবতার এ সেবার জন্য অনুসৃত সমস্ত পথ ও পদ্ধতিই হলো উত্তম। সমস্ত নবী-রাসুল-ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত মনীষীরাই একই দায়-দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং তাদের সবার নির্দেশনাই হলো অতি উত্তম। আমিও এ পথে মানবতার সেবা করে যাচ্ছি। সত্যকে সঠিকভাবে চেনা-জানা, আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মাধ্যমেই আমাদেরকে এ সেবার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। যে সব ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং যারা এ ব্যাপারে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন — তাদের সবাইকেই অবশ্যই ভালবাসতে হবে। অবশ্যই তাদের জন্যে সব কিছু বিলিয়ে দিতে হবে, তাদের কাছে থেকে সব কিছু গ্রহণ করতে হবে। কখনো এ কথা বলা যাবে না যে, কোনো একটি পথ উত্তম বা কোনো একটি পথ নিকৃষ্টতম। যেমন : মানবতার সেবার জন্যে আমার বহু পথ, পদ্ধতি ও সুযোগ রয়েছে। আমি এক বিশিষ্ট, মহান ও সুপ্রাচীন বংশ হতে এসেছি। আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আমি এ পথেই ব্যয় করছি। স্বদেশে আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরী করেছি। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। সমস্ত দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণীরাই এভাবে মানবতার সেবা করে থাকেন। সারা বিশ্বেই আমার কবিতা পড়া ও

পড়ানো হচ্ছে। যিনিই এসব কবিতা মনোযোগ দিয়ে পড়েন, অবশ্যই তার আন্তরিক আবেগ-অনুভূতি-চেতনা, তার প্রেম ভালবাসা গভীরতর হয়, বৃদ্ধি পায়। যেখানেই আমি সফর করি না কেন, সেখানেই আমি বলে থাকি — চেষ্টা করে থাকি — মানুষকে মানবতার চিন্তা-প্রেম-ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে। আমি প্রত্যাশা করি, এ ধরনের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা মানুষের সুন্দর ও শুভ অনুভূতিগুলোকে বিকশিত করতে পারবো।

জনাব শরিয়ত : ঠিক আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না। আমি বলতে চাই — ধরুন নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে যদি সঠিকভাবে চিনতে ও বুঝতে না পারি — খুব ভালো করে বিষয়টি লক্ষ্য করুন — এতে কোন সন্দেহ সংশয় নেই যে, পরম সত্যের পথ, পরিপূর্ণতা অর্জনের পথ, মুক্তি ও পরিত্রাণের পথ — একটির বেশি নেই। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যে — মানবতার মহা-মনীষীরা — কি নবী-রাসূল (স:) — আর কি-ইবা দার্শনিক ও জ্ঞানী গুণীরা — প্রত্যেকেই স্ব স্ব পন্থায় এ পথকে বিশ্লেষণ করেছেন — একেক জন এ পথকে একেক অংশে বিভক্ত করেছেন। এ পথের সন্ধান ও অতিক্রমণের বিষয়ে দিয়েছেন একেক ধরনের নির্দেশনা। নবী-রাসুলদের অধিকাংশ নির্দেশনাই হলো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। দার্শনিকরাও একেক জনে একেক ধরনের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুবাদী দার্শনিকরা এ ব্যাপারে বলেছেন এক কথা, আবার আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের নির্দেশনা হলো অন্যরকম। আরেফ বা সুফী সাধকরা হলেন অন্য এক পথের নির্দেশনা দানকারী। তৌরাতে এক ধরনের কথা বলা হয়েছে। ইঞ্জিল আবার বলেছে অন্য ধরনের কথা। অন্যদিকে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর (স:) নির্দেশনা আবার এদের সবার থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র। যদি সূক্ষ্মভাবে ভালো করে লক্ষ্য করি, তাহলেই দেখতে পাবো যে, এ ব্যাপারে রয়েছে হাজারো পথের নির্দেশ, বলা হয়েছে হাজারো ধরনের কথা। আমরা সবাই চাই সত্যিকার সঠিক পথ, খুঁজে বেড়াই মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনের মহাসড়ক, পরম পরিপূর্ণতা লাভের পাথেয়। আমরা চাই এ হাজারো পথের গোলক ধাঁধাঁর মধ্য হতে সঠিক সত্য পথটি বেছে নিতে। এতো সব পথের গলিঘুজিতে আমরা সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়ি। আপনার বক্তব্য অনুসারে যারা ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বা এর শ্রোতা, তাদের সবাই একেকটি ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন : অমুক দার্শনিক বলেন, তুমি তমুক পথটি অনুসরণ করো, এ পথটিই হলো সঠিক এবং অতি উত্তম। আবার আরেক ঐশী প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহাপুরুষ বলেন : আমার নির্দেশিত সত্য পথ ধরেই অগ্রসর হও। অন্যদিকে আরেক পয়গম্বরের কথা হতে আবার আমরা বুঝতে পারি, অবশ্যই আমাদেরকে এসব কিছু হতে স্বতন্ত্র আরেক পথ অনুসরণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো : আমরা কার কথা শুনবো? কোন পথে কার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তা আমাদেরকে পৌঁছে দেবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে, সত্য সঠিক মুক্তির পথে? ভারতীয় অনেক দার্শনিক বলেন জীব হত্যা, তাদের মাংস আহার খুবই খারাপ। অবশ্যই কাঙ্খিত কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা অর্জনের পথে পৌঁছার জন্যে আমাদেরকে জীবহত্যা ও তাদের মাংস আহার হতে বিরত থাকতে হবে। আবার যদি ইউরোপে আসি, তাহলে দেখবো, ইউরোপীয় দার্শনিকরা বলছেন : গো-হত্যা এবং গো-মাংস ভক্ষণ অতি উত্তম। আবার আরেক ধর্ম একে অতি নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত

করে থাকে। ভালো কথা এখন আমরা কার বা কাদের কথা মেনে নেব বা অনুসরণ করবো? এই বিভিন্ন পথ ও পন্থার মধ্য হতে কোনটিকে অনুসরণের জন্যে বেছে নেব? এসব পথ ও পদ্ধতি সঠিক ভাবে বেছে নেয়ার জন্যে মাপকাঠী বা মানদণ্ডই-বা কি?

ডক্টর তাগোর : এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান মাপকাঠী বা মানদন্ডটি হলো : প্রত্যেক মানুষের স্ব স্ব বিবেক-বুদ্ধি, বিচার শক্তি বা আকল। দ্বিতীয়ত: এ পথ ও পদ্ধতি বেছে নেয়ার বিষয়টি মানুষ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছে, কোন ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে, কি পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছে সরাসরি তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : ইরান হলো মুসলমানদের দেশ। আর ভারতে রয়েছে অন্য আরেক ধর্ম। এটা হলো জন্মগত বিষয়। অন্য দিক থেকে দেখতে হবে যে, সে কোন দর্শনে শিক্ষিত ও দীক্ষিত। আমি যখন জন্ম নেই তখন বৌদ্ধ ছিলাম[৫]। আমি পিতার ধর্মমতেরই অনুসারী থেকে যাই। সবাই মূলত: পিতৃ-পুরুষের ধর্ম এবং মতের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং সঠিক পথ বেছে নেয়ার বিষয়টি এ সার্বিক বিষয়টির উপরেই নির্ভরশীল যে — মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কি ও কোন পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতিটি আমার জন্যে তেমন কোনো গুরুত্বের অধিকারী নয়। কেননা আমি একজন কবি। চরম মুক্তি ও শাশ্বত কল্যাণ অর্জনের জন্যে কবির বেছে নেয়া পথ ও পদ্ধতি হলো প্রেম ও ভালবাসা। যার মনে ও কর্মে রয়েছে প্রেম ও ভালবাসা, সেই হলো উত্তম। প্রেম ভালবাসা নিয়ে যে পথেই অগ্রসর হোন্ না কেনো, তাই উত্তম। কবি তার আপন প্রেম ও ভালবাসা দিয়েই জনগণের সেবা করে থাকেন। আর আমিও একজন কবি।

জনাব শরিয়ত: এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা ছিলো আকল-বিবেক-বুদ্ধি, ফিলসফি ও দর্শন সম্পর্কিত। আমরা আকল-বিবেক-বুদ্ধি-বিচার-শক্তিকে কেন্দ্র করেই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। এখন আপনি আলোচনার বিষয়বস্তুকে বিচার-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা এবং যুক্তি প্রমাণের গন্ডী হতে বের করে এনে প্রেম-ভালবাসায় কেন্দ্রীভূত করেছেন। নি:সন্দেহে প্রেম-ভালবাসাও সত্য ও কল্যাণকে চেনা-জানা-অর্জনের একটি পথ এবং পদ্ধতি হতে পারে। কিন্তু তা অত্যন্ত ভাবাবেগ নির্ভর। কাজেই এ দিক থেকে মনে হয় যুক্তি-প্রমাণ-দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হলেই ভালো হয়।

ডক্টর তাগোর : দু:খের বিষয়, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এছাড়াও বেলা দশটার সময় আরো কয়েকজনকে দেখা - সাক্ষাতের সময় দিয়েছি। তাই আপনাদের কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে আপাতত বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি[৬]।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে) আলোচনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। জনাব ডক্টর তাগোর অসীম অনুগ্রহের সাথে দর্শন দিয়ে আমাদের সবাইকে চরম কৃতার্থ ও পরম কৃতজ্ঞ করলেন। এরপর তিনি সবার কাছ হতে বিদায় চেয়ে এবং নিজের স্বভাব ও প্রথাসিদ্ধ উপায়ে সবার সাথে হাত মিলিয়ে কামরা হতে বেরিয়ে গেলেন। আমরা খুবই দু:খিত এবং অতৃপ্ত অন্তর নিয়ে ভাবছিলাম, আলোচনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সুর ও রেশ কেটে গেল। এক মধুর এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে আলোচনা শেষ করতে বাধ্য হলাম।

উল্লেখ্য এ সাক্ষাৎকারের লিপিকার বা প্রতিবেদক ছিলেন : হোসেইন কুলী মাস্তান।

টীকা-টিপ্পনী

১) খ্রিষ্টীয় সালানুসারে এ তারিখটি হবে : রোববার, ৮ই মে ১৯৩২ ইং।

২) দ্রষ্টব্য : পারস্যে রবীন্দ্র চর্চা : আনিসুর রহমান স্বপন, বুকভিউ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ৭-৯।

৩) এ সম্পর্কে কবিগুরু বলেছেন : 'শিরাজের নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই : শিরাজ শহর দুটি চিরজীবি মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমন্ডল তোমার (রবীন্দ্রনাথের) চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসাধারাতেই এখানকার দুই কবি জীবনের পুষ্প কানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার এ পবিত্র ভূখন্ড তলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশের উর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনো কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।....'

১৭ই এপ্রিল (১৯৩২) আজ অপরাহ্নে সাদির সমাধি প্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। ... চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধি স্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের পোষাক য়ুরোপীয়, কচ্চিৎ দেখা গেল পাগড়ী ও লম্বা কাপড়।...

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাৎ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভায় গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতিসুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েছে, মেঝের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তর, সূর্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ওপারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে — অধিকাংশই কালো কাপড়ে আবৃত স্ত্রী লোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।...

কবি হাফেজের সমাধি পরিদর্শন প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের বিবরণ হলো : 'অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরুলুম, পিতার তীর্থ স্থানে আমার মানস অর্ঘ নিবেদন করতে। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে পুরানো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই করা জালির কাজের একটা মন্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায়না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিশ-রাজত্বের-অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধি রক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চক্ষু বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরুবে তা থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করছিলুম সেইটেই মনে জাগছিলো। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরুল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরাণী ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দীষ্ট হয়।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নি:সৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ : স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে, তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্ত প্রভাতের সূর্যের আলোতে দুরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দু'জনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজাল আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত শত বৎসর পরে জীবন মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে (ফিরে) এলুম।... ('পারস্যে', রবীন্দ্র রচনাবলী ২২শ খন্ড, পৃ:-৪৫৮-৬১,৫১৩।)

কবি হাফেজ সম্পর্কে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "একদিন দুর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌঁছেছিলো। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাব রসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের।

আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলো।

আজ পারস্যের রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, সেইসঙ্গে সেই কবিদের আমন্ত্রণও মিলিত। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই, যাঁদের কাব্যসুধা জীবনান্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েছে।... ('বিচিত্রা') আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ: ২৯৭-৯৮।

"পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি) আশাপ্রকাশ করলেন আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে। আমি বললুম আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা, আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবেনা। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।"... ("পারস্যে", প্রাগুক্ত, পৃ:-৪৬০)

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফেজের সমগ্র দিওয়ান মুখস্ত করেছিলেন

এবং অর্থসহ এর যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। তাই তাকে বলা হতো 'হাফেজে হাফিজ'(দ্র: 'বাইয়াজ', পার্সীয়ান রিসার্চ জার্নাল, আঞ্জুমানে ফার্সী, দিল্লী, ভারত, ১০ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, ১৯৯০, পৃ:-৮)

৪) সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ফার্সীতে অনুবাদকারীরা 'ব্রাহ্ম' ধর্মকে ভুল করে 'বৌদ্ধ'ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মমত সমসাময়িক পারস্যে তেমন একটা পরিচিত না হওয়ার কারণে এ ভুল আর সংশোধিত হয়নি।

৫) এ সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ''কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্য নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'আলো পাব কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে — কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে। সেই-সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয়না, যাদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হলো পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচার বিচারের কড়াকড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বুকভিউ।

খাদক

হুমায়ূন আহমেদ

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটিকে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহংকারও আছে। কিসের অহংকার কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বললেন — এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, খাদক মানে?

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না - আমাদের গ্রামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আছে। নাম করা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কি সব যেন বলেছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

ও আচ্ছা।

আমি ভালো করে খাদকের দিকে তাকালাম।

রোগা বেঁটে খাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাকা; পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবী গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না, ইস্ত্রি করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রবারের জুতো।

জুতো জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেওয়া হয়। যেমন আজ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, এসব কি করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধূলা। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এ-জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আরে আসুন বসুন। অনুমতি আবার কিসের।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা

দেখার মত ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দু'দিন ধরে আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চের দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দকার সাহেব আমার অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা নেই। আদর যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙ্গা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক যাদুকর কামরূপ থেকে এসে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখানে কেউ খায়নি, কারণ গাছটার ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মত গাছ — দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নীচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধমণ গোশত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই প্রফেসর সাহেবকে মেডেল দেখা।

মতি মিয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সি.ও. রেভেন্যু, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেডমাস্টার। অন্যটিতে নাম ধাম কিছু নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল — একজন লোক পরিমাণে বেশি খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিকে হায়ার করে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সাথে করে নিয়ে যায়। মতির সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই দেখতে চায়।

কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম — ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা। দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা-নেয়ার খরচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।

কর না কেন?

এক সাথে দুই তিনটা কাম করলে কোনটাই ভাল হয় না। আল্লাহতালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা অন্য কোন বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহতালার প্রদত্ত বিদ্যার অহংকারে মতি মিয়ার চোখ চিক চিক করতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না-কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের দশজনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রাম দেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসার সাব।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রান্না করা গোশত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে, মতি, পারবি তো?

মতি হাসি মুখে বলল, আপনাদের দশ জনের দোয়া।

খাওয়ার পরে দুই সের চমচমও খাবি। বিদেশী মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।

আলহামদুলিহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব, এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্রহ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সাথে আমাকেও বসে থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হত।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হল। খোন্দকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারী হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতি খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এ রকম ওস্তাদ বেশি না থাকাই ভাল। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না, খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই গরু জবাই দিলাম তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপরে ভাই।

রান্নার আয়োজন চলেছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাওয়ার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে। খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে বলল — গোশত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

তাই নাকি?

জি। আর চাবাইতে হয় খুব ভাল কইরা। গোশত যখন মুখের মধ্যে তুলার মত হয় তখন গিলতে হয়।

কায়দা কানুনতো অনেক আছে দেখি।

বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোত্থেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানান ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্য বিষয়ক। দু'বছর আগে কোন এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তার সামনে আধমণ জিলেপী খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপীর ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

জি খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। দুইশ টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। পেসিডেন সাবরে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?

খুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশি হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন।

মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কি খাদক নাকি?

জি না। তারা না-খাওস্তির দল। খাইতে পায় না। কাজ কামতো কিছুই করি না, খাওয়ামু কি? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন খাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যে আরাম আছে।

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল রাত দশটার দিকে। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙ্গে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলিকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলি ক্ষুধার্ত। হয়তো রাতেও কোন কিছু খায় নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন।

স্কুলের হেডমাষ্টার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ওসি সাহেব, পোষ্টমাষ্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসি জবেহ্ হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনার প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এর আগের বার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত বারোটার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনের চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। চোক দু'টি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হব মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, কেমন দেখছেন?

ভালই বলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাইতো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরি হবে। সকাল দশটার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্লো হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

জি। শেষের দিকে এক টুকরো গোশত গিলতে দশ মিনিট সময় নেয়।

আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, কি মতি খারাপ লাগছে?

জি না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, অসম্ভব—একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব! রাত একটার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে — বাকি গোশত আমি খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয় — মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরোটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে — কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে — হারলে হারব।

আমি জানি বাস্তবে তা হবে না। সকাল দশটা হোক, এগারটা হোক মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোন দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নিরন্নের কাল

ইমদাদুল হক মিলন

পাকা ধানের রঙ কেমুন অয় বুবু?

সোনার লাহান, গেন্দাফুলের পাপড়ির লাহান।

ঘেরান অয় না?

অয় না আবার। সাই ঘেরাই অয়। কাত্তি আগন মাসে ধান পাকলে ঘেরানে দেশ গেরাম ভইরা যায়। রম রম করে। ধানের ঘেরানে দেশ গেরামের মানুষ যায় জোয়াইরা মাছের লাহান পাগল অইয়া।

পাগল অইয়া কি করে?

দিন রাইত ধানখেতে পইড়া থাকে। গান গায় আর ধান কাডে। গান গায় আর ধানের বোজা আইন্না বাড়ির উডানে হালায়। ছোড গিরস্তরা হারাদিন ধান কাইট্টা হাইঞ্জাবেলায় বোজা বাইন্দা বাড়িতে আনে। তারবাদে বিয়াইন্না রাইতে উইট্টা হেই ধান পাড়ায়। দুই আতে দুই খান চিকন বাঁশের লাডি লইয়া, পায়ের নিচে ছোড ছোড ধানের আডি, নাইচ্চা-নাইচ্চা ধান পাড়ায়। বেইল উটতে না উটতে ধান পাড়ান শেষ। আগইল ভইরা, ছালা ভইরা হেই ধান ঘরে রাইখা আবার যায় ধানখেতে। আগের দিনে ছোড গিরস্তগ খেতের ধানও একদিনে কাডা অইতো না।

আর বড়ো গিরস্তগ?

হেগ কতা আর কইস না। পুরা মাস লাইগ্যা যাইতো হেগ ধান কাডা শেষ অইতে। শয়ে শয়ে মাইনষে কাইট্টাও মাসের আগে শেষ করতে পারতো না। আর বড়ো গিরস্ত বাড়ির ধান তো মাইনষে পাড়াইয়া কুলাইতে পারতো না। গরু দিয়া মলন দেওন লাগতো।

তারবাদে?

তারবাদে হেই ধান ডোলে ভইরা গিরস্তরা হইয়া বইয়া দিন কাডাইতো। গান গাইতো আমোদ ফুর্তি করতো আর তামুক টানতো।

আমল ধানখেত আছিলো না বুবু? আমগ কুনোদিন ধান অইতো না?

অইতো না আবার কতো ধান যে অইতো। দীনুরে তুই কিচ্ছু দেকলি না। পোড়া কপাল লইয়া পয়দা অইছচ। তর জন্মের আগে, আমি তহন তর লাহান না, তর থিকা আরো ছোড অমু, কাউন্না বিলে ম্যালা ধানের জমিন আছিলো বাজানের। হেই জমিন আমি কুনোদিন চোক্কে দেহি নাই। বাজানের মুকে হুনছি। বাজানের তখন দেকতাম বিয়াইন্না রাইতে ঘুম থিকা ওডে। উইট্টা এক বাসন পান্তা লইয়া বইতো। হেয় পান্তা খাইতো আর মায় নাইরকলের উক্কায় তামুক সাজতো। পান্তা খাইয়া ঐ এক ছিলিম তামুক খাইতো বাজানে। হেরবাদে মাজায় লাল গামছাখান বাইন্দা ঘর থনে বাইর অইতো। যাইতো বিলে। কাউন্না বিলে। যাওনের সুময় মায় কইতো, বেইল থাকতে আইয়া পইড়ো বুলবুলির বাপ। দেরি কইরো না। বাজানে কইলাম আইতো না। দোফরে সোনাদিগা চাউলের ভাত রাইন্দা, কাজলি মাছের ঝোল রাইন্দা মায় বইয়া থাকতো। বাজানে হেই ভাত খাইতো রাইত দোফরে আইয়া। কাজলি মাছ কেমুন বুবু?

হায়রে পোড়া কপাল। কাজলি মাছ তুই দেহচ নাই দীনু?

না বুবু।

কাজলি মাছ দেখতে পাবদা মাছের লাহান। তয় পাবদা মাছের লাহান বড়ো না। চেপ্টা না। আরো ছোড আরো চিকন। ফকফইক্কা শাদা। খাইতে বহুত স্বাদ। একখান মাছ দিয়া দুই বাসন ভাত খাইতে পারবি তুই।

এই কথা বলে বুলবুলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলির চোখের ওপর ভেসে উঠলো বাসন ভর্তি শাদা মুক্তোদানার মতো ফুরফুরে ভাত। বাটি ভর্তি কাজলি মাছের ঝোল। রান্না ঘরে বসে বুলবুলি আর দীনু গাপুসগুপুস করে ভাত খাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বুকের ভেতর কেমন হাহাকার করে উঠলো বুলবুলির। কতোকাল অমন বাসন ভর্তি ভাত দেখে না তারা। পেটপুরে ভাত খায় না! পেটপুরে ভাত খাওয়ার যে কি স্বাদ দীনু তা কোনোদিন জানলোই না! জন্মে তো ধানের খেতই দেখলো না। পাকা ধানের রঙ কেমন হয় জানলোই না। অথচ দীনুর সাত আট বছর আগে জন্মে কতো কি দেখেছে বুলবুলি। সুখের দিন ছিলো তখন। বছরভর গোলা ভরা ধান থাকতো বুলবুলিদের। ঘরের কোণে বিশাল মটকা ভরা থাকতো মণকে মণ সরু লালচে চাল। গোয়ালে ছিলো দুধের গাই। ভোরবেলা দুধ দোয়ালে কাঁচা দুধের মিঠেল গন্ধে ভরে যেতো বাড়ি। কি ঘন, কি স্বাদের দুধ। বাড়ির সঙ্গে ছোট্ট পুকুরটি ভরা থাকতো মাছে। কই সিং শোল গজার মাগুর ফলি রয়না, কতো পদের মাছ যে ছিলো পুকুরে। এক দুবার ঝাঁকি জাল ফেললেই দুবেলার মাছের বন্দোবস্ত হয়ে যেতো। তখন কার্তিক অঘ্রাণ মাসে খুব শীত পড়তো। একদিকে শীত আরেক দিকে পাকা ধানের ম ম করা গন্ধ। ভোরবেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রোদের আঁচ গিয়ে বসলে কি যে আরাম হতো! কি যে সুখের দিন মনে হতো একেকটি দিনকে!

সেই সুখের দিন কি আর কখনো ফিরে আসবে!

দীনু বললো, বুবু খিদা লাগছে।

বুলবুলি একবার ভাইটির মুখের দিকে তাকালো। রোদে পোড়া ম্লান মুখে হাসলো। খিদা লাগলে খিদার কথা মনে করতে অয়না মিয়াভাই।

বুবুর কথা শুনে দীনু খুবই অবাক হলো। অনাহারী শীর্ণ চোখ তুলে বুলবুলির দিকে তাকালো। করুণ দুঃখি গলায় বললো, তয় কি করতে অয়?

বুলবুলির বুকের ভেতরটা আবার হু হু করে। তার পেটেও তো খিদে। কেঁচোর দলার ওপর তীব্র রোদ পড়লে কেঁচোরা যেমন আকুলিবিকুলি করে, বুলবুলির পেটের ভেতর নাড়িভুড়ি তেমন করছে। তীব্র রোদের মতো রাক্ষুসে এক খিদে ঢুকে আছে পেটের ভেতর। এই খিদে তাড়াবার উপায় বুলবুলির নেই।

দীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুলবুলি বললো, খিদা লাগলে খালি অন্য কতা মনে করতে অয়। শুনে দীনু আর বুলবুলির মুখের দিকে তাকায় না। কথাও বলে না। ক্লান্ত পা ফেলে দুঃখি ভঙ্গিতে হাঁটে।

মাঠময় এখন মেহেদি রঙের রোদ পড়ে আছে। শসাহীন খা খা বিষণ্ন মাঠ। তীব্র খরায় শস্যচারা ঘাস আগাছা পুড়ে বিবর্ণ হলুদ হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও নিশ্চিহ্ন। ঠনঠনে

সাদা মাটি উজবুকের মতো পড়ে আছে। পাকা ধানের রঙ এবারও চোখে দেখবে না দেশ গেরামের। বুলবুলি বললো, ল কামার বাড়ি যাই দীনু।
দীনু আনমনে বললো ক্যা?
কামার বাড়ি কচুর লতি তুইল্লা আনি।
পাওয়া যাইবো?
যাইতে পারে।
মাইনষে তুইল্লা লইয়া যায় নাই!
বেবাক কি আর নিছে।
তারপর একটু থেমে বুলবুলি বললো, বিচড়াইলে মনে অয় পাওয়া যাইবো। ল।
দীনু ক্লান্ত এবং বিরক্তির গলায় বললো, আমার হাঁটতে ভাল্লাগে না। ভাইটিকে বুলবুলি তারপর বেশ একটা লোভ দেখালো। কামার বাড়ি গয়া গাছ আছে দীনু।
ম্যালা গয়া গাছ আছে। ল যাই। গয়া পাইলে দেখবি খাইতে কি আরাম! বুলবুলির কথা শুনে দীনুর চোখ চকচক করে ওঠে। হাছা? হ।
তয় লও বুবু। তাড়াতাড়ি লও।
অল্প বয়সী অনাহারী মানুষ দুটো তারপর মাঠ ভেঙে হাঁটতে থাকে দীনু বললো, বুবু মায় আইবো কুনসুম?
বুলবুলি একবার আকাশের দিকে তাকালো। ভিক্কা কিছু পাইলেই আইয়া পড়বো। বাজানে? বাজানে তো টাউনে গেছে। টাউনে কাম কাইজ করবো তারবাদে চাউলের বস্তা কান্দে লইয়া ফিরা আইবো।
চালের কথা শুনে কি যে খুশি হয় দীনু। চোখ দুটো আবার চকচক করে তার। হাছা?
বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে বুলবুলির। ময়লা নোংরা ছেঁড়া আঁচলে ঘষে ঘষে মুখ মোছে সে। আকাশের দিকে তাকায়। রোদও উঠেছে। বেজায় রোদ। মাঠের আকাশ ঝিমঝিম করছে রোদে। মাথার ঘিলু পর্যন্ত টলমল করে। এই রোদে মা বেরিয়েছে ভিখ মাগতে। এ গাঁ ও গাঁ ঘুরছে দুমুঠো চালের আশায়। এক মালশা ফেনের আশায়। বাপটা ঘুরছে শহরের রাস্তায় রাস্তায়। কাজ খুঁজছে।
মা বাবার কথা ভেবে কি রকম এক কষ্ট যে হয় বুলবুলির! পেটের খিদে মুহূর্তের জন্যে ভুলে থাকে সে।
দীনু বললো, একখান কিচ্ছা কও বুবু?
বুলবুলি চমকে ওঠে। কি কমু?
কিচ্ছা। কিচ্ছা কইতে কইতে হাটলে পথ তাড়াতাড়ি ফুরাইবো। কোন ফাঁকে কামার বাড়ি যামু গা উদিস পামু না।
কিয়ের কিচ্ছা কমু?
ধানের কিচ্ছা কও বুবু। মাছের কিচ্ছা কও।
দীনুর কথা শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলবুলি। চোখ তুলে আরেকবার তাকায় আকাশের দিকে। সূর্যখানা নাড়ার পালার মতো জ্বলছে। কি তেজ! শীতকালের মাঠে, তুলে নেয়া ফসলের

মাঠে খড়নাড়া স্তূপ করে সন্ধেবেলা আগুন ধরিয়ে দিতো কৃষাণরা। রাতভর জ্বলতো সেই আগুন। রাতেরবেলা সেই আগুনের তাপে উষ্ণ হয়ে থাকতো দেশ গেরাম। অঘ্রাণ মাসের বাঘা শীত টের পেতো না লোকে। সূর্যের তেজখানা এখন মনে হচ্ছে তীব্র শীতের রাতে মাঠময় জ্বলা খড়নাড়া। রোদের তাপখানা খড়নাড়ার উত্তাপের মতন।
ঘামে ঘাড় গলা চুটপুট করছে বুলবুলির। আঁচলে ঘষে ঘষে আবার ঘাড় গলা মোছে সে। দীনুর মুখটাও মুছিয়ে দেয়। বড়ো মায়ায়, বড়ো ভালোবাসায়।
শাড়িখানা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে বুলবুলির। বাড়ন্ত শরীর এই শাড়িতে ঢাকা পড়ে না। তবু যত্ন করে শরীরখানা ঢেকে রাখে বুলবুলি। পুরুষমানুষ দেখলে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। মা শিখিয়েছে পুরুষজাত লোভীজাত। মেয়েমানুষের শরীর দেখলে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল।
সামনে বিশাল একখানা মাঠ। শস্য নেই, ঘাস আগাছা নেই। মাঠের সাদা কঠিন মাটি চকচক করে। দুপুরবেলা দূর কোন প্রান্ত থেকে উড়ে আসে হু হু করা এক হাওয়া। রোদ সয়ে আসে বলে হাওয়ায় নেই শীতলতা। গা তো জুড়োই না, উল্টে গরম। মাঠময় ঘুরে ঘুরে বয়ে যায় হাওয়াটি। ধুলোর চিকন একটি রেখা ওড়াউড়ি করে। দেখে কেমন আনমনা হয়ে যায় বুলবুলি।
মাঠের ওপারে গাছপালায় অন্ধকার হয়ে থাকা কামার বাড়ি। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ভাঙা দরদালান চোখে পড়ে। কামাররা এখন কেউ নেই। পুরনো পেশায় পেটের ভাত জোটে না দেখে গ্রাম ছেড়ে যার যেদিকে সুবিধে চলে গেছে। বাড়িটা ছাড়া পড়ে আছে ম্যালা দিন। গাছপালা এবং আগাছায় জঙ্গল হয়ে আছে। জঙ্গলে কচুর লতি, মুখি এসব পাওয়া যায়। দেশ গেরামের মানুষ সব লুটে নেয়। বুলবুলিও অনেকবার নিয়েছে। এখন আর পাওয়া যায়না। দেশে অনাহার। কচুর লতি, মুখি এসব তো দূরের কথা, মাঠের পাশে অবহেলায় জন্মে থাকা সেচি শাকটা পর্যন্ত পাওয়া যায় না, অনাহারী মানুষ সব তুলে নিচ্ছে।
বুলবুলি জানে কামার বাড়ির ঝোপ জঙ্গল তন্ন তন্ন করেও কিছু পাওয়া যাবে না। তবু যাচ্ছে। দীনুর জন্যে যাচ্ছে।
দীনুটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সকালবেলা মা ভিক্ষেয় বেরুতেই দীনু বললো, লও বুবু আমরাও যাই।
বুলবুলি ভিখ মাগতে যেতে পারে না। মার বারণ। বুলবুলির যে বয়স যে শরীর, ভিখ মাগতে গেলে বিপদে পড়বে। লোকে দুচার মুঠো চাল কিংবা আধলিটা সিকিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে দরোজা আটকাবে। পুরুষজাত লোভীজাত।
মার মুখে পুরুষমানুষের এই স্বভাবের কথা শুনে বুলবুলি খুব ভয় পেয়েছে। বুকের ভেতরটা কেঁপেছে তার। না খেয়ে মরে গেলেও ভিখ মাগতে যাবে না বুলবুলি।
কিন্তু দীনু এসব বোঝে না। তার এসব বোঝার কথা নয়। এই বয়সী বালক মেয়েমানুষের শরীরের জন্যে পুরুষমানুষের লোভের কি বুঝবে!
সকালবেলা দীনু বলেছে, লও বুবু আমরাও যাই।
শুনে ম্লান মুখে হেসেছে বুলবুলি। কই?
খরাত করতে।
মাইনষে পোলাপানগ খরাত দেয় না।

ক্যা?
কি জানি।
শুনে চুপ করে গেছে দীনু। মুখে ভারি দুঃখের একটা ছায়া পড়েছে তার।
তারপরই দীনুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বুলবুলি। বেরিয়ে গ্রামের এদিক-ওদিক হেঁটে সময় কাটিয়েছে। তারপর দুপুরের মুখে মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মাঠের কিনারায়।
দীনু বললো, কও না বুবু।
বুলবুলি চমকে উঠলো। কি কমু?
ধানের কিচ্ছা কও। ভাতের কিচ্ছা কও।
দুঃখি বিষণ্ন চোখে একবার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায় বুলবুলি। ম্লান হাসে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আমাগো কাউন্না বিলের জমিনের ধান পাকতো আগন মাসে। বাজানের মুখে হুনছি আগন মাসের বিলের কিনারে গিয়া খাড়াইলে দেহা যাইতো চাইরদিকে খালি পাকা ধান, পাকা ধান। সোনার লাহান বরণ সেই ধানের। গেন্দাফুলের পাপড়ির লাহান বরণ। বিয়ানবেলা বিলে যহন রইদ পড়তো সেই রইদে বিলের পাকা ধান সোনার লাহান ঝকমক ঝকমক করতো। বাতাস অইলে গাঙ্গের ঢেউয়ের লাহান দোল যাইতো। বাজানে কইতো বিলের কিনারে খাড়াইলে বুকটা তার ভইরা যায়। ফূর্তিতে আমুদে ভইরা যায়।
দীনু অবাক গলায় বললো, তারবাদে?
হেই পাকা ধান মুখে কইরা কাইটা নিতো টিয়ায়, বাউইয়ে। মাইট্টা ইন্দুরেও গদে ভইরা রাখতো বচ্ছরের ধান। ধান কাডা অইয়া গেলে ইন্দুরের গদের ধান উডাইয়া আনতো গরীব মাইনষে। ইন্দুরের গদের ধান তাগো দুই-তিন মাসের খাওন অইয়া যাইতো।
বুলবুলি একটু থামলো। খিদেটা পেটের ভেতর এমন হয়েছে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কি রকম এক ক্লান্তি, অবসাদ। কিন্তু দীনু আছে সঙ্গে। কথা তো বলতেই হবে। কথা বলে খিদে ভুলিয়ে রাখতে হবে দীনুর।
বুলবুলি বললো, বুজলি দীনু, মাইট্টা ইন্দুরের গদে আবার সাপ গিয়া থাকতো। জাইত সাপ, দাড়াইস সাপ। ধানের লেইগা গদে হাত দিলে সাপে কাটতো। হাজামবাড়র মজিদরে তো সাপেই কাটছিলো। দীনু বললো, কেমনে। কেমনে সাপে কাটলো।
গেছিলো ইন্দুরের গদ থিকা ধান উডাইতে। একছালা উডাইছে এমুন সুময় উদিস পাইলো হাতের বুইড়া আঙ্গুলে খাজুর কাডার লাহান কি একটা জানি বিনদা গেলো। কি বিষ! গদ থিকা হাত আর উডাইতে পারে নাই মজিদ। ইন্দুরের গদের মদ্যে হাতখান রইলো, মজিদ গেলো মইরা।
সাপের গল্প ভালো লাগলো না দীনুর। সে বললো অন্য কথা। আমাগ ডোল আছিলো বুবু?
বুলবুলি বললো, কচ কি! আছিলো না।
কয়ডা?
চাইর পাঁচটা আছিলো?
মলনের গরু আছিলো?
না হেইডা আছিলো না। বাজানে চউরা কামলা লইয়া ধান কাইট্টা আনতো। আইয়া উডানে

হালাইতো। বিয়াইন্না রাইতে কামলারা গান গাইতো আর ধান পাড়াইতো। ছোড গিরস্তগ ধান পাড়াইয়াই লয়।
কামলারা কি গান গাইতো?
ওই যে হেই গানডা। সোনার ধান কাইট্টা আনো, গোলায় তোলো। গান হোনলে আমার আর ঘুম আইতো না। জাইগা থাকতাম। একখান পিড়ি লইয়া দরজার সামনে বইয়া থাকতাম। চউরা কামলাগ ধান পাড়ান দেখতাম। গান হোনতাম।
চউরা কাগ কয় বুবু।
আগন মাসে পদ্মার চর থিকা শয়ে শয়ে মানুষ আইতো দেশ গেরামে। হেগ কয় চউরা। আইতো ধান কাটতে। যা ধান কাটতো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাইতো হেরা। ধান কাটা শেষ অইলে হেই ধান বস্তায় ভইরা চউরারা চইলা যাইতো। চউরারা বড়ো আমুদে মানুষ ভারি সোন্দর গান করতো।
কোন ধানের চাউল ভালা বুবু?
সোনাদিগা ধান।
ভাতের স্বাদ কেমুন?
হেই কথা আর কইচ না ভাই!
তারপর একটু থেমে বুলবুলি বললো, কাচা নাইরকল খাইছচ?
দীনু বললো, না।
খাচ নাই! না খাইলে বুজবি কেমনে!
তুমি কও।
কাচা নাইরকলের যেমুন স্বাদ অয় হেমুন স্বাদ অয় সোনাদিগার ভাতে। তরকারি ছাড়া ঐ দুই-তিন বাসন ভাত খাইয়া হালান যায়। শুনে পেটের ভেতর কেমন করে দীনুর। খিদেটা মনে হয় সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে। গলাটা শুকিয়ে মাঠের বাঁজা মাটি হয়ে গেছে।
দীনু একটা ঢোক গিললো। এইবার মাছের কিচ্ছা কও বুবু। দুধের কিচ্ছা কও।
কথা বলতে আর ভালো লাগছে না বুলবুলির। খিদেয় শরীর কেমন অবশ হয়ে আসছে। হাঁটতে ভাল্লাগে না, কথা বলতে ভাল্লাগে না। দীনুর ওপর কি রকম একটা বিরক্ত লাগছে। চারদিকের আলো হাওয়া মাটি কোনো কিছুই বাস্তব মনে হচ্ছে না। অতিরিক্ত খিদেয় নেশার মতো কি রকম একটা ঘোর তৈরী হয়েছে চোখে। তিনদিন কিছুই প্রায় খাওয়া হয়নি। পরশু দুপুরে ভিখ মেগে একমুঠ চাল পেয়েছিলো মা। সেই চালে জাউ রেঁধে খেয়েছে তিনজন মানুষ। তাতে পেটের এক কোণাও ভরেনি। তারপর থেকে টানা উপোস। শরীর থর থর করে কাঁপে বুলবুলির। পা চলতে চায় না।
কিন্তু এসব দীনুকে বুঝতে দেয়া যাবে না। সেইও তো বুলবুলির মতোই। অতোটুকু ছেলে না খেয়ে কেমন করে যে এখনো বেঁচে আছে। দীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা জ্বলে যায় বুলবুলির। মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে দীনুর মুখ। হাঁটছে, যেনো প্রচন্ড মার খাওয়া এক কুকুরছানা।
দীনুকে দেখে ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুছিয়ে নেয় বুলবুলি। ভাইটিকে তার মাছের গল্প

বলে। দুধের গল্প বলে। এক দুর্দান্ত সুখের দিন এসে দাঁড়ায় বুলবুলির চোখের সামনে। বাইষ্যাকালে তো দেশ গেরাম পানিতে ডুইবা যায়। খাল দিয়া পদ্মার গাঙ থিকা ঘোলা পানি আইয়া তো দেশ গেরাম ভাসাইয়া দেয়। পানি থাকে তিনমাস। হেই তিনমাস মাছের আকাল অইতো না। কতো পদের যে মাছ। বাড়ির ঘাডা থিকা জালি দিয়া ম্যালা মাছ ধরতো বাজানে। পাবদা টেংরা চটা চটা পুডি রয়না নলা টাকি বাইল্লা, খাও কতো মাছ খাইবা। কাতিমাসে পানিতে টান ধরতো। তখন দুনিয়া ভইরা যাইতো মাছে। বশি হালাইলেই মাছ। জাল হালাইলেই মাছ। ফলি কাউন্না মাগুর আইড় বোয়াল। বাজানে এক বিয়াইল মাছ ধরলে হেই মাছ আমরা তিন-চাইর দিনে খাইয়া ছাড়াইতে পারতাম না। আর জিওল মাছ তো আছিলোই! জিওল মাছ কারে কয় জানসনি দীনু?

দীনু মাথা নাড়লো। না।

যেই হগল মাছ ঘোপায় পানি ভইরা রাখন যায় হেই মাছরে কয় জিওল মাছ। কই সিং মাগুর।

বুজছি।

জিওল মাছ পাওয়া যাইতো শীতের দিনে। কচুরীর মইদ্যে, পানির মইদ্যে যেই হগল জাগায় জঙ্গল অয় হেই হগল জাগায় পাওয়া যায় জিওল মাছ। বাজানে ডুবাইয়া ডুবাইয়া ধরতো। শীতের দিনে আমরা খালি জিওল মাছ খাইতাম। কি স্বাদ যে আছিলো হেই মাছে!

এতোক্ষণে মাঠটা শেষ হয়। কামার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় বুলবুলি আর দীনু। ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে সাপের মতো বাঁকা একটা পথ চলে গেছে বাড়ির ভেতর! ওরা দুজনে সেই পথে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়।

কিন্তু পুরো বাড়িটা দুতিনবার চষেও কিছুই পায় না ওরা। না দুএকটা কচুর লতি, না এক আধখান মুখি। দীনু পাগলের মতো পেয়ারা গাছগুলো দেখে। এক আধটা কড়া পেয়ারাও নেই।

দীনু হতাশ গলায় বললো, কই লইয়াইলা বুবু। কিচ্ছু নাই তো।

বুলবুলি বললো, কি করুম ক। মাইনষে বেবাক কিছু খাইয়া হালাইছে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছন দিকটায় চলে আসে ওরা। বাজারের দিককার বড়ো সড়কটা চলে গেছে কামার বাড়ির পেছন দিয়ে। সেখানে বাড়ির মুখে একটা দেবদারু গাছ। বহুকালের পুরনো গাছ। মাথায় ঘন ডালপালা বলে দিনমান তলায় পড়ে থাকে মিঠেল একখানা ছায়া। ক্লান্ত বাজারীরা কখনো কখনো জিরাতে বসে দেবদারুতলায়। মাঠ ছাড়া দুএকটা গরু ছাগল এসে অলস ভঙ্গিতে বসে জাবর কাটে। দেবদারুর ডালে বসে থাকে কাক, শালিক।

দীনুকে নিয়ে দেবদারুতলায় চলে এলো বুলবুলি। পা আর চলতে চাইছে না। একটু জিরাবে। কিন্তু দেবদারুতলায় একটি লোক বসে আছে। বসে আরামসে বিড়ি ফুঁকছে। গায়ে নীল একখানা পিরান তার। সেই পিরানের ওপর গলার কাছে বাঁধা লাল টকটকে রুমাল।

বুলবুলি এবং দীনুর পায়ের শব্দে চমকে মুখ ফেরালো লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলি দেখতে পেলো মুখভর্তি কুৎসিৎ বসন্তের দাগ তার। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা। মাথার কদমছাটি চুল আর মুখ দেখে বোঝা যায় বহুঘাটের জল খাওয়া লোক সে।

বুলবুলিকে দেখেই হা করে, কি রকম চোখে যেনো তাকালো লোকটি। তাকিয়ে রইলো। চোখে পলক পড়ে না। দেখে শরীরের খুব ভেতরে অদ্ভুত এক কাঁপন লাগলো বুলবুলির। দরকার নেই তবু বুকে আঁচল টানলো সে। কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেলো।

লোকটির পায়ের কাছে খুবই অবহেলায় পড়ে আছে মুখ বাঁধা বিশাল ভারি একটি বস্তা। সেই বস্তা দেখে চোখ দুটো চকচক করে উঠলো বুলবুলির। লোকটির চোখে দেখে শরীরের খুব ভেতরে যে কাঁপনটা লেগেছিলো মুহূর্তে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেলো সেই কাঁপন। বস্তার ভেতরে কি আছে!

চাল!

বুলবুলির মতো দীনুও তাকিয়ে ছিলো বস্তাটির দিকে। দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসলো লোকটি। বললো, বস্তা ভরা চাউল, বোজলা। শিমইল্লা বাজার লুট অইলো তো, এক বস্তা মাথায় লইয়া আইয়া পড়লাম।

শুনে অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকায় বুলবুলি। ভাবে, চাইবো নাকি দুমুঠো চাল। এতো বড়ো বস্তার এক বস্তা চাল। চাইলে কি দুমুঠো দেবে না লোকটি!

বুলবুলির মুখ দেখে লোকটি কি বুঝলো কে জানে, বুলবলির সঙ্গে কোনো কথা বললো না সে। হাত ইশারায় দীনুকে ডাকলো আসো, আমার কাছে আসো খোকা।

দীনু একবার বুলবুলির দিকে তাকালো। তারপর পায়ে পায়ে লোকটির সামনে দাঁড়ালো।

কি কন?

তোমার নাম কি?

দীনু।

বইনের নাম?

বুলবুলি।

লোকটি বুলবুলির দিকে তাকালো। হাসলো। বাহবা, বুলবুলি। বুলবুলি পাখি। ভারি সোন্দর নাম।

সেই ফাঁকে বুলবুলি দেখতে পেলো লোকটির দাঁত পোকায় খাওয়া। নোংরা। হাসলে কুৎসিত দেখায়।

লোকটি তখন পিরানের পকেট থেকে চকচকে একটা সিকি বের করেছে। করে দীনুর চোখের সামনে তুলে ধরেছে। এইডা নিবা দীনু। নেও। নিয়া সোজা বাজারে যাও বিস্কুট খাইয়া আসো। চোখের সামনে চার আনা পয়সা দেখে দীনু একদম পাগল হয়ে যায়। চার আনায় অনেকগুলো বিস্কুট পাওয়া যাবে। খেয়ে বাজারের চাপকল থেকে পানি খেলে পেট এমন ভরা ভরবে, চারদিন আর খিদে লাগবে না।

ছোঁ মেরে পয়সাটা নিল দীনু। তারপর বাজারের দিকে এমন একটা দৌড় দিলো, বুলবুলি কিছু বলার আগেই বহুদূর চলে গেলো।

দীনু চলে যেতেই বিড়িটা ছুড়ে ফেললো লোকটি। তারপর বুলবুলির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

বুলবুলি পাখি, চাইল নিবানি?

শুনে বুলবুলির অবস্থা হলো দীনুর মতো। এমন একটা আনন্দের ঢেউ উঠল শরীরে। চোখের

ওপর বুলবুলি দেখতে পেলো লোকটির দেয়া চালে হাঁড়ি ভরা ভাত রান্না হয়েছে। মুক্তোদানার মতো ফুরফুরে সাদা ভাত। মা সে আর দীনু বাসন ভর্তি করে ভাত খাচ্ছে।

লোকটি ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুলবুলির একটা হাত ধরেছে। দিমু ম্যালা চাইল দিমু। আসো।

বুলবুলিকে জঙ্গলের দিকে টেনে নেয় লোকটি। বুলবুলি কথা বলে না। বাধা দেয় না। চোখ জুড়ে তার তখন বাসন ভর্তি ভাতের স্বপ্ন।

চড়ুই পাখির মতো লাফাতে লাফাতে ফিরে এলো দীনু। বাজারের মুদি দোকান থেকে চার আনার বিস্কুট কিনে খেয়েছে। তারপর আঁজলা ভরে পানি খেয়েছে চাপকল থেকে। পেট একদম ভরে গেছে। পেট ভরা থাকলে মনে বেদম স্ফূর্তি আসে মানুষের। দীনু এখন তেমন স্ফূর্তিতে আছে।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে গাছতলায় বসেছিলো বুলবুলি। আঁচলে দু-আড়াইসের পরিমাণ চাল। চালটা বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে।

দীনুকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো বুলবুলি। খিদের চেয়েও বড়ো কোনো যন্ত্রণায় ধুকছে সে। চোখে-মুখে অদ্ভুত এক কষ্টের ছাপ।

কিন্তু দীনু ওসব খেয়াল করে না। বুবুর আঁচলে চাল দেখে খুশিতে পাগল হয়ে যায় সে। উচ্ছ্বাসের গলায় বললো, হেয় তোমারে চাল দিছে বুবু?

বুলবুলি ক্লান্ত গলায় বললো, হ।

ইস আইজ তাইলে পেড ভইরা ভাত খাওন যাইবো।

হ। ল বাইত যাই।

ঠিক তখুনি দীনু দেখতে পেলো বুলবুলির পেছন দিকে ছেড়াখোড়া মলিন শাড়িতে ছোপছোপ রক্তের দাগ। দেখে চমকে উঠলো সে। বুবু তোমার কাপড়ে দিহি রক্ত। এতো রক্ত বাইর অইলো কেমনে?

বুলবুলির বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। উদাস দুঃখি গলায় বললো, একবার ধান কাটতে গিয়া বাও হাতের লউঙ কাইট্টা হালাইছিলো বাজানে। ম্যালা রক্ত বাইর অইছিলো। দেইখা মায় কইলো ধানখেতে রক্ত দিয়া আইলানি। হুইনা বাজানে কইছিলো, পেড ভইরা ভাত খাইতে হইলে রক্ততো ইট্টু দেওন লাগবোই। আমিও আইজ পেড ভইরা ভাত খাওনের লাইগা রক্ত দিছি। এইডি হেই রক্ত। বাজানে দিছিলো লউঙ কাইট্টা আমি দিছি অন্য জিনিস কাইট্টা।

কথা বলতে বলতে জলে চোখ ভরে এলো বুলবুলির।

একটি দীর্ঘশ্বাসের ডালপালা

নাসরীন জাহান

গরুর গাড়িটা গ্রামের পথে পা রাখতেই আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। উজ্জ্বল প্রকৃতি তছনছ করে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ফলে তিন বন্ধুর প্রকৃতি যাত্রার মজাটাই ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিশাল আলোকস্তম্ভটিকে আড়াল করে রাখে ঘন কালো ক্ষুদ্র মেঘের স্তূপ। ফলে, ছইয়ের বাঁশ চুইয়ে পড়া জলের স্রোতে তিন বন্ধুই বিপর্যস্ত অবস্থায় ভিজতে তাকে। ভেজা শার্টের পাতলা আবরণ ফুঁড়ে ঠান্ডা বাতাস আত্মাকে স্পর্শ করে। আসন্ন শীতের আচমকা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে তিনজনই স্যাঁতসেতে একটি অস্বস্তিকর ঠান্ডা পরিবেশের মধ্যে নিজেদের এই রাত্রি অভিযানের বোকামির দিকটাকে প্রতিষ্ঠিত করে একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে।

পকেট থেকে ভেজা সিগ্রেট বের করে দেশলাই হাতড়ায় একজন। কিন্তু বিশাল আগুন ধারণকারী কাঠির ক্ষুদ্র মাথা ভেজা, নরম। জ্বালানোর অপারগতায় তার কপাল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অন্য একজন সামনের আঁধারময় পথটি হতাশার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। বাকি জন, এই অভিযানের পেছনে প্রবল উৎসাহ ছিলো যার, দু ঠ্যাং ওপর দিকে তুলে চিৎ হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে গলায় সুর আনার চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

প্রভাবিত চালক সেই সুর টেনে নিয়ে যে-ই উচ্চগ্রামে চড়াতে যাবে, অমনি তা ভেঙ্গে নিচেরদিকে বুঁজে আসে। ফলে তিনজনেরই তুমুল হাসি। এর উত্তরে জলে ডুবতে থাকা চালকের মামুলি সলজ্জ উত্তর-হেই বলার গলা আর নেই।

এমনই যখন উত্থান-পতন, হেলে দুলে গরুর গাড়ি চলছে, বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে বাঁশবনের শন্‌শন্ ঘুটঘুটে আঁধার চুল বিছিয়ে দিয়েছে, এমনই প্রবল শীত, তিন বন্ধুর চোখ বুজে থাকা, দুটি গরুর চালকের হেট্ হেট্ এর মধ্য দিয়ে অবিরাম লাফিয়ে চলা, চালকের ভাঙ্গা কণ্ঠে গানের চেষ্টা, তখন মেঘ তার কোল থেকে ছেড়ে দেয় চাঁদকে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চাঁদ এখন মধ্য আকাশে।

নেমে আসে তিন বন্ধু .... কায়সার, টুলু, ওমর। বৃষ্টির স্রোত থেকে ভেসে ওঠা চরের মতো প্রকৃতি এখন কাঁসার থালার মতো ঝকঝকে। তিন বন্ধু ঘাসের গালিচা বিছানো মাঠ ধরে হাঁটতে থাকে। পেছনে স্থির গরুর গাড়ির ওপর ঝিমন্ত চালক। ভেজা দেশলাই জ্বলছে না, ফলে জমে উঠছে না। বন্ধু যখন সেই নির্জন মাঠের ওপর উবু হয়ে, মুখের উষ্ণ ভাপের সাহায্যে একটির পর একটি কাঠি জ্বালানোতে লিপ্ত, তখন প্রকৃতির কি এক অমোঘ টানে .... আমি একটু প্রাকৃতিক কাজ .... বলতে বলতে অনেকটা হেঁটে গেছে ওমর।

পেছনে দু'জনের খন্ড হাসি ... শালা ওই কাজের জন্য দূরে যেতে হয়? মেয়েমানুষ আর কি ... তারপর দু'জনের আরও অস্পষ্ট কণ্ঠ .... আহ্, ভেজা কাপড় জুৎ লাগছে নারে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। চল সব খুলে ফেলি, প্রকৃতির মধ্যে আদিম হয়ে যাই।

এক সময় আরও অনেকটা পথ। তারপরই বিস্তীর্ণ বাঁশবন। পেছনে তাকিয়ে দেখে,

অনেকদূরে দু'জন তখনও উবু .... বাঁশবনটা অতিক্রম করে বাঁয়ের পথ ধরে সে। প্রাকৃতিক কাজের ব্যাপারটা পুরো গুল .... আসলে কি এক মজা, দুনির্বার টান, সেই জ্যোৎস্নায় রাতে একাকী পথের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। দক্ষিণে হাওয়ার হু হু টান। তারপরের পথটা নিচদিকে অনেক গভীরে গিয়ে, পনেরো বিশ ফুট পরেই দিকে উঠে গেছে। সেখানে কিছুটা জল জমেছে। তারা ওপর পড়েছে চাঁদের আলো। ওমর বেমালুম ভুলে যায় রাত্রির পথ ধরে আরও অনেকদূর যেতে হবে তাকে, টুলুদের বাড়িটা বৃহৎ নির্জন গ্রামের একদম শেষ মাথায়, তেমনই শুনেছে সে।

কিন্তু নিজেকে, কোন পিছুটান না রেখে প্রকৃতির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। সে দু'হাতে মাটির শক্ত অংশ চেপে চেপে ঢালু জায়গাটায় নামে। এক সময় টাল সামলে, অকস্মাৎ জলের মধ্যে।

হাঁটু পানি। ভিজে একাকার ওমর এবড়ো-খেবড়ো মাটি আঁকড়ে আঁকড়ে ওই কিনারে গিয়ে ওঠে। আবার পথ চলা। ওমর হাঁটতে থাকে। পুরো পরিবেশটা ঝিম ধরে আছে। দূরের ঘন অন্ধকার গ্রাম, গাছপালা এই প্রকান্ড মাঠটিকে প্রদক্ষিণ করে আছে। এক সময় ক্লান্ত ওমর দাঁড়ায়। স্থানে স্থানে খন্ড খন্ড আলো, গভীর ধূসরতাও স্থানে স্থানে। পেছনে তাকায়। বিস্তারিত বাঁশবন ছাড়া কিছু নেই। কেমন ভয় লাগতে তাকে তার। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াবে যখন, তখন দেখে অনেক দূর থেকে একজন মানুষ হেঁটে আসছে।

স্তম্ভিত ওমর স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্রমশ দূরত্ব কমছে। প্রকাশিত হচ্ছে সেই মানুষের আকৃতি। প্রথমেই দীর্ঘতা, তারপর চুল, অবিন্যস্ত পোশাক। ক্রমশ মুখ। সেই আবছায়া ক্রমশ পূর্ণ মানুষ হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত ওমর দেখে, বৃহৎ নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে একাকী ধুকতে ধুকতে হেঁটে আসা মানুষটি তার মুখোমুখি টানটান মাথা করে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা পাকা বড় ভ্রু চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে। তার নিচের চোখ দুটি এমন তীব্র অথচ ঘোলাটে। গা ছম ছম করে তার। শরীর থেকে এক অভিনব গন্ধ বেরুচ্ছে, যেনো বাঁশপাতার। তোবড়ানো গালের নিচের থুতনি আঁধারের জন্য অস্পষ্ট। মনে হয় ধবল আলো ফুঁড়ে একটি বৃদ্ধের জন্ম হলো। কি এক মোহগ্রস্ততায় চেয়ে থাকে ওমর। তার স্পষ্ট মনে হয়, এই মুখ তার চেনা, এই দৃষ্টি চেনা, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি চেনা, ভীতির স্থান দখল করে অনুসন্ধান। কিন্তু সেই নিথর প্রকৃতি ফুঁড়ে একটি ভাঙ্গা অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে—পথ হারিয়ে এসেছো?

তার এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হয়। কিছু একটা বলতে চায় সে। কিন্তু তাকিয়ে দেখে লোকটি সীমাহীন পথের দিকে চেয়ে হাঁপাচ্ছে। স্পষ্ট মনে হয় ভেতরের হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে। ইচ্ছা শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

—আপনি এই গ্রামের কেউ? প্রশ্ন করেই ভীত ওমর রাতের নিবিড় প্রকৃতিকে অবলোকন করে, কি অদ্ভুত! যতটুকু ভয় লাগার কথা, ততটুকু লাগছে না তার। কেননা স্পষ্ট মনে হচ্ছে লোকটি তার চেনা কেউ।

গ্রামের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বৃদ্ধ বহুদিনের চেনা মানুষের মতোই বলে,—চলো হাঁটি।

বৃদ্ধটিও যেনো এই রাতের প্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার টানকেও যেন উপেক্ষা করা যা না। তাই স্তূপীকৃত প্রশ্ন ভেতরে নিয়েও ওমর নিশ্চুপতা হয়ে হাঁটতে শুরু করে।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জন একঠি সবুজ টিলার ওপর বসে। বৃদ্ধ ঘনঘন শ্বাস ফেলছে। তার আলখাল্লার মতো শরীরে জড়িয়ে থাকা ছেঁড়া কাপড় ফুঁড়ে শীতের হাওয়া প্রবেশ করে। ভেজা কাপড়ে ওমর কাঁপতে থাকে। হঠাৎ তার বন্ধুদের কথা মনে হয়। সে দ্রুত দাঁড়ায়। ভাবে দৌড় দেবে। কিন্তু পুনরায় সেই কণ্ঠস্বর—আমাকে চিনতে পারো নি তুমি?

কি অদ্ভুত, তার তো মনেই হচ্ছিলো চেনা কেউ। ধপাস করে সে পুনরায় টিলার ওপর এসে বসে। গভীর চোখে বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করে — কে আপনি?

মনে হয় বৃদ্ধের গলার মধ্যে রাজ্যের সর্দি জমে আছে। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল গাছ থেকে অজস্র পাতা ঝরছে। বৃদ্ধের মাথার ওপরও একটি পাতা এসে পড়ে। বৃদ্ধ মাথা নাড়াতে থাকে—বলবো। অবশ্যই বলবো। কতদিন পর একজন কথা বলার মতো মানুষ পেলাম। এই দিনটির জন্য কতদিনের অপেক্ষা আমার। নিশ্চয়ই বলবো। ওমর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে — কেন কথা বলর মতো কেউ নেই আপনার?

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উত্তর সে — ছিলো। বহুকাল আগে। তখন আমি নগরে বাস করতাম। সেখানে আমার একমাত্র কাজ ছিল ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া। কেউ শুনতো না। শুনলেও অবজ্ঞার সঙ্গে, বোধগম্য হতো না তাদের। তাই লোকালয় ছেড়ে চলে এসেছি। কেননা এখানে বলেও সুখ, শুনেও সুখ। বলছিও আমি, শ্রবণও করছি আমি নিজে। ফলে দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

কি আশ্চর্য! শহরে ছিলেন? এখানে এই নির্জনে থাকছেন কিভাবে? ওমরের এমন সব মামুলি প্রশ্নকে উপেক্ষা করে বৃদ্ধ শুক্লবর্ণ রাত্রির দিকে চেয়ে থাকে। চারপাশে মেঘ না থাকায় স্বাবলম্বী চাঁদ অকৃপণ জ্যোৎস্না ঢালছেই...ঢালছে...। ফলে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাতা চুইয়ে আলোও গড়িয়ে পড়ছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু নিঃশব্দতা। ধূধূ প্রান্তর। বৃদ্ধকে যেন বলার নেশায় পেয়েছে, এবং ভীষণ কৌতূহলী ওমর স্থানকাল ভুলে চেয়ে আছে বৃদ্ধের অতিচেনা মুখটির দিকে। জন্ম সূত্রেই আমি ছিলাম কুৎসিত, এবং বিকলাঙ্গ। বলতে বলতে বৃদ্ধ কাপড়ের আড়াল থেকে কুঁচকানো আঙ্গুলের বাঁকা দুটি হাত বের করে। চাঁদের ধবল আলোর বিপরীতে চামড়া ঝুলে পড়া, কোঁকড়ানো বীভৎস হাত দু'টি বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ, এবং আমার একটি পা-ও নিচের দিকে সরু হয়ে বাঁকানো।

ওমর বিস্মিত হয়ে সেই পা-টিকে প্রত্যক্ষ করে। আশ্চর্য! এতটা পথ হেঁটে এলো লোকটি, এবড়ো-থেবড়ো জমিনের জন্যই সম্ভবত বোঝা যায় নি। নিস্পন্দ প্রকৃতির মধ্যে বৃদ্ধ তার ভারি ঘন নিঃশ্বাসগুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। এবং বিশুদ্ধ হাওয়া গ্রহণ করতে করতে বলে যায়—এই কুৎসিত চেহারার জন্য, আকৃতির জন্য, নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন আমাকে অনেক ভান এবং ছলনার আশ্রয় নিতে হতো। এবং যাতে অন্যের বিরক্তির কারণ না হই তার জন্য অনেক চটকদার কথা এবং অভিনয়ের আশ্রয় দিতে হতো। যার জন্য প্রচুর বই পড়তে হতো আমাকে। আমার পেশাটাও ছিলো তেমন, চটকদার কথায় বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাতকরণ। কিন্তু চিরদিনই এই পেশার ক্ষেত্রেও আমার আকৃতির ভয়াবহতা আমার

সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ফলে কথার চটক আরও বাড়াও, আরও বেশি সুন্দরকর মিথ্যাগুলির প্রদর্শন—এই করে করে হাঁপিয়ে উঠতাম। মেয়েরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপন্ন বলেই হয়তো আমারও একটি সুস্থ সুন্দর স্ত্রী ছিলো। যথারীতি আমার প্রতি ছিলো না তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ। নিয়ম বলে, সামাজিকতার জন্য, আর্থিক বিপন্নতার জন্য সে দীর্ঘদিন ওইভাবে আমার সঙ্গে সংসার করেছে।

আমি দেখতাম, কোন সুস্থ সুন্দর পুরুষ দেখলে কি ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সে। তখনই সে তার গোপন করে রাখা মনোরম হাসিটি, নমনীয় ভঙ্গিটি প্রকাশ করতো। বিয়ের প্রথম রাতে, স্পষ্ট মনে আছে, আমার তখন উঠতি পড়তি অবস্থা। কাঁপছিলাম একটি অনাস্বাদিত সুখের অপেক্ষায়। স্থির অনেকক্ষণ বসেছিলো সে। আমি যখন আমার বাঁকানো কুৎসিত হাতটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম, তখন গভীর রাত। সে দ্রুত মেঝেতে দাঁড়ালো। তারপর সেই চাউনি, প্রথম দেখাতেই সবাই যা নিক্ষেপ করে, তা ছুঁড়ে দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আমি খিড়কি তুলে দেখি, উঠানের মধ্যে স্থির বসে আছে সে। বাইরে কনকনে শীত। তবুও আমি যাই নি, কেননা আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার চেয়ে শীতের কঠোরতা অনেক সহনীয় বলেই তো সে ফিরে আসছে না।

ওই ভাবেই শুরু। তীব্র ঘৃণার মধ্যেও কি সুন্দর দুটি মানুষ পাশাপাশি দিন অতিবাহিত করে, তার বড় উদাহরণ ছিলাম আমরা। সবচেয়ে আশ্চর্য, এর মধ্যেও আমাদের এমন কিছু সুখকর খন্ড মুহূর্ত আসতো, যার প্রকাশ ছিলো আমার স্ত্রীর গর্ভধারণের মধ্যে দিয়ে। সব কষ্ট ভুলে গেলাম। সব অসামঞ্জস্যতা। কি এক অপার্থিব সুখ আমাকে সব উপেক্ষার যন্ত্রণা উপেক্ষা করতে শিখিয়েছিলো।

তারপর সন্তানের জন্ম হলো।

বলতে বলতে বৃদ্ধ হঠাৎ থেমে যায়। ওমর যেন এতক্ষণে দেখে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, বৃদ্ধের মুখটি বসন্তের দাগ ভরা, কদাকার। ঠোঁট দুটি যেনো থুতনি উপচে নিচ-দিকে-ঝুলে পড়েছে। নাকের ডগাটি বাঁদিকে বাঁকানো। এতক্ষণে এতসব অসামঞ্জস্যতা তার চোখে পড়ে। কিন্তু তার ঘৃণা হচ্ছে না, ভয় হচ্ছে না। সে যেন টুলুদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য নয়, অন্ধকার পথে গরুর গাড়ি ভ্রমণের জন্য নয়, এই মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে বলেই বন্ধুদেরকে এ পথে আসার জন্য উস্কেছিলো। ফলে তার একাগ্র দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের ওপর বিঁধে থাকে।

বৃদ্ধ ভাঙ্গা, অস্পষ্ট কণ্ঠে দম নিতে নিতে পুনরায় শুরু করে—কিন্তু কি ভয়ংকর সেই সন্তানও হলো বিকলাঙ্গ। তার দুটি পা ছিলো দুই হাতের মতো এবং মুখটি ছিল হুবহু আমার মুখ। মনে হচ্ছিলো একটি মাংসের স্তূপ। আমার স্ত্রী সন্তানের মুখ দর্শন করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর আমি, যে জীবন পেরিয়ে এসেছি, সেই ঘৃণ্য জীবনের আরেকটি শুরু প্রত্যক্ষ করে পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুদিন অসংলগ্ন জীবনযাপন করি বাইরে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে, প্রাণপণে টিকিয়ে রাখা পেশা থেকে সরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করি নিষ্ঠুরতম ক্ষুধাকে। ঘরে ফিরে আসি। খুব আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করি, যে আমাকে আমার আকৃতির জন্য ঘৃণা করতো সেই আমার সন্তানকেই পরম মমতায় আমার স্ত্রী কোলে তুলে নিয়েছে।

আকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও।

ধীর তালে সংসার চলতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি এক নতুন অনুভূতির ভেতর নিমজ্জিত হই। স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির পাশাপাশি যখন সেই কুৎসিৎ শিশুটিকে শুয়ে থাকতে দেখি, মাথার শিরা দপ্ দপ্ করে। একটা যন্ত্রণাকর অনুভূতি পায়ের পাতা দিয়ে প্রবেশ করে বুকের মধ্যে এসে আটকে থাকে। পুরো শরীর অবশ হয়ে যায়।

একদিন মাঝরাতে উঠে বাতি জ্বালিয়ে তার মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে কেমন ভয় পেয়ে যায়। শিশুটিকে বুকের কাছে টেনে আমার দিকে ভীত চোখে তাকায়। সেই প্রথম তার চোখে আমি ভয় প্রত্যক্ষ করি। সেই দৃষ্টি দেখে আমার ভেতর নতুন নির্মমতার জন্ম নেয়। মনে হয়, কেবল এখনই আমি আমাকে হত্যা করতে পারি। আমার সন্তানের মধ্য দিয়ে। তবে অন্তত পৃথিবীতে একটি মানুষ শূন্য হয়ে যাবে, কাঁদবে।

কিন্তু সন্তান না হয়ে সে মৃত্যু যদি আমার হয়, তবে পুরো পৃথিবীতে স্বস্তি নেমে আসবে। এছাড়া তখন আমাকে আরেকটি অনুভূতি ভীষণভাবে তাড়া শুরু করে, সেটা হলো আজ সব দুর্বলতা উপক্ষা করে চলতে পারছি বলেই অনেক ঘৃণার মধ্যেও টিঁকে থাকতে পারছি। কিন্তু কখনও যদি চিৎ হয়ে পড়তে হয় এবং সেই স্থান দুর্বিষহ করে তুলতে হয় রক্ত ঘাম, মলমূত্রের গন্ধে। তখন আমার প্রাণময় মূল্যহীন দেহটিকে সবাই নদীর কিনারে অথবা গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করে আসবে। কেননা তা শুধু পরিবেশকে দূষিত করার কাজেই নিয়োজিত থাকবে তখন। অন্যের কাছে নিজের এই উপক্ষার দৃশ্য ক্রমশ আমাকে ভয়ংকর করে তোলে। তখন থেকেই স্থির সিদ্ধান্ত নিতে থাকি লোকালয় ছেড়ে দূরে কোথাও নির্জনে চলে যাবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটে! অমার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা বাড়ির একটি কিশোর ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই ছেলেটিই প্রথম আমাকে ঘৃণার বদলে একটি মায়াময় অনুভূতির ভেতর বন্দী করে ফেলে। ছেলেটি প্রতিদিন বলতো, আপনার দৃষ্টি অসাধারণ। এমন স্নেহময় চোখ আমি কোনদিন দেখি নি। এবং পছন্দ করতো আমার কথা। আমার সাজানো গল্পগুলি—যেমন একটি ভিখিরির ছিন্নঘর হঠাৎ প্রাসাদে পরিণত হলো, একটি মৃত মেয়েকে বাঁশির শব্দ দিয়ে জাগিয়ে তুললো একটি পুরুষ অথবা জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত একজন লোক আত্মহত্যা করতে গিয়ে নদীর কিনারে অকস্মাৎ একটি সোনার মূর্তি পড়ে থাকতে দেখলো .... সেসব গল্প খুব গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতো। বলতো বাবা তাকে ফেলে চলে গেছে। মায়ের সাথে অন্ধকার দিনগুলি কাটছে তার। এইসব আশার গল্প শুনে সে বাঁচতে শিখছে। দীর্ঘদিন আমাদের সেই অসমবন্ধুত্ব টিঁকেছিলো। আমার জীবন যেন নতুন গতি পেলো। কাজের পরে তাকে নিয়েই মেতে থাকতাম।

একদিন অকস্মাৎ কাউকে কিছু না বলে সেই একরতি তারা কোথায় চলে গেলো। আমি রূপান্তরিত হতে থাকি পুনরায় সেই অসুস্থ, ঝিমন্ত মানুষে। আমার জীবনে তারপর সীমাহীন অন্ধকার, অসংখ্য ঘটনা।

দীর্ঘদিন পর আজ রাতে সেই কিশোরের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু এখন যুবক সে।

ওমর কাঁপতে থাকে। যেমন করে বৃদ্ধ বলে দেওয়ার পর তার কদর্যতা তার চোখে

পড়েছিলো। তেমনই বৃদ্ধের বলার পর কি এক আচ্ছন্নতার মধ্যে তার মনে হয় সে সেই কিশোর। এই লোকের সব ঘটনা সে জানে। এ-জন্যই এই চোখ ওই কণ্ঠস্বর বড় চেনা তার। তার স্ত্রীকে, বিকলাঙ্গ সন্তানকে সে চিনতো, কেবল তারপরের ঘটনাগুলি বৃদ্ধ বলে দেওয়ার পরই তার মনে পড়বে আগে নয়।

তার কিছুদিন পর আমি আমার সন্তানকে হত্যা করলাম.....বৃদ্ধের এরকম শীতল উচ্চারণে ঘেমে ওঠে ওমর.....হ্যাঁ, তাইতো মনে পড়ছে.....শিশুটিকে তার পিতা হত্যা করেছিলো, শুধু তারপরের ঘটনাগুলি জানে না সে। বৃদ্ধের মুখের দিকে নিস্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে।

হত্যা করেছি তখনই, বৃদ্ধ বলতে শুরু করে, সেই কিশোরের অন্তর্ধানের পর প্রথম যখন তার প্রতি আমার মায়া জন্মাতে শুরু করে। তার হাসি, হাত নাড়া, দুটি অসহায় পা আমাকে এক বিচিত্র অনুভূতির ভেতর ফেলে দেয়। ততদিনে আমার চরিত্রে আরও কিছু পরিবর্তন এসেছে। স্ত্রীর দূরত্বের কারণেই সম্ভবত আমি অন্যান্য নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি, যদিও আমাকে আমল দিতো না কেউ। কিন্তু আমার স্ত্রী কিংবা অন্য লোকজন,যাদের ব্যাপারে প্রবল ভীতি আমার, কেবল তাদের সামনেই আমি কুণ্ঠিত, সংস্কারাচ্ছন্ন! তাদের সামনে একটি মেয়ের সৌন্দর্য প্রশংসার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি আমার। কিন্তু আড়ালে বেশ উদার স্বাধীনচেতা হয়ে পড়ি আমি। যে কোন নারীদেহ স্পর্শের ব্যাপারেও আমি বেশ ক্ষিপ্র.....কিন্তু তা-ও সম্ভব হতো একমাত্র কুৎসিত রমণীদের রূপের স্তুতি দ্বারা। আমি সেই আনন্দের মধ্যে বাঁচতে চাইলাম কিছুদিন। যে আনন্দ আড়ালের, সমাজের কোনই ক্ষতি হচ্ছিলো না যা দ্বারা, কেননা আমার মনে হতো যে কলঙ্ক প্রকাশিত তা দ্বারাই সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝি সেই কৃত্রিমতা সেই ভান আমাকে আরও অসুস্থতার পথে ধাবিত করছে। আরও প্রকটভাবে মনে হয় পৃথিবীর কোনদিকেই আমার অকৃত্রিমতার দাম নেই। আমার সন্তানেরও পরিণতি হবে আমার মতো। কেবল জন্মের মায়ায় আমরা তাকে ভালোবাসব, কিন্তু তার সামনের জীবন, দুর্বিষহ, অসহনীয়। ফলে একরাতে, আমার স্ত্রী তেমনই ঘুমে, আমার ওপর যেনো একটা পশু ভর করে। অন্ধকারের মধ্যেই প্রবল শক্তিতে চেপে ধরি তার গলা।

যখন আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গে তখন সব শেষ। তুমিতো জানোই সেসব ঘটনা। তবুও পুনরাবৃত্তি করছি, কেননা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই তো আমরা অবিরাম সৃষ্টি করে চলি।

পুরো জ্যোৎস্নাময় রাত ওমরের ওপর ভর করে। হু হু হাওয়ায় তার শুকিয়ে ওঠা কাপড় ফর ফর পাক খায়।

....হ্যাঁ হ্যাঁ, গলা টিপেই তো, এমনই তো শুনেছিলো সে। এমনই নিথর যখন ওমরের অবস্থা ....বৃদ্ধ তখন হাসতে থাকে.....সমচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো, শিশুটির মৃত্যুর পর যখন আমার ওপর ভর-করা পশুটি পালিয়ে গেছে, যখন স্নেহময় নির্দোষ পিতার হাতে পুলিশ হাতকড়া পরালো। তারা জানতো এই শিশুটির মৃত্যুতে সমাজ উপকৃত হলো, তারপরও নিয়মের জন্যই শুধু তারা আমাকে টেনে নিয়ে গেলো। অবিরাম নির্যাতন করলো সেই পিতাকেই, যে তখন সন্তানের মৃত্যুতে কাতর। পশুটিকে কিন্তু তারা খোঁজার কোন চিন্তাই করলো না; কাজ সমাপ্তির পর যে তখন পালিয়ে গেছে।

আমার ওপর তারা অবিরাম নির্যাতন চালিয়েছে কেবল শিশুটিকে আমি হত্যা করেছি—

এই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। কিন্তু কি করে আমি স্বীকার করবো তা? হত্যা তো আমি করি নি, করলে জেলখানার সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে কি তার স্মৃতি দ্বারা কাতর হয়ে প্রতিদিন কাঁদতে পারতাম? রাত গভীর হলে আমি যেনো স্পষ্ট দেখতাম তার চেহারায় এক অদ্ভুত দ্যুতি। কখনই সে তার হত্যার জন্য আমার দিকে তির্যক চোখে তাকাতো না। কেননা আসল ব্যাপারটা সেই কেবল বুঝেছিলো। কিন্তু একটা ব্যাপার, তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গভীর কষ্ট ছিলো আমার ভেতর, তখন পর্যন্ত কোন অনুতাপ ছিলো না।

সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুয়ে শুয়ে, শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়েও আমি সেই স্বপ্নটি দেখতাম। লোকালয় ছেড়ে দূরে চলে গেছি আমি। দাঁড়িয়ে আছি, পশ্চিমের শেষ আলোর মধ্য থেকে ঈশ্বর বেরিয়ে এলেন। ধাপে ধাপে নামছেন তিনি। সিঁড়ির শেষ ধাপে কুয়াশার শাদা অন্ধকার। সেখানে পা রাখার পর তিনি অন্তর্হিত।

আমি তখনও, অনেক দূরে, ভীষণ ক্ষুদ্র টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

আমার সেই যন্ত্রণাময় সময়ের অধিকাংশই তখন কাটতো ঈশ্বর চিন্তায়। কিন্তু কখনই তাকে আমি স্পর্শের মধ্যে, যাকে বলে আত্মার স্পর্শ.....পেতাম না। শুধু দেখতে পেতাম যেন।

এই যে, এখন বৃদ্ধ যেন মন্ত্র পড়ছে, এ রকমভাব বলে যায় ...নির্জনে আসার পর আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। কেননা পশুরা, সবুজ বৃক্ষরাজি, কখনই আমার আকৃতি নিয়ে ভাবিত নয়। মানুষের মতো শ্লেষ, ব্যঙ্গাত্মক, করুণাকাতর দৃষ্টি তারা আয়ত্ত করে নি, যা আমাকে শৈশব থেকে কুণ্ঠিত করে রেখেছিলো। ধু ধু প্রান্তর ধরে দিনরাত হাঁটি। কথা বলি গাছেদের সঙ্গে, খরগোস হরিণ, চিতাবাঘের সাথে। আকাশের দিকে মাথা রেখে খুঁড়িয়ে হাঁটি.....এবং ক্রমাগত নিজেকে গল্প শোনাই, সেই মিথ্যে গল্পগুলি, একটি অন্ধ যন্ত্রণাকাতর লোকের দরজায় করাঘাত করেন ঈশ্বর। লোকটি জেগে ওঠে। কিংবা পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্লান্ত একটি লোক একদিন তার ভেতর একট মুক্তোর দানা আবিষ্কার করে। হঠাৎ সেই মুক্তোর দানাটি কথা বলে ওঠে, আমিই ঈশ্বরের অন্য এক রূপান্তর। গল্প করতে করতে পাথরের গুহায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য ব্যক্তিত্ব খোয়ানোর কোন ব্যাপার নেই। এভাবেই দিনগুলি রাতগুলি কাটে। এর মধ্যে, নির্জনতার অলৌকিকতা কিন্তু ভয়াবহ। আমি প্রকৃতির ধ্যানে লিপ্ত ছিলাম একদিন, হঠাৎ প্রকৃতি ফুঁড়ে একটির রমণীর আবির্ভাব হয়। সবুজ পাতার আচ্ছাদনে তার শরীর ঢাকা। এমনি জ্যোৎস্নাময় রাত ছিলো সেটা। আমি বিস্মিতভাবে তার নমনীয়, অকৃত্রিম দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করি। সে হাসছিলো সেটা বিশাল সবুজ প্রান্তরের ওপর দাঁড়িয়ে। সে-ই প্রথম আমি অকুণ্ঠচিত্তে আমার দুটি কুৎসিত হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিই।.....এই নাও.....বলে সেই রমণী দু'হাত বাড়িয়ে আমার দুটি হাতের ওপর কিছু ঢেলে দেয়। তারপর সবুজ অরণ্যের সাথে মিশে যায়।

আমি দেখি, আমার দু'হাতে গভীর শূন্যতা। চারপাশের মানুষের ভেতর প্রবল যত্নের সঙ্গে যে শূন্যতাকে পকেটে লুকিয়ে রাখতে হতো, ঘৃণা করতাম প্রতিদিন যে শূন্যতাকে। আমি সেই শূন্যতার পথ ধরে সেই প্রথম হাঁটতে শিখি, ভালোবাসতে শিখি তাকে।

চাঁদ হেলে পড়েছে। বৃদ্ধ তখন এই পৃথিবীতে নেই। কি গভীর নিমগ্নতার সঙ্গে কথা বলে

যাচ্ছে। ওমর পাথরের মতো স্থির, অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, জেলখানা থেকে বেরুলেন কি ভাবে বৃদ্ধমাথা নাড়ে.....বলছি.....তোমাকেই তো বলবো, তুমিই তো সেই একমাত্র কিশোর, যে স্বীকৃতি দিয়েছিল আমার জন্মকে.....অবশ্যই বলবো।

—ওরা যখন সন্তান হত্যার জন্য ক্রমাগত নির্যতন চালাচ্ছে, তখন একরাতে আমি আবার নতুন বোধ দ্বারা আক্রান্ত হই। মনে হয়, আমার সন্তানের পা দুটো বিকলাঙ্গ হলেও দুটি সুন্দর হাত ছিলো তার। ফলে সে যে শুধুই অন্যের গলগ্রহে পরিণত হতো সেটা ঠিক নয়। আমি একটি সুন্দর অট্টালিকার কথা স্মরণ করি, যার ভাঁজে ভাঁজে আছে বালু। খাঁজ মিশ্রিত অনন্তবালার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি। সব এলোমেলো হয়ে যায়। পাগলের মত হয়ে যাই আমি। নিজেকে রূঢ় হিংসুটে হত্যাকারী মনে হয়। মনে হয় আমি আমার ব্যর্থতার ভার আরেকটি প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। অথচ আকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও তার মাথা কিংবা হাত দুটি থেকে নতুন কিছুর জন্ম হতে পারতো। অতদূর হয়তো দৃষ্টি প্রসারিত করার ক্ষমতাই আমার নেই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে.....নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে থাকি.....আমি বুঝতে পারি, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে কুণ্ঠিত হয়ে বেঁচে থাকার শাস্তি সে একা পেতো না। তার দিকে যাদের চোখ পড়তো, ঘৃণায় যারা সরিয়ে নিতো চোখ, শাস্তি তাদেরও কিছু কম হতো না। একটা বিকৃত কিছু চোখের সামনে দুলছে।

.....বোঝো কেমন শাস্তি। যা হোক জেল স্থানান্তরের সময় আচমকা গাড়ি থেকে নিচেরদিকে লাফিয়ে পড়ি....পাক খেতে খেতে আমার দেহটা গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। আমি আত্মহত্যা করি....বলতে বলতে বৃদ্ধ দাঁড়ায় ....এবং উচ্চারণ করে....আমি একজন মৃত মানুষ— জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতের পথ ধরে সে হাঁটতে থাকে। বৃদ্ধ পেছন দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো উচ্চারণ করে.....বিশ্বাস কোর না, এর কিছুই বিশ্বাস কোর না.....। তারপর তার দেহটা বিশাল প্রান্তরের সবুজের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। ওমর দেখে একটি ভঙ্গুর মানুষ ধীরে জ্যোৎস্নার গহ্বরের মধ্যে মিলে যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।

পাগলের মতো দৌড়াতে থাকে সে। ধবল হয়ে আসছে আকাশ। বাঁশবনের শব্দ, এবড়ো-থেবড়ো ঘাসে ছাওয়া মাঠ ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ায় সে। চাঁদ আকাশের শেষ কোণায় অস্পষ্ট, রঙ জ্বলে যাওয়া গোল রুমালের মতো। সেই জায়গায় এসে হাঁফ ছাড়ে ওমর। যেখানে টুলু কায়সার .....কিন্তু ধু ধু প্রান্তর। যথাস্থানে গরুর গাড়িটি নেই। তাকে বিশাল শূন্যতায় ফেলে বন্ধুরা তখন চলে গেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ বাংলা এ্যাকাডেমি, ঢাকা।

প্রতিপক্ষের পক্ষে

আহমদ বশীর

অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন

কেমন দু:খ, কেমন দু:খ কিংবা দাঁড়িয়ে আছি, নাকি ভূমিষ্ঠই হইনি — এই রকম কোন কিছু স্থির নিশ্চিত না হওয়ার মতো বোধের মধ্যপথে, শিখা পর্দার আড়ালে নখের ময়লা খুঁটতে থাকে — খুব সন্তর্পণে, কেননা কোন শব্দ হবার কথা ছিলো না, পায়ের কাছে বিড়ালটা মাথা নিচু করে আরো সাবধানে গৃহস্থের ঘরবাড়ির পাহারাদার সেজে, অপরাধীর ভঙ্গিতে যতক্ষণ থাকতে পারে, তার মধ্যেই সে শুনলো, সোলেমান চৌধুরীর চড়া স্বর : অই তর বইনেরে ডাক।

আকাশে খুব নিচু হয়ে একটা অধীর এ্যারোপ্লেন, কোনদিকে যেন ছুটে যেতে যেতে একবার পাখির মতো ঠোক্কর মেরে গেলো, মহম্মদপুরের কোন বাড়ির ছাদে, আর তখনি মনে হলো — এই প্লেন যদি পাকিস্তানে যায়। পাকিস্তানে যাবার অনুমতি নেই? সেখানে কোথাও না কোথাও কেউ অপেক্ষায় থাকে। বিষাদমগ্ন দেয়ালের কালিঝুলি স্পষ্ট হয়ে আসে আর শিখার ঘাড়ের ওপর একরাশ চুল জ্বলছিলো, জ্বলছিলো। রৌদ্রের রং নিভতে নিভতে ধূসর হচ্ছে যখন, আপনেগো বালামন্দ দেহনের লাইগ্যাইতো আমরা আছি, — হা-হা-হা আহা হেই কথা আর কইতাছেন ক্যা, মাইনষের বালা-মুছিবত আছে না? হেইডা লইয়াই তো কথা — তারপর সোলেমান চৌধুরীর প্রকাণ্ড হাসির সামনে মইনুর অসুস্থ শরীর শোয়ানো, তার পাশে আম্মা পানের বাটা নিয়ে টুক্‌টুক্ শব্দ করছেন — এই চিত্র পর্দার আড়াল থেকে তেরছা ভাবে আবছা আবছা দেখা যায়।

অখন হইলো গিয়া দ্যাশ গড়নের টাইম — পর্দার ওপর হিজিবিজি আঁকতে থাকলে বিস্ফোরণের মতো শব্দ হয়, ব্রীজের ভেঙে যাওয়া ইট থেকে ইট খসে পড়ার টুকরো টুকরো অবাস্তবতা এক সঙ্গে শিখার কানের পাশে জমা হয়। সোলেমান চৌধুরী তখনো বলে যাচ্ছে — আম্মার হাত থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে দিলো; অহন হইলো গিয়া দ্যাশ গড়নের টাইম — বহুত ধক্কল গ্যাছে মাইনষের উপর দিয়া, আমাগো শ্যাখ সাইবে কয়, বুঝলেননি, শ্যাখ সাইবে কয় — সোলেমান চৌধুরীর ঠোঁট আরো লাল হয়ে আসে, দুই কশার কাছে পানের রস এসে যায়।

কেমন মুছিবতের মধ্যেই না পড়েছি সোলেমান ভাই — শিখা আম্মার কণ্ঠস্বর আলাদা করে শোনে — আমাদের তো কিছছু নাই, কিছছু রাখতে দিলো না আল্লা... এই সময় ঘরের শাদা অংশগুলো বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে; নোনা ধরা দেয়ালে মাকড়সার সংসারপাতি অগোছালো ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চকিত চমক দেয়। মা কেন যে এক কথা একশবার ক'রে বলবে — সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে এবং বিড়ালের নরোম পিঠে হাত বুলায়। আমাদের কিছুই রাখতে দিলো না আল্লা, কিন্তু কি আশ্চর্য, ওই হারমোনিঅমটা এখনো আছে, কেউ নেয়নি, হয়তো ওরা ভেবেছে এই আতঙ্কের দিনে কেউ হারমোনিঅম কিনবে না, কোন

কাজেও লাগবে না, তার পাশে এখনো সেই দাবার ছক — ওহ হো, আমাদের দাবার ছকটাও কেউ নেয়নি। ইচ্ছে হলো চিৎকার দিয়ে পাশের ঘরে মাকে শুনিয়ে দেয়: মা তুমি মিথ্যা বলছো, আমাদের হারমোনিঅম আর দাবার ছকটা কেউ নেয়নি এখনো। তখনি মনে পড়ে, হারমোনিঅম, তুমিও ষড়যন্ত্রে ছিলে — শেষবারের মতো যখন ওটা ব্যবহার করি একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি-ই-ই-ই। লাঠি হাতে মাথায় লাল কাপড় বাঁধা মুক্তিবাহিনীর মহড়ার মধ্যে আমি গাইতে থাকি। শিখা নিঃশব্দে চিৎকার করে, হারমোনিঅম, তুমিও ছিলে, সেই গভীর ষড়যন্ত্রে, তুমি—তুমিও ছিলে? আমার আঙুলগুলোর কিছুই হয়নি — আমরা বেঁচে নেই — কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে পৃথিবীটা বাস্তব? আমরা কেউ স্বপ্ন দেখিনা? স্বপ্নের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যায়। হয়তো এই পর্দার আড়ালে আমার বসে থাকা, একটা ভীষণ ভাঙচুরের পর থমথমে শুদ্ধতার মতো, এই বাস্তবটা আসলে ফাঁপা-হেঁয়ালি নাকি? শিখা ভয় পায়, সহসা সেই ভয় সমস্ত শরীর জুড়ে টলোমলো নাচতে থাকে। তখন পাশের ঘর থেকে আরো সংলাপ ছিটকে আসলো, সোলেমান ভাই আমাগোরে বাঁচান - এই বাচ্চাকাচ্চাগুলান লইয়া আমি কই যাই? দ্যাশ স্বাধীন হয় নাই? আমাগোরে অহন কবরে ঢুকাইছে, এই বাড়িটা গেলে কোথাও পাও রাখনের জায়গা পামু না। কতো সহজে মানুষ অসহায়ত্বের কথা বলে, সে সময় তার সর্বস্ব বন্ধক রেখে দেয় অন্য কারো কাছে — কতো সহজে — এই ভেবে আবারো শিখার ভিতরে শিখা ভাবতে থাকে। শীতের বাতাসে কাঁপছে ঘরবাড়ি, আমরা কাঁপতে কাঁপতে এলাম, টাঙ্গাইলের গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে, আমাদের কারো কোন চাদর ছিল না, সারা রাস্তায় ধ্বংসের চিহ্ন - একটা মিলিটারী ভ্যানের সামনে গ্রেনেড বার্স্ট করে, ভয়ংকর শব্দের মধ্যে আমরা চার ভাইবোন আর মা ঢুকে পড়ি — আমাদের শীতগ্রীষ্ম ছিলো না, জুন মাসের বর্ষার রাতে ভিজতে ভিজতে পিস কমিটির মেম্বরের বাসায় যাই। আম্মা আর আমি। মইনু তখনো অসুস্থ - এখনকার মতো। জ্বরে কাঁপছিলো। আমাদের সাহায্য চাই ..... সাহায্য... পিস কমিটির মেম্বর জব্বার খানের মুখে বসন্তের দাগ ছিলো কি? হ্যাঁ ছিলো — না, না, বসন্তের দাগঅলা লোকটাতো, ওই যে রেলওয়ে ইস্কুলের মাঠে আমার ওড়না ধরে টান দেয়, ওখানে রিলিফ দিচ্ছিলো — ঠিক মনে নেই, ওর মুখে বসন্তের দাগ ছিলো কি? ঠিক মনে নেই।

যাউক গা, যাউক গা, আপনি চিন্তা কইরেন না, আপনের মাইয়ারে ডাকেন, ওরে লইয়া আমি কাইলকাই শ্যাখ সাহেবের কাছে যামু। উনি হইলেন সোনার মানুষ, যে যা চাইবো, হেইডাই পাইবো - আপনের মাইয়াডারে একটু ডাকেন - সোলেমান চৌধুরী কেটে কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করে। আর মা শিখাকে ডাকতে থাকেন, শিখা শোনে, পায়ের কাছে বিড়ালটাকে লাথি দেয় — নিশ্চিতভাবে তার ভিতরে কোথাও ঘন্টাধ্বনি বাজছিলো, বিমান আক্রমণের সতর্ক-সাইরেনের মতো একটানা? না থেমে থেমে? বিপদ আসছে? না কেটে গেছে? মিগ অথবা বি-৫২ ফাইটার বোম্বার্ড ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে - আগুন লাল ও বিপুল শব্দময়তা।

পর্দা সরিয়ে যখন সে সোলেমান চৌধুরীর সামনে এসেছে, দোকানে সাজানো পুতুলের মতো তার পা দুটো স্থির, একটু কম্পন নেই, এমনকি চোখ জোড়াও দ্বিধাহীন ভাবে লজ্জাহীন।

অনেক দেখেছে তো? সোলেমান চৌধুরীর মুখে বসন্তের দাগ নেই? শিখার শেষতম রক্তবিন্দু খুঁজতে চেষ্টা করে - আজিমপুর স্কুলের দারোয়ানের মুখে বসন্তের দাগ ছিলো, আর যেন কে কে? কিন্তু এই লিস্ট বানানো আরো বেশী কষ্টকর। তার চেয়ে শীত সেঁধিয়ে যাচ্ছে গভীর লোমকূপে; এবং শিখা হাত তুলে সালাম জানালো: সালামালেকুম মামা।

এইতো আমার ময়নাডা আইছে - সোলেমান চৌধুরীর চোখ নাচলো। একটা বিস্তৃত হাসি নিপুণ ভঙ্গিতে একবার বিদ্যুতের সৃষ্টি করেই নিভে যায়। অহন তোমারে কই কি, সামনে ইলেকশন আইতাছে তোমারে একটুক খাটতে অইবো, সোলেমান চৌধুরীর নিরুজ্জ্বল চোখের নিচেও একটা বাঁকা উপত্যকা, সেখানে দৃষ্টি রেখে শিখা শোনে - আর তুমি অইলা গিয়া অহন তোমার মায়ের বড় পোলার ল্যাহান তাইনা? কি কন বুবু? সোলেমান চৌধুরী শিখার আম্মার দিকে সমর্থন চায়, তার উদ্যত ছোবলের মতো মুখ আরো অন্তরঙ্গ হয়ে আসছে। পাশেই মইনুর প্রায় অচেতন দেহটা শোয়ানো। শিখা তিন-চার হাত দূরে থেকেই উত্তাপ পায় - ভাইয়া, তোমার জ্বর, তুমি জ্বরে পুড়ে মর। মরে যাও। আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না, তুমি কি কিছু বুঝতে পারো? দেশ স্বাধীন হয়েছে তুমি জানো? সোলেমান চৌধুরীর অস্তিত্ব আবার চেতনা ফিরিয়ে আনে: বাইরে শুধু মানুষের চেঁচামেচি হৈ হুল্লোড়, ধাতব পতনের মতো ভারী আর বিষণ্ন হয়ে থাকে।

রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি

আপনারা চাল ছাড়বেন? — এই প্রশ্ন উপস্থিত মানুষজন, চেয়ার, টেবিল, আলমারী, দরজা-জানালা ভেঙে দেয়। প্রান্তর থেকে ছুটে আসে তাতারের একশত অশ্বারোহী, তাদের ঘোড়ার খুরের ঠকাঠক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি দীর্ঘতর হয়, যেন এই শব্দমালাও বল্গাহীন, কিন্তু আক্রমণকারীর মতো ভয়ানক - সেও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওই প্রশ্নের কাছে। অথচ তখনো দরোজার সামনে শিখা আর তার ছোট বোন অনুতাপে জ্বলছে, ছি: ছি: আমরা কি বল্লাম। যদি ওরা রেশনের চাল না ছাড়ে? কিংবা অন্য কারো কাছে বেশী দামে বিক্রি করে দেয়। মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হয় শিখার। কেন, কমলকে একা পাঠালে চলতো না? শুধু তো জিজ্ঞেস করেই আসবে - রেশনের চাল ছাড়বে কি না, তাহলে রেশনের দামে আমরা চাল কিনে নেব। জানিইতো ছাড়বে না। কেউ কি এখন চাল ছাড়ে! বাইরে এখন চালের সের আট টাকা। আর বাইরে লোকজন অবিশ্রাম ডাকাডাকি করে যাচ্ছে : চাল দিবেন, চাল।... আর সেখানে...

কিন্তু ঘরের ভিতর একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন - এক মিনিট নিধারিত নিস্তব্ধতা শেষে কঠিন বরফ যেন ভাঙতে থাকে, শাদা আলোর মধ্যে সেই প্রতিমার মতো মুখ কাছে চলে এলো।

—ও, তোমরা বুঝিওই বি ব্লকে থাকো?

— জি।

— তোমাদের কথাই বলছিলেন আমাদের সাহেব। তা' তোমাদের বাবার কোন খোঁজখবর পেলে?

তন্দ্রার ভিতর চলে গেলে, যেভাবে দূরের শব্দ শোনা যায়, স্কুলের শেষ ঘন্টাধ্বনি -

কিংবা বাসের সচকিত হর্ণের মতো। মানুষ একবার কেঁপে ওঠে, স্খলিত তন্দ্রার স্রোতে ঢেউ ওঠে, সে দু'হাতে গাছের ডাল যেন আঁকড়ে ধরতে চায়।

— রেডক্রসের মাধ্যমে নাকি অনেকে পাকিস্তানে যোগাযোগ করছে। তোমরা একবার চেষ্টা করলেইতো পার।

অন্যান্য মানুষরা যেরকম প্রশ্ন করে, এই মহিলাও অবিকল একই রকম কথা বলছেন। শিখা আঘাতটা সহ্য করে, আমাকে আরো অনেক উত্তর দিতে হবে - কারণ আমাদের চাল দরকার। রেশনের চাল ছাড়লে কিনে নেব। সে আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়ায়: আমরা চেষ্টা করছি, আব্বার ঠিকানা নাকি বদলে গেছে।

— তোমার আব্বা ওখানে কি করতেন?

শিখা নুয়ে পড়ে। মাপ চাইবো নাকি? আমাকে মাপ করে দিন, আমি আর কোনদিন আপনাদের বাড়িতে চাল চাইতে আসবো না। আমরা তো ভিক্ষা করি না, শুধু রেশনের দরে চাল কিনতে চাই - এইসব কথা যখন সে বলবে, তখন দেখলো ঘরের মধ্যে তিন চার জোড়া চোখ অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। শিখার পরনে খয়েরী কামিজ, পাজামা, কোকড়ানো চুল, স্পঞ্জের স্যাণ্ডেলের সামনে ক্ষয়ে যাওয়া অংশ থেকে বুড়ো আঙুল মাটি স্পর্শ করে।

ইস, এই যুদ্ধ কত ক্ষতি করলো মানুষের। আল্লারে, আমিতো ভাবতেই ভয় পাই। মহিলা একটা হাই তুললেন এই ফাঁকে। কয়টা দিন যে কি গেলো মানুষের ওপর দিয়ে। বেঁচে থাকাই একটা ঝামেলা ... এখন আবার শুনছি ১০০ বিঘার বেশী নাকি জমি রাখতে দিবে না, আমাদের অবশ্য চিন্তা নাই, ছেলেমেয়েদের নামে ভাগাভাগি করে দিব। তোমার খালুজান বললেন....

ওই বাড়িতে আগে কখনো আসেনি শিখা। মোজাইক করা মেঝের ওপর ঠান্ডা অনুভূতি তাকে নিয়ে খেলছে। পেছন থেকে মিলির ছোট্ট হাত ওর কাপড় ধরে টানে, ফিশফিশ করে বলে: আপা চলো যাইগা, ওরা চাল দেবে না। শিখা তখনো বুঝি সম্পূর্ণ হতাশ হয় নি, ভদ্রমহিলার উৎসাহী দৃষ্টির সম্মুখে সে অন্যমনস্ক হবার ভাণ করে।

— তা' তুমি এখন কোন ক্লাশে পড়ছো?

— জি? না-মানে আমি এবার ম্যাট্রিক দেব। কিন্তু খালাম্মা....

— ও তা' ভালো। তোমরা কয় ভাইবোন?

— আমরা এক ভাই, তিন বোন। কিন্তু খালাম্মা ....

— তোমার বড় ভাইকে দেখি না যে...

—ওর অসুখ। কিন্তু খালাম্মা আপনারা চাল ছাড়বেন?

মুহূর্তে বিমর্ষ হয়ে যায় মহিলার মুখ। আর বোলো না মা। সাত আট টাকা চাল বাইরে। কেউ কি রেশনের চাল ছাড়ে, বল?

ভালবাসাবাসি শুধু ছুঁয়ে দেখা বস্তুর গঠন

ফিরে আসার সময় রোদ থেমে থাকে মাথার ওপর। আর, কম্যুনিটি সেন্টার যেখানে বোমা পড়েছিলো, তার ভাঙা ঘরদোরের সামনে একদল তরুণ আড্ডা দেয়। ফেব্রুয়ারির বাতাসে ভর দিয়ে বেঁচে থাকা শীত তখন উড়তে উড়তে এলো। শিখার চারপাশে চোখ আর

চোখ; হাওয়ায় মানুষের উল্লাস, মোটর গাড়ির হর্ণ, রুটি-বিক্রেতার হাঁকডাক পাশাপাশি জড়িয়ে যায়। দূর থেকে বুঝি শ্লোগানের শব্দও আসে। আর দু'একটা বাসায় ঘুরে গেলে হয় না, শিখা ভাবতে থাকে। কে জানে কোন বাসায় রেশনের চাল নেবে না। একটা স্টেশনারী দোকানে ন্যায্যমূল্যে টিনের দুধ দিচ্ছিলো, তার সামনে দিয়ে যাবার সময় বিশাল একটা লাইন পথ রোধ করে দাঁড়ায়। লাইনটা ক্রমশ: একেবেঁকে যাচ্ছে, কালো কালো সব বিশালদেহী মানুষের দেহ, একটার পর একটা সাজানো, কিলবিল করে নড়ে। তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তীব্র শিসের ধ্বনি, উড়ন্ত চুমুর শব্দ এসে লাগে শিখাঁর বিশ বছরের যৌবনে। তখন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি মানুষ ভুলে গেছে, ন্যায্যমূল্যের দুধ পাবো কি পাবো না জানিনা, কিন্তু একটি মেয়েমানুষের উপচানো লাবণ্যের কাছে নতজানু হয়ে যায় কঠিন জীবন যাত্রা এবং শিখা মাটির দিকে তাকায়, দ্রুত পা ফেলতে থাকে, যেন ব্লাডহাউণ্ড কুকুর তাড়া করছে তাকে।

— আপা, এ্যাই আপা, তোকে ডাকছে। শিখার তন্ময়তার মধ্যে কড়া নাড়লো মিলি।

— কে?

— ওই যে, ওই ছেলেটা। মিলি যেদিক আঙুল দিয়ে দেখালো সেখানে একটা লম্বাচুলের গোফদাঁড়িঅলা ছেলে, হোণ্ডা মোটরসাইকেলের ওপর বসেছিলো। শিখা তার দিকে তাকাতেই সে কাঁধ থেকে কারবাইন নামায়, স্যুটের নীচে ছেলেটার সমস্ত অবয়ব ঝকমক করে। শিখার ভিতর একরাশ ভয় আবার ডালপালা মেললো - কে? তুমি কে? আমাকে ডাকছো কেন? — সেই গোঁফদাড়িঅলা ছেলেটার দিকে আর তাকানো যায় না।

বড় রাস্তার মোড়ে একটা বি.আর.টি.সি.-র বাস এসে থামে, জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেখানে — একজন শন-পাঁপড়ি-অলা ডাকতে ডাকতে যায়। মোটর সাইকেল রেখে ছেলেটা এগিয়ে আসে —'এই যে কি খবর, আমাকে চিনতে পারছেন তো?' ছেলেটার হাতে কারবাইনের ফুটো অদ্ভুত সুন্দর দেখায়, একটা লজ্জাময় হাসি তার চোয়াল বেয়ে নামে। এক সেকেণ্ডে শিখার চোখের মণি দুটো বিবর্ণ হয়ে আসে। মগজের প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্র ঘুরতে থাকে যেন, পুকুর-ধারে শ্যাওলায় পা হড়কে পড়ে যাচ্ছে সে, পড়তে পড়তে দেখলো, কি একটা মাছ একবার মুখ দেখিয়েই ডুব দেয়। শুকনো পাতার শব্দ এলোমেলো করে দেয় স্মৃতি ও বাস্তব। তার মধ্যে শিখা একা একা, গাছের ডালপালা সরিয়ে একটা মুখ উঁকি দিলো— এ্যাই। বাতাস উদাস হয়ে আসে, আর চেকচেক লুঙ্গি পরা সেই ছেলেটা দাঁত বের করে হাসে: শিখা তুমি সাঁতার জানো না? কিন্তু এখন এখানে এই মহম্মদপুরের রণক্ষেত্রে যে ষ্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে, তার অবয়বে মুক্তিবাহিনীর সাজপোষাক, লম্বা চুলের বিদ্রোহ, এই সব কিছুর দিকে তাকিয়ে শিখা আস্তে আস্তে বলে, আবিদ ভাই?

বড় রাস্তার মোড়ে বাসটা ছেড়ে দিলো, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পিছনে তখনো দু'একটা মানুষ ছুটছে - সেদিকে পিছন ফিরে আবিদ বলে - কেমন আছ? বহুদিন পরে আজকে আর তুই করে বলা হয় না। শিখা অস্পষ্ট হেসে উত্তর দেয় খোঁজ করে, 'এই এক রকম'। তোমাকে সাবধান করতে এলাম - আবিদ মারণাস্ত্রটা অদ্ভুত কায়দায় হাতবদল করে, অনেকটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। কাল দেখলাম, তোমাদের বাসা থেকে সোলেমান চৌধুরী বেরুচ্ছে। ও সব লীগ

ফীগের নেতাদের সাথে সম্পর্ক না রাখাই ভালো। জানো তো - আবিদের কণ্ঠস্বর আরো গাঢ় হয়ে আসে - জানো তো রেভ্যালিউশনের পরে কাউন্টার রেভ্যালিউশন হয়, তখন ওদের পাত্তাও পাবে না। ছবিগুলো যতক্ষণে জোড়াতালি দেয়া যেতো, তারও আগে শিখা জ্বলে ওঠে — তার মানে? কি বলছেন আপনি? চারপাশে ততক্ষণে অনেকগুলো কৌতূহলী মানুষ এসে গেছে, সে-সবের অস্তিত্ব এখন ব্যাপক হয়ে এলো। শিখা ভিতরের দুর্বোধ্য উত্তেজনাকে দমন করে বললো: আমাদের থাকার জায়গা যে নাই জানেন? আপনি আমাদের সাহায্য করবেন? তা'হলে বাসায় আসবেন কিন্তু।

'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না' — শিখার চোখের ভিতর চোখ রাখলো আবিদ, অনেক গভীরে। কিন্তু শিখার মুখ রক্তহীন হয়ে আসছে, তুমি কত নম্বর পুরুষ!— এইবার সে আবিদকে অস্বীকার করবে —এই ভেবে সে নিজেকে আবার দোকানে সাজানো পুতুলের মতো করলো। ওর পায়ের ডিম খুব শক্ত হয়ে গেছে। তখন আবিদ বলে — সরকার থেকেই তো তোমরা একটা বাড়ি পেতে পারো। সেখানে ওই সব নেতারা কি করবে? বক্তৃতার মতো মনে হয়, পর্যায়ক্রমে আরো চলবে, হয়তো একটু পরেই বলবে, এ দেশের রাজনীতি... শিখার পায়ের নিচে কঠিন কংক্রিট অসহ্য লাগে। 'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?' আরেকবার এইকথা বলে চেয়ে দেখলো আবিদের পরোপকারী দৃষ্টি এখন সম্মোহিত, তার বুকের উন্নতি দেখছে - তুমি কত নম্বরের পুরুষ।

ফিরছে যখন, শিখা ভাবলো, অন্য একটা বাড়ি দেখে যাই — যদি কেউ রেশনের চাল ছাড়ে।

প্রবাহিত মনুষ্যত্ব : কে কাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চায়

দু'টো লাশ শুয়েছিলো বাস স্ট্যাণ্ডে, আর তার পাশে তিন চারটে কঙ্কাল ধুমসে রোজগার করে চলেছে। কতগুলো লোক এসে দেয়ালে পোষ্টার এঁটে দেয় — সেদিকে কেউ ভ্রুক্ষেপও করে না। ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে মুক্তিবাহিনীর স্থানীয় অফিস ছিলো; এখন যুবলীগের অফিস। সেখানে থেকে এ্যামপ্লিফায়ারে আশা ভোঁসলের সঙ্গে অনেকে কণ্ঠ মেলায় : দম মারো দম - হরে কৃষ্ণ হরে রাম। সোলেমান চৌধরী কেবল আস্তে আস্তে বলেন — বুঝলানি সময়ডা এমুন হইছে, লাগে জানি মানুষের শুধু পরব আর পরব। আরে ব্যাটা এতগুলিন মানুষ মরলো, একটু রোনাজারি কর। তা' করব না, পাড়ায় পাড়ায় খালি মাইক বাজায়া গানা হুনে।

রেডক্রসের একটা শাদা গাড়িতে বসেছিলো সোলেমান চৌধুরী - তার পাশে শিখা। ড্রাইভার আসতেই গাড়িটা ছেড়ে দেয় আর সোলেমান চৌধুরী একটা সিগারেট জ্বালিয়ে আরম্ভ করে - 'এই গাড়িটা অইলো র‍্যাডকরসের, বুঝলানি মাইয়া, তা আমরাও অইলাম গিয়া নেতামানুষ, আমাগো কামে লাগলে সরকার থেইক্যাই দ্যায়। আর আমাগো কামতো মানুষেরই কাম বুঝলা না?' বেমক্কা একটা কাশি আসে চৌধুরীর, তার বিশাল উদর কাঁপতে থাকে দমকে দমকে।

গাড়ির মৃদু কাঁপুনির মধ্যে ওরা দৃশ্য পরিবর্তন করতে করতে শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের সামনে অজস্র মানুষ, তাদের যেন কোন রাগ নেই, হিংসা নেই,

চিৎকার নেই। কতগুলো সেপাই চানাচুর খায়, আর বাদাম ভাঙে - বিদেশী সাংবাদিকদের হাতে ফ্লাশগান জিনসের প্যান্টের সঙ্গে কেমন মানানসই। আর মুজিবকোট-পরা লোকগুলো ছোটাছুটি করে, গাড়ি পার্কিং -এর জায়গায় একটা যায়, একটা আসে। এর মধ্যে সোলেমান চৌধুরী একবার হাত রাখে শিখার কাঁধে, খুব স্পষ্ট এবং সংকুচিত: তগো সব পরবলেমের কথা খুইলা কইবি। বঙ্গবন্ধুর কাছে কইলেই হয়। চৌধুরী দু'একজনের সঙ্গে হাসি বিনিময় করে, 'দ্যাশের নেতা একখান।' কারো চোখে শেষ রোদ এসে পড়ে। দেয়ালের সাথে মানিপ্ল্যান্টের বিকশিত শরীর শিক বসানো জানালার দিকে উঠে যাচ্ছে।

পায়ের সঙ্গে পা ঠক-ঠক করে বাজে, ত্রস্ত আবহাওয়ার মধ্যে শোনা যাচ্ছে মানুষের স্বর : ইণ্ডিয়ান আর্মি চইলা গ্যালে, দেয়ার মাষ্ট বি এ গ্যাপ ... উই ডোন্ট বদার ফর দি রিকগনিশন অব পাকিস্তান ... ভুট্টো শালাও যাবে, শালা একটা জোকার। ফশ্ করে কে যেন লাইটার জ্বালালো কানের কাছে, তীব্র আলো ছিট্‌কে আসে - শিখা মনে মনে বললো, তাহলে আমি আবিষ্কারের কাছাকাছি এসে গেলাম! তিনটে প্রসঙ্গ মোটামুটি মুখস্ত ছিলো— আব্বার খবর পাওয়া যাচ্ছে না, বিহারীদের বাড়িটা আমাদের দিতে হবে, আর কিছু টাকা সাহায্য ... মুখের ভিতর লালা জমাট বেঁধে যাচ্ছে। আম্মা তুমি কেন সঙ্গে এলে না?

একজন একজন ক'রে ভিতরে যায়, শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে, হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে আবার। স্বাধীনতার স্বাদই আলাদা - কে যেন টেবিল চাপড়ে দিলো। এহ... এতোগুলো ফরেনকারেন্সী পুকুরে ডুববে? কেন ডুববে? একটুখানি বিশ্লেষণ করতে থাকে শিখা। এই সময় সোলেমান চৌধুরী শিখার কানের কাছে ঠোঁট আনে - 'অহনই আমরা ভিতরে যামু' - ঝপ ক'রে একবার কলজেটা লাফিয়ে ওঠে। আবার লোকগুলো চিৎকার দেয় : বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ। সোলেমান চৌধুরীর সিল্কের পাঞ্জাবীতে হাত রাখে শিখা।

— এই যে সোলেমান - কি খবর তোমার? বিস্তৃতভাবে হাসতে হাসতে শেখ মুজিব পাইপটা রাখলেন টীপয়ের ওপর।

— মুজিব ভাই, আপনার কাছে অরে লইয়া আইল্যাম। সোলেমান চৌধুরী একটু কুঁজো হয়ে আসে, শিখার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলে — অর বাপে পাকিস্তানে আটকা পড়ছে, অহন থাকনের জায়গা নাই...

চেয়ারের ওপর ভয়ানক নড়ছিলো শিখা, শেখ মুজিবের চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটো আর দেখা যায় না, কিন্তু শিখার মনে হলো জ্যামিতির ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্রের মতো কিছু হিজিবিজি... ঘরের অন্যান্য মানুষগুলো শুনছে কথাবার্তা, শিখার মনে হলো সে এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি — কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, জীবনটা একটা স্বপ্ন নয়? ভীষণ শীত করে রোমকূপে, ঘরের মধ্যে মায়াবী আলো, এবং সোলেমান চৌধুরী বলতে থাকেন, অরা আমাগো পুরানা সাপোর্টার, মাগার যুদ্ধ অগো বহুত মুছিবতে ফালাইছে।

আহা হা, তাতো হবেই, একটা দেশের স্বাধীনতা কি কম কথা? আমি তো ছিলাম না, এখন জানতে পারছি দেশের জন্য তোমরা কি-না করেছো। বঙ্গবন্ধুর স্বরতরঙ্গ সমস্ত ঘরের মধ্যে বাজতে থাকে; শিখা ভাবলো এই মুহূর্তে সে একটা ইতিহাসের মধ্যে চিহ্নহীন হয়ে পড়ছে। গতরাতের সমস্তক্ষণ তার ঘুম হয়নি, এখন স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরে নিরীহ অবসন্নতা

নেমে আসে।'ওদের সুখে রাখতে পারছি না, আমি যে কি কষ্টে আছি, তা কি কেউ বোঝে ভাই।' এই বলে শেখ মুজিব শিখার দিকে তাকালেন 'তোমরা রিলিফ পাচ্ছো তো! ওই বেঈমানগুলো সবকিছু লুটপাট ক'রে নেয়, আর আমার দেশের লোক—।

কোথাও টেলিফোন বেজে ওঠে, পারিপার্শ্বিকতা ভেঙ্গে যায়, কে যেন একটা লোক এসে শেখ সাহেবের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলে, সবাই সে দিকে তাকায়। 'এখুনি যাবে কেন আর একটু বসো' — শেখ মুজিব যেন অজ্ঞাতসারে এই কথা বলেন, তারপর আবার আলাপচারী হলেন। তখন ইতিহাসের বই-এর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে শিখা আর ইতিহাসের লোকজন চারপাশে আমার ... শেখ মুজিব আবার পাইপে আগুন ধরালেন; খানিক নীরবতাকে সবাই উপভোগ করে এবং এক সময় সন্ধ্যা শেষ হয়ে আসে, লাইট জ্বলে ওঠে ঘরের ভিতর।

অন্ধকারকে ফলাফলা করে কেটে জিপটা এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতো তগো হইয়া গেলো, অহন। শিখার ডান হাতটা সোলেমান চৌধুরীর মুঠোর ভিতর কৈ-মাছের মতো লাফায়। ইলেকশনে কিন্তু তগো খাটন লাগবো। শিখা অগোছালো শরীরটা সামলে নেয় - নিশ্চিতভাবে তার ভিতরে কোথাও ঘন্টাধ্বনি বাজছিলো, বিমান আক্রমণের সতর্ক সাইরেনের মতো, একটানা? না, থেমে থেমে?

শিখা যখন বাসায় ফিরছে, ল্যাম্পপোস্টহীন রাস্তায় তখন কারো অবয়ব টলোমলো অথচ আশেপাশের দোকান থেকে হালকা আলো আসে ভাসতে ভাসতে, এবং সেই অবয়বকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়। শিখা তখন দ্রুত পায়ে বাসার দিকে যাচ্ছে, মুখোমুখি হলে তমসা কেটে যায় এবং প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ও দুর্বিনীত স্বর আসে 'আবারো', তবু একজনের বুকের ভিতর থেকেই বের হয় এবং অন্যজনের বুকের ভিতর যেয়েই লাগে। 'হ্যাঁ, আবারো, শিখার পায়ের ডিম সাজানো পুতুলের মতো স্থির, আর সে উত্তর দেয় — আপসোস হচ্ছে। আপনি কত নম্বরের পুরুষ! শুনুন, আপনি ওদের মতো উপকার করতে পারবেন না, কোনদিন, সুতরাং...।

বিশ্বভারতীর উৎস-সন্ধানে

অরুণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগৎ ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন শাখায় বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, একথা আমরা সবাই জানি। আরও জানি যে, সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাচিন্তা তাঁর আজীবন সঙ্গী ছিল। একথাও অনুমানসাধ্য যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বাল্যকালের বিতৃষ্ণার অভিজ্ঞতাই তাঁকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অসার্থকতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করে রেখেছিল। এক দিকে তিনি যেমন যৌবনের প্রারম্ভ থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা দেন, বন্ধুবান্ধবকে চিঠিপত্রে মতামত জানান, অন্য দিকে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করে ফেলেন প্রকৃত অর্থে মানুষ তৈরি করার জন্য। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় নামে সে আদর্শ বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ সালে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে। তারপর এই আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিবর্তনের বাকি ইতিহাস সে যুগের দাবির কাছে অনেকটা আপোস করে চলার ইতিহাস। বালক বয়সি সব ছাত্রদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার পথে নানা বাধার ফলে তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয়ের এ রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের মন:পুত ছিল না আদৌ। তিনি সখেদে বলেছেন, 'শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তা থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত.... সেই জন্য এখানকার বিদ্যালয়টিকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল।' ফলে প্রাচীন ভারতের তপোবনের অনুকরণে শিক্ষার আদর্শ শিথিল হয়ে পড়েছিল। এর পরে পাই অন্য এক রবীন্দ্রনাথকে।

।। ২ ।।

এ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও দৃষ্টি তাঁর হাতে তৈরি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বের দিকে ধাবিত হতে শুরু করেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দেশাত্মবাদী চিন্তার স্বল্পকালীন শরিক থেকে তিনি একদিকে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, এ আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের আন্দোলন, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়কে নিয়ে এ সর্বাত্মক আন্দোলন নয়, অন্য দিকে ব্রিটিশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর শাসক-শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে যে স্থূলতা রয়েছে, হৃদয়হীন যান্ত্রিক সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। এ উপলব্ধি তাঁকে প্রাচ্যের সঙ্গে আঙ্গিক সম্পর্ক স্থাপন এবং এ দুই ভূখণ্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক চেতনার মিলনের প্রয়োজনবোধের আগল খুলে দিয়েছিল। তাঁর এই নতুন চিন্তার লিখিত রূপ পেল ১৯০৮ সালের ১২ আগস্ট তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্র সমাজের অধিবেশনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামের প্রবন্ধটি পাঠ করার সময়ে। তাতে তিনি ভারতবাসীদের উদ্দেশে বললেন, 'আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ব প্রকাশ পাইবে যাঁহারা নবযুগের প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনের বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব-পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা

লাভ করিবে।... কাণ্ডজ্ঞান বিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে' আঘাত করতে চেয়ে ইংরেজ মনীষীদের শ্রেষ্ঠ অবদান আমরা লাভ করতে পারব না। তিনি আরও বললেন 'যখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজ রাজের সহযোগী হইবে, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতে হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ পাইবে না।' এ হল 'ভারত পথিক' রামমোহন রায়ের প্রকৃত উত্তরসূরীর উপযুক্ত ভাবনা।

এর পর শুরু হল রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরম স্মরণীয় গীতাঞ্জলি পর্ব, তার গানগুলির ইংরেজি অনুবাদ এবং তার পাণ্ডুলিপিসহ লন্ডন অভিমুখে সমুদ্র পাড়ি ১৯১২ সালের ২৭ মে তারিখে। ১৬ জুন লন্ডনে পৌঁছে তার পরের দিন ইংলন্ডের বিদ্বৎমন্ডলির অন্যতম পুরোধা রোদেনস্টাইনের বাড়িতে গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিসহ তাঁর উপস্থিতি ও সাক্ষাৎকার থেকে শুরু করে তাঁর নোবেল পুরস্কার বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসের বর্ণনা ও বিতর্ক অনেকের লেখায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি অনুবাদ করেন তখন তার জন্য নোবেল পুরস্কারের স্বপ্ন তাঁর চোখে ছিল না, তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনার রসে সিক্ত, জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যের উপলব্ধি, তাৎপর্য ও মাধুর্য দিয়ে ইংলন্ডের বিদ্বৎসমাজের হৃদয়কে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল — ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের কাছে তাঁর কবিতা খুবই সমাদর লাভ করেছিল, তাঁর নাটকের অভিনয় অভিনন্দন লাভ করেছিল, তাঁর বক্তৃতা, আলোচনা প্রশংসা পেয়েছিল এবং তাঁর সৌম্যমূর্তি, অভিজাত রুচি ও মার্জিত ব্যবহার তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। এই প্রথম একজন ভারতীয় কবি ভারত-আত্মার মর্মবাণী পাশ্চাত্যের সুধীজনের কাছে নিজ কণ্ঠে উচ্চারণ করে সম্বর্ধিত হন। এ যেন প্রতীচ্যের গলায় প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সূতোয় গাঁথা প্রথম পরিচয়ের বরমাল্য, উত্তরে রবীন্দ্রনাথের গলায়ও পড়ল প্রতীচ্যের নোবেল প্রাইজের বিজয়মাল্য, খুলে গেল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আত্মিক মিলনসেতুর সূচনা পর্ব, যেটা রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাম্য ছিল।

।। ৩ ।।

এর মধ্যে কয়েকবার বিদেশভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখে এসেছেন — একদিকে পশ্চিমের জড়, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট, অন্যদিকে জাতিতে জাতিতে প্রবল সংঘর্ষ। তাঁর নোবেল পুরস্কার বিজয়ের পরের বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় — হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী কেঁপে ওঠে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার মিলন, বিশ্বজ্ঞানের সমন্বয়, ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব নিয়ে তাঁর বহু লালিত স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। জাতিতে জাতিতে অসহিষ্ণুতা, অন্ধ বিরোধ, বিধ্বংসী সংঘর্ষ তাঁর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃের চিন্তাকে প্রবলভাবে আঘাত করে। তিনি বুঝতে পারেন, এ বিধ্বংসী পশুশক্তির পেছনে আছে উগ্র জাতীয়তাবাদের অন্ধ আস্ফালন ও মানুষের আত্মিক বুদ্ধিশূন্য জড়বুদ্ধি। তবু তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির শেষের দিকে শান্তিনিকেতনেই তাঁর সে স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথা ভাবলেন : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র করে তুলতে হবে - ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে — স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে

আসছে - ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।'

।। ৪ ।।

দেশে দেশে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও মনুষ্যত্বের মূল্য রহিত আত্মিক দীনতাই যে বিশ্বযুদ্ধের কারণ এ কথা তিনি এ যুদ্ধের অন্যতম অংশীদার দেশ খোদ আমেরিকার বিদ্বৎসমাজে যুদ্ধকালীন সময়ে The cult of Nationalism নামের প্রবন্ধ প্রতিবাদী ভাষায় পাঠ করে শোনান। এর আগে জাপান ভ্রমণ কালেও তিনি সে মতামত ব্যক্ত করেন। এ দু'দেশেই তার এই মানবিক চিন্তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি তাঁর সংকল্পে অটুট, জানালেন, 'ঐ জায়গাটিকে (বোলপুরের প্রান্তর) সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলবে এই আমার মনে আছে — সর্বমানবের জয়ধ্বজা এখানে রোপন হবে।' সে সংকল্প অনুসারে 'শিশু বিভাগের ঘরগুলির পেছনের মাঠে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হইল — ৮ই পৌষ ১৩২৫। অনেক বৈদিক আচারাদি অনুষ্ঠিত হইল। ভিত্তির জন্য যে গর্তটি কাটা হইয়াছিল, মন্ত্রপাঠান্তর পরে কবি তাহার ভিতর আতপতণ্ডুল, জল, কুশ, ফুল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলেন। বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি-স্বরূপ গর্তে মৃত্তিকা দিলেন। কবি তাঁর কল্পনার বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বুঝেছিলেন, বর্তমান কালে পৃথিবীময় জাতিগত বিচ্ছিন্নতা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা দেশ ও বিদেশের মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করে গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। তাই এ বিষয়ে প্রচারকর্মটি খুব জরুরি। তাই তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে দেশে-বিদেশে এর প্রচারকার্যচালিয়ে গেছেন। এমন কি কলকাতার বিদ্বৎসমাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসুবিজ্ঞান মন্দিরে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর। ৬ পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) সালে শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে এই যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ প্রায় সকলেরই জানা, এও জানা যে, ১৯১৯ সালে মাদ্রাজে Centre of Indian Culture শীর্ষক বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য, কিন্তু যে তথ্যটি খুব বেশী জানা নেই সেটি হল পশ্চিমের বিদগ্ধ সমাজের হাতে দেওয়ার জন্য একটি আবেদন-পত্র যেটি তিনি নিজে তৈরী করেন, নিজের স্বাক্ষরসহ শিরোনাম দিয়েছিলেন, " The Appeal for an International University."

।। ৪।।

সে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১- এই এক বছর তিন মাস রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘতম বিদেশভ্রমণ। এ ভ্রমণের দেশগুলি ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, নেদারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং আমেরিকা। যাত্রার আগে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন-পত্র তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে

গিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ঐ সব দেশের বিদগ্ধ সমাজের কাছে শান্তিনিকেতনে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব ঐ আবেদন-পত্রটির মাধ্যমে পেশ করা। এর মধ্যে উল্লেখ ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ; সে দ্বন্দ্বের নিরসনের উপায় ও দুই গোলার্ধের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে যে একটি আন্তর্জাতিক চর্চাকেন্দ্র দরকার তার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের সকলকে অবহিত করা এবং তাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করা। যদিও ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি কয়েকজন বিদেশী মণীষীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন, তবুও প্রথম মহাযুদ্ধের জাতিগত বিধ্বংসী সংঘাত ও অনৈতিক বিভেদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভব করেছিলেন। তার সেই আবেদন-পত্রটি বঙ্গানুবাদে এখানে উপস্থাপিত করা হল।

।।৫।।

একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন

বর্তমান বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতিতে আশা ও প্রতিশ্রুতির যে স্পষ্ট লক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে তা হল এশিয়ার জাগরণ। এই মহাজাগরণকে যদি যথার্থ পথে চালিত করা যায় তাহলে শুধু এশিয়ার পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে এটা বড় আশার কথা হবে।

অপর দিকে একথাও স্বীকার্য যে, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে এবং তা দু'শতাব্দীর ধরে ঘটছে, যা এ দুয়ের সমঝোতা থেকে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখছে না, তা এক সার্বিক সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। ফলত এ চাপ ও অস্থিরতা এশিয়াকে দারুণ অশান্তির মধ্যে রেখেছে এবং বিরোধের এক বিস্ফোরক শক্তি বছরের পর বছর সঞ্চিত হচ্ছে প্রাচ্যের মনের গভীরে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, কারণ এর সুযোগগুলো নিতে কেউ উৎসাহী নয়। বল প্রয়োগের দ্বারা প্রাচ্যের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আগ্রাসন তাদের মধ্যে এক নৈতিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে যা দুয়ের পক্ষেই সমান ক্ষতিকর। এমন অস্বাভাবিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্ভাবনাকে এতদিন ধরে উপেক্ষা করে আসছে প্রতীচ্যের মানুষেরা। কিন্তু তাদের এই আপাত অপরাজেয়তা বোধের ওপর এমন অন্ধ বিশ্বাসের ফলস্বরূপ এক শক্তির জাগরণ তাদের সুরক্ষা থেকে ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর আকস্মিকতায় ঠেলে দেবে।

কিন্তু এটা কোন বিপদ বা কারুর ক্ষতির সম্ভাবনার প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। দুই ভূ-গোলার্ধের মানুষের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন অনৈতিক বিচ্ছেদ মানুষের হীন আবেগ, তার অহংকার ও লোভকে প্রশ্রয় দেয়, অপরের সন্দেহ ও আত্মবিশ্বাস হীনতাকে বাড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীময় এক আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ঘটায়।

অতএব আমাদের সময় এসেছে যখন আমরা অবশ্যই আমাদের সমস্ত প্রজ্ঞা দিয়ে অবস্থাকে বুঝব এবং তাকে দৈহিক শক্তির প্রয়োগের চেয়েও শক্তিশালী নৈতিক বিশ্বাসের জোরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব।

মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ থেকে মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জনগোষ্ঠী তৈরি করা, একটি জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। কারণ প্রথম যুগে ব্যক্তিমানুষেরা একটা ভৌগলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিল এবং সে সব সংগঠন ঐক্য ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে জনগোষ্ঠি হয়ে বেঁচে ছিল। অন্যদিকে যারা নিজেদের মধ্যে অবিরাম হানাহানি; মারদাঙ্গা করত তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কালে যোগাযোগের সুবিধায় মানুষের ভৌগোলিক বাধা ভেঙ্গে গিয়েছে। মানুষেব যে মহামিলন সত্যকে আবিষ্কারের অথবা শেষ ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে, তা ব্যক্তিমানুষের মিলন নয়, বিভিন্ন জাতির মিলন। এখন আমাদের সামনে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা কোন একটি দেশের সমস্যা নয়, পৃথিবীর সমস্যা, যেখানে ব্যক্তিমানুষ নিয়ে জাতি একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের বন্ধনকে অবশ্যই খুঁজে নেবে। এটা নিশ্চিতভাবে আগের থেকে বৃহত্তর ঐক্যের, গভীরতর আবেগের এবং প্রবলতর শক্তির উপলব্ধির জন্ম দেবে। এখন, যেহেতু, সমস্যাটি বড়, সেহেতু এর বড় মাত্রা ভেবেই তার সমাধান করতে হবে, আরও বড় করে উপলব্ধি করতে হবে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, পরিকল্পনা নিয়ে পৃথিবীময় তাঁর জন্য মন্দির তৈরি করতে হবে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হল বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। যে সব ক্ষেত্রে ভোগবাদী শোষণের মনোভাব বিদ্যমান সেখানে এ কাজ সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য মিলনের এমন কোন ক্ষেত্র বেছে নেব যেখানে স্বার্থের সংঘাতের কোন প্রশ্ন থাকবে না। এর অন্যতম ক্ষেত্র হল বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মত সত্যকে আবিষ্কারের কাজে লাগতে পারি, সবাই মিলে আমাদের সাধারণ ঐতিহ্যকে পরস্পর বুঝতে পারি এবং উপলব্ধি করতে পারি এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা যে রূপসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন, বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের যে রহস্য আবিষ্কার করেছেন, দার্শনিকরা আমাদের অস্তিত্বের যে সমস্যা সমাধান করেছেন, সাধুসন্তরা তাঁদের জীবনের উপলব্ধ যে আধ্যাত্মিক সত্য উদ্ভাবন করেছেন সেগুলি কোন জাতির জন্য নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্য। আবহাওয়া বিজ্ঞান সর্বদা পৃথিবীর খবর রাখে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, কিন্তু তা এ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সত্যকে জানে। অনুরূপ ভাবে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, মানুষের মনের মহানুভবতা এক এবং তা যে বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে কাজ করে, তার মৌলিক ঐক্যের ফরপ্রসূতার জন্য সে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। যখন আমরা নির্মোহ হয়ে এই যে সত্যকে জানব তা মানুষেব সকল বিচ্ছিন্নতাকে সম্মান জানাতে সাহায্য করবে। তবুও আমাদের একত্বের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে, জানতে হবে যে ঐক্যের বিশুদ্ধতা অসমভাবের মধ্যে নেই, আছে সমভাবের মধ্যে।

এই হচ্ছে বর্তমান কালের সমস্যা। প্রাচ্য তার নিজের জন্য এবং জগতের জন্য কখনই অপ্রকাশিত থাকবে না। সকল ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের গভীরতর উৎসের মধ্যে আছে বোঝাপড়ার অভাব। কারণ যেখানে আমরা এসব বুঝব না সেখানে আমরা কখনই ন্যায়নিষ্ঠ থাকব না।

যে দায়িত্ব আজ সাধ্যানুসারে প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় সে দায়িত্ব বোধ করে

আমি ভারতে ছোট আকারের একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করেছি যেটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সবচেয়ে ভাল উপায় বলে আমার মনে হয়েছে। আমার পরিকল্পনা অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতীচ্য থেকে ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানাবে, ভারতীয় জীবনের যথার্থ-পরিবেশে বিভিন্ন ধারার ভারতীয় দর্শন, শিল্প ও সঙ্গীত নিয়ে চর্চা এবং গবেষণার কাজে ব্যাপৃত পণ্ডিতগণের সাহচর্যে গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করবে।

ভারতে নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতে জগতে তার অবদান রাখার জন্য সে তৈরি হচ্ছে। অতীতে ভারতে যেমন এক মহতী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তেমনি বর্তমান যুগেও সে সমভাবে অতীতের ভগ্নদশা থেকে উদ্ভূত নব বিশ্বের সংস্কৃতিতেও অবদান রাখতে পারে। এটা তার ইতিহাসের মূল্যবান সম্ভাবনাময় এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এক্ষণে প্রতীচ্যের তরফ থেকে নির্বোহ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তার যথেষ্ট নৈতিক মূল্য আছে যার স্মৃতি তার উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রাচ্যের অভ্যুত্থানকে শক্তি ও সৃজনশীলতার উন্নত করবে।

প্রতীচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের দেশগুলির সাধারণ সংস্কৃতির বিকাশে যে অবদান রেখেছে সে সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেয়। এই ভাবে প্রতীচ্যের মণীষী জগতের কাছে প্রতিভাত হওয়ার সুযোগ পায়। তার জন্য যেটা দরকার তা হল প্রাচ্যের ছড়ানো আলোকবর্তিকাগুলিকে একত্রিত করে তাকে সম্পূর্ণরূপে আলোকোজ্জ্বল করে তুলতে প্রাচ্যকে সাহায্য করা।

একটা সময় ছিল যখন এশিয়ার মহান দেশগুলির প্রত্যেকটি তাদের সভ্যতাকে নীরবে-নিভৃতে পরিচর্যা করেছে। এখন সমন্বয় ও সহযোগিতার যুগ এসেছে। যে চারাগাছগুলির পরিচর্যা এতদিন ছোট জমিতে হয়েছে তাকে আবার রোপন করতে হবে খোলামেলা জমিতে। যদি তারা সর্বাধিক মূল্য চায় তাহলে তাদের জগতের বাজারে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে হবে।

কিন্তু ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে এশিয়ার সহযোগিতার অবস্থা তৈরি হওয়ার আগে তাকে তার বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বিত কাঠামোটি তৈরী করতে হবে। যখন সে এমন একটি কেন্দ্রের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রতীচ্যের দিকে মুখ ফেরাবে তখন সে তার মুক্তমনের আস্থাশীল সচেতনতায় সত্য সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত গ্রহণ করবে, যা আসবে তার অনুকূলবর্তী যুক্তি থেকে এবং এভাবেই কৃতজ্ঞ জগতের কাছে নতুন চিন্তার আগল খুলে যাবে। অন্যথায় সে তার অমূল্য ঐতিহ্য-সম্পদকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবে এবং তার জায়গায় প্রতীচ্যের দুর্বল অনুকরণের চেষ্টা করে নিজেকে অগভীর, সস্তা ও হাস্যকর করে তুলবে। যদি সে তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হারায় তাহলে জগতের কি কোন উপকার হবে? এই ভয়ঙ্কর দেউলিয়া অবস্থা প্রতীচ্যের মনকেও কি জড়িয়ে ফেলবে না? যদি সমগ্র পৃথিবী প্রতীচ্যের এক অতিরঞ্জিত রূপ পায় তাহলে এ যুগের সীমাহীন ব্যঙ্গ শেষ হয়ে যাবে, নিজস্ব অসংগতির তলায় পিষ্ট হয়ে মরবে।

অতএব এটা আমার অভিপ্রায় যে, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করেছি তার অর্থভাণ্ডার বাড়িয়ে এমন সুযোগ বাড়িয়ে ফেলব যাতে সেমেটিক, এরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রাচ্যের সমুদয় সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এর উদ্দেশ্য প্রাচ্যের মননকে জগতের কাছে তুলে ধরা।

এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, প্রাচ্যের দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে প্রতীচ্যের মনে সবিকারের আগ্রহ জেগেছে যেখান থেকে তার সত্য ও সুন্দর সম্পর্কে নতুন প্রেরণায় অনুসন্ধান চলছে। একদা প্রাচ্যের হাতে প্রচুর সম্পদের সুখ্যাতি ছিল এবং অনুসন্ধানীরা সাগর পেরিয়ে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর থেকে সে সম্পদের বেদীর স্থান পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রাচ্যেরও যে জ্ঞানভাণ্ডারের সুখ্যাতি ছিল তা ছিল তার পিতৃপিতামহের সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল। এবং যখন, যেমন এখন, ক্ষমতা ও সম্পদের অনুসন্ধানের মধ্যে মানুষের সুতীব্র জ্ঞান ক্ষুধার তাড়না থেকে .... এক রব উঠেছে তখন যাদের প্রয়োজন তাদের দেওয়ার জন্য প্রাচ্যকে আরও একবার গর্বিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।

আমি আশা করি যে, এই প্রতিষ্ঠান এমন এক ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করবে যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মন সম্মিলিত হয়ে এক সাধারণ সভ্যতায় তাদের অবদান রাখবে। তাই এটিকে গড়ে তোলার জন্য প্রতীচ্যের মহাদেশগুলির সহযোগিতা হবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান। আমার ভাবনার মধ্যে এ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রতীচ্যের সকল বিশ্বপ্রেমিকের কাছে আবেদন রাখছি, তাঁরা এ অবস্থায় পৌঁছবাব সুযোগ দিন এবং তাঁদের হৃদয় প্রাচ্যের সাগর পেরিয়ে সহযোগীর ডাকে সাড়া দিক।

এই আবেদন-পত্রটির সঙ্গে আর একটি পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া ছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে এর আগেই ছোট আকারে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু করে দিয়েছিলেন তার মধ্যে তার নাম, ঠিকানা, স্থান, উদ্দেশ্য, ইতিহাস ও সাংগঠনিক কাঠামোর একটি রূপরেখা দেওয়া ছিল। তখন প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "শান্তিনিকেতন"। পৃষ্ঠাটির তলায় ছিল লেখা — 'The Rector, Santiniketan, India.'। ঐ বছরই বিদেশ-ভ্রমণ করে আবেদন-পত্রটি বিদেশে বিতরণ করে এবং সেখানকার পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে ২৩ ডিসেম্বর আম্রকুঞ্জের অনুষ্ঠানে তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি ঘোষণা করলেন — "বিশ্বভারতী"। সে অনুষ্ঠানে তাঁর লিখিত ভাষণটিও ছিল তাঁর সেই আবেদন-পত্রটিরই মর্মকথা।

।। ৬ ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে আবেদন-পত্রটি নিয়ে প্রতীচ্যের দেশে দেশে ঘুরলেন তার সমর্থনে বিদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল কিনা, না তিনি ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন তার কিছু সংবাদ-সূত্রের উল্লেখ করা যায় এখানে। তার প্রথমটি হল প্রখ্যাত ফরাসি মণীষী রোমাঁ রোলাঁর রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটি যেটি এখানে বাংলা অনুবাদে উদ্ধৃত হলো।

শুক্রবার, ২২ এপ্রিল ১৯২১

প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

আমি আপনার মহৎ আবেদন-পত্রটি পাঠ করেছি এবং এটি গভীরভাবে আমার মর্ম স্পর্শ করেছে। এটি আমার প্রিয়তম অভিপ্রায়কে প্রতিধ্বনিত করেছে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনার উদার মনের উদ্যোগকে আমি যথাসাধ্য সহায়তা দেব এবং আমি আপনার শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইয়োরোপে সমর্থকদের খুঁজে দেব। এমন কি আমি এ

আশা করি যে যদি আমার শরীর ভাল থাকে আমি সে সময়ে আপনার ওখানে যাব। দুর্ভাগ্যবশত: আমি ইংরেজি বলতে পারি না এবং ফরাসি সেখানে কেউ বুঝতে পারবে না; কিন্তু আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য ওখানে যেতে হৃষ্টমনে অপেক্ষা করতে পারি।

আমি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হয়েছি এবং আমাকে কয়েক ঘন্টা মঞ্জুর করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইগুলি আমার স্মৃতিতে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে থাকবে। আমার দু:খ হচ্ছে যে, আমি আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে সমর্থ হলাম না। কিন্তু আপনার দৃষ্টি ও উপস্থিতিতেও এমন একটা কিছু আছে যা মুখের ভাষাও ব্যক্ত করতে পারে না।

রোমাঁ রোলাঁ

বি: দ্র: — আপনি কি দয়া করে আমাকে পাঠাবেন —

(১) আপনার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আবেদন-পত্রের কয়েকটি কপি

(২) M. Boolwar -র ঠিকানা যেটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি তাঁকে নিশ্চয় লিখব যে তিনি মে মাসের শেষের দিকে সুইজারল্যাণ্ডে আপনার বক্তৃতার আয়োজন করতে পারেন কিনা।

উপরের এই চিঠিটি লেখার আগে রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছিল প্যারিতে — ১৯২১ সালের ১৯, ২১ ও ২ এপ্রিল, চিঠিটি লিখলেন ২২ এপ্রিল । এসব সাক্ষাৎকারের বর্ণনা পাওয়া যায় রোলাঁর দিনপঞ্জী- ভারতবর্ষ-এ। ১৯ এপ্রিলের ডায়েরিতে রোলাঁ লিখলেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন দেখা করতে। সঙ্গে তাঁর ছেলে। পথচলতি প্যারিতে দিন সাতেক আছেন... পরনে ভারতীয় বেশ, কালো ভেলভেটের উচু টুপি, আর ছাই রঙের এক লম্বা জোব্বা। তিনি খুবই সুন্দর, প্রায় অতিমাত্রায় সুন্দর— লম্বা, মুখখানা সুন্দর সুষম, খাঁটি আর্যজনোচিত, কিন্তু সেই টক্‌টকে রঙের, যা সোনালি রৌদ্রমাখা জীবনের দান, উজ্জ্বল বাদামী দুই চোখ - তাতে সুন্দর চোখের পাতায় ছায়া, খাড়া নাক, সাদা গোঁফের নীচে হাসিমুখ, রেশমের মত দাড়ি তিনভাগে ছুঁচলো, দুই সাদা ভাগের মাঝভাগ এখনো কালো। এক প্রচুর ও প্রশান্ত আনন্দ গোটা মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা প্রকাশিত হয়ে উঠছে তার প্রতিটি কথায়। তিনি শুধু ইংরেজিতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন... তাঁর চেহারা অনেকটা সেই প্রাচ্য ঋষিদের মতো। আনন্দের বিষয় তাঁর হাবভাব সহজশালীন, তিনি যা বললেন তা হৃদয়গ্রাহী ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি দেড় ঘন্টা রইলেন, হাসাময় ও বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীলতায়, মাঝে মাঝে চিত্রময় ভঙ্গিতে অনেক কথা বললেন।

'ভারতবর্ষে তিনি একটি এশিয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন, তিনি চান এশিয়ার সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় অধ্যাপকদের সেখানে নিয়ে যেতে এবং ইয়োরোপিয় ও এশিয় ছাত্রদের যোগাযোগ ঘটাতে। তাঁর মনোমুগ্ধকর বিনয় সত্ত্বেও বুঝতে পারা যায়, ইয়োরোপের চেয়ে সবার উপরে ভারতবর্ষের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সম্পর্কে তিনি দৃঢ়-প্রত্যয়। তিনি বললেন, ইয়োরোপ যেন এক দক্ষ কারিগর, একটা সুন্দর সঙ্গীতযন্ত্র বানিয়েছে। কিন্তু সঙ্গীত সৃষ্টি করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়, সঙ্গীত ভারতবর্ষের ভাগে। তিনি আরও বললেন, ভারতীয়

জনগণ বাস্তবে পরিণত করবে (সে সম্পর্কে তাঁর আশা দৃঢ়) আদর্শ শান্তিবাদ — যাকে বাকি পৃথিবী বৃথাই অনুসরণ করছে। কেননা এটাই জাতির যথার্থ সত্তা।'

২১ এপ্রিলের দিনপঞ্জিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি রোলাঁর মুগ্ধতার প্রকাশ, আলোচনার বিষয় করি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা। তিনি লিখছেন : 'রবীন্দ্রনাথ আমাকে ও আমার বোনকে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন ওতুর দ্য মঁদ-এ, তিনি সেখানকার অতিথি। .... এই চক্রের আবাসিক-সম্পাদিকা এবং পুরনো এক আবাসিক ছাড়া আমাদের এই ঘরোয়া দল। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছেলে, ছেলের স্ত্রী-ও ভ্রাতুষ্পুত্র।... আমি আবার তাঁর কথায় ও ভঙ্গির মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক হাস্যময় প্রশান্তি যার কখনো অভাব ঘটে না। তিনি কথা বলতে ভালবাসেন, কথা বলেন কি সাবলীল শান্ত ভঙ্গিতে, একটু উচু পর্দায় (সুরেলা), কিন্তু সব সময়ই সংযতভাবে। যখন তাঁর থামার সময় আসে তখন একেবারে থেমে যান। নীরবতাকে আড়াল করার চেষ্টা করেন না, যেমনটি আমাদের মধ্যে লোকে করে থাকে।... বাংলা দেশের বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতনে যে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন তিনি তাঁর কথা বললেন। তিনি ইয়োরোপে ঘুরছেন সহযোগিতায় ব্যবস্থা করতে। সামনের সপ্তাহে যাচ্ছেন স্পেনে; তারপর যাবেন সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আনুকূল্যের জন্য ছাপানো একটি আবেদন-পত্র আমার হাতে তুলে দিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে (সেমেটিক, আর্য ও মঙ্গোল প্রভৃতি) পুনর্মিলন করা, তাদের একটা সমন্বয় ঘটানো, এর সঙ্গে যুক্ত করা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে, যা সে সৃষ্টি করছে বিজ্ঞানে, দর্শনে ও শিল্পে। তাঁর চিন্তায় এটি 'এশিয়ার জাগরণকে' চালিত করার ব্যাপার। তাঁর মনে হয়েছে, ইয়োরোপীয় ভারতবিদরা - এমন কি প্রাজ্ঞজনেরাও ভারতবাসীর প্রকৃত চিন্তা উপলব্ধি করতে চরম অক্ষম। তিনি আমাদের তাঁর দুটো গান শোনালেন, যে দুটো গীতাঞ্জলির কবিতা; আমাদের আগেই জানিয়ে দিলেন যে, এগুলি পুরোপুরি রীতিসিদ্ধ রচনা নয়, কেননা ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি একজন প্রাচীনপন্থী নন।.. তিনি গান করলেন পায়ে তাল রেখে।.... আমি রবীন্দ্রনাথের হাতে আমার ' ক্লেরাঁচো' ও 'আনেদক্ত', দিলাম। 'চলে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শ্রীমতী পার্পেলের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিমন্ত্রণ করালেন। আমরা আসতে পারলাম না। আমরা বুলোঞ-এ ফিরলাম ২৬ তারিখে, তাঁর যাত্রার আগের দিন, এবং তাঁর ঘরে বসে শুধু তাঁরই সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হলো। আমার বোন এবারও মধ্যবর্তিনী। তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা এবং ইংলণ্ডের দিক থেকে তিনি কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন - প্রায় ঐ একটি বিষয় নিয়েই বলে গেলেন। সরকার অবিশ্বাস করে; ভারতীয় স্বাধীনতার কোন কেন্দ্রেই তার বিশ্বাস নেই; তাঁকে বাধা দেবার সব চেষ্টাই সে করেছে। আর যখন সরকারের অপপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর ভাবাদর্শ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ছে তখন তাঁকে সমর্থন করার ভান করছে, তাঁকে কুক্ষিগত করার জন্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রথমে বিরুদ্ধতা করে নষ্ট করার চেষ্টার পর এখন নষ্ট করতে চাইছে বদান্যতায়। রবীন্দ্রনাথকে প্রস্তাব দিয়েছেন, সংগঠনের সমস্ত ব্যাপার থেকে তাকে অব্যাহতি দেবে, তহবিল যোগাবে, অধ্যাপক ও ছাত্র নিবাচন করে দেবে। সেদিন সকালেই রবীন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করে এসেছেন; তিনি লিখেছেন, এতো সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, পদস্থ সরকারি কর্মচারিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশে তাঁকে যে সম্মান দেয়া হয়েছে. তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি কখনো তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না, কারণ তিনি এক 'ভবঘুরে', সরকারি কেউ নন; তিনি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে চেয়েছেন কেবলমাত্র অতিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের জন্য নয়, যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে দরিদ্র ছাত্রদের, সকল দেশের স্বাধীনচেতাদের জন্যও। তাছাড়া তিনি আরও বললেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যের পরিকল্পনা তাঁর নেই। (আমি তাকে স্বীকার করলাম যে, সরকারগুলোর অবিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে — মূলগতভাবে- আন্তর্জাতিক মন, যে মন আমাদের দু'জনের)। তাঁকে পরামর্শ দিলাম, সরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাইরে ইংল্যণ্ডের স্বাধীন লোকেদের কাছে তিনি আবেদন করুন, যাতে তারা একটা জনমত গড়ে তুলতে পারেন, যা সরকারের অসৎ অভিপ্রায়কে বাধা দিতে পারবে। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, ইংরেজ লেখক ও শিল্পীদের অত্যন্ত সামান্য সংখ্যকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে (বার্ট্রাণ্ড রাসেল বাদে, তিনি তখন চিনে), কারণ হিসেবে তিনি বললেন, যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে তাঁর সম্মানসূচক খেতাব ফিরিয়ে দেবার পর থেকে তিনি সন্দেহভাজন হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় না এইটেই সত্যকার কারণ। তাঁর মহৎ বিদ্রোহ বরং এর বিপরীত, যা মুক্তমতি ইংরেজদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। আমার মনে হয়, ভারতীয়দের দরুনই তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, যখন আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম - ভারতবর্ষে তাঁর ধ্যানধারণার অনুবর্তী কেউ আছেন কিনা, তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, নি:সন্দেহে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁকে শিল্পী বলে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ও বোঝাপড়ার আদর্শ সমর্থন করেন তারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য - সম্ভবত কেউই নেই। তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ অতিমাত্রায় জাগরিত হয়েছে, তাঁরা যা কিছু সহ্য করেছেন তার ফলে ইউরোপের সঙ্গে তাদের সমঝোতায় স্বেচ্ছায় সম্মত হবার পক্ষে জাতিবিদ্বেষ অত্যন্ত তীব্র। সর্বোপরি তাঁরা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে চান না, কারণ তাঁরা ভাবেন, তাঁদের সম্পর্কে ইয়োরোপের আছে শুধুই বোঝার অক্ষমতা এবং অজ্ঞতা। আর সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে একদিকে ইংরেজদের সম্পর্কে এত সতর্ক থাকতে হচ্ছে; তাঁর কাজ যেন ইংলন্ডের একটা হাতিয়ার বলে সন্দেহভাজন না হয় এবং এই ভয়েই ইংরেজদের ওপর নির্ভর করাটা তাঁকে এড়াতে হচ্ছে। তিনি বললেন, আর অন্য দিকে, এটা জরুরিও বটে যে, ইউরোপিয়দের ভারতবর্ষে আসতে হবে (শেখাটাই যথেষ্ট নয়), ভারতীয়দের কাছে প্রমাণ করতে হবে, পাশ্চাত্যে তবুও এমন মানুষেরা আছেন যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং তাঁদের ভবিতব্য সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখেন। এটা একটা জরুরি প্রয়োজন'।

তাঁর ভারতবর্ষের ডায়েরিতে র‍্যোলাঁ আরও লিখলেন, 'ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসাহী তরুণচিত্তদের ফ্রান্সে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর নয় — তাঁরা সেখানে যেতে পা বাড়িয়েই আছেন - যদি অবশ্য যাওয়াটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু এটা স্বীকার করাই কর্তব্য যে, সবচেয়ে জার্মানি ও রাশিয়া থেকেই সহানুভূতি ও সম্মতির প্রবল সাড়া আসবে।

আর সময়ের এমনই ফের যে, ঠিক এই দু'টি দেশের মানুষরাই এখন ভারতবর্ষে যেতে পারে না।.....

'আমার ভয় হয়, এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কাজ ভারতে রূপায়িত হওয়া খুব কষ্টসাধ্য না হয়ে ওঠে। আমাকে যা সবচেয়ে পীড়িত করে তা তাঁর স্বীকারোক্তি যে, ভারতীয়দের মধ্যে একজনও নেই যিনি তাঁর মুখ্য সহকারী হতে পারেন। মাত্র দু'জন অনুবর্তী আছেন যাঁদের ওপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁরা আবার দু'জনেই ইংরেজ, বাস করেন ভারতে। (র‍্যোলা এন্ড্রুজ ও পিয়ারসনের কথাই বলতে চাইছেন বলে অনুমিত হয়)।

' যে সব তরুণেরা তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে চাইবেন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সবার আগে চাইবেন — বিশ্বাস- তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বাস'।

উক্ত তারিখের ডায়েরিতে এ সাক্ষাৎকারের বর্ণনার সমাপ্তি পর্বে রবীন্দ্রনাথের ' চেহারার সৌন্দর্য', 'সুসমঞ্জস প্রশান্তি', 'মানুষের সম্পর্কে এক মোহহীন দৃষ্টি', 'পুরুষোচিত বুদ্ধিমত্তা' এবং 'স্মিত হাসিতে' র‍্যোলা যে অভিভূত তা তিনি আবার লিখলেন এবং জানালেন তাদের বিদায়ের শেষ মুহূর্তটির কথা : 'ঝুঁকে করমর্দন করার পর যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম তিনি জোড়করা দুই হাত ঠোঁটের কাছ পর্যন্ত তুললেন, যেন এক প্রার্থনার ভঙ্গি।'

রবীন্দ্রনাথের র‍্যোলাঁর সঙ্গে তৃতীয় বারের (২৬ এপ্রিল) সাক্ষাৎকারের্র মধ্যে ইংলন্ডে তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া যে তাঁর পক্ষে সুখকর হয়নি তার কারণ ঐতিহাসিক সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে তাঁর গীতাঞ্জলি পর্বে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ সরকার ও বিদগ্ধ সমাজের যে সাদর অভিনন্দন ও সম্মান লাভ করেছিলেন এবারে এসে তিনি অভ্যর্থনায় সে উষ্ণতা পেলেন না। তার কারণ ছিল একাধিক। প্রথমত, প্রথম মহাযুদ্ধ যে মূলত উগ্র ও হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিশ্বভ্রাতৃত্ববিরোধী ঘোরতর কুফল একথা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি তা গোপনও রাখেননি। তাঁর এই মনোভাব ইংরেজজাতির মন:পূত ছিল না। দ্বিতীয়ত: ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিওয়ানালাবাগে ইংরেজদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদে তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া নাইটহুড পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। Imperfect Encounter বইটিতে Mary M. Lago লিখছেন, " Tagore's courageous resignation of his Knighthood in 1919 struck both officials and non-officials as a deliberate insult to the King, crown and empire". (p. 268). ফলে রাজরোষের শিকার হয়েছিলেন তিনি। তৃতীয়ত, তখন ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তি যে স্বাধীনতা লাভের জন্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তিনি তার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন - এমন একটা ভুল ধারণা ইংরেজদের মনে ছিল। এ তিনটি কারণ রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজদের কাছে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। গীতাঞ্জলি পর্বে লন্ডনের বিগদ্ধমহলের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তিনি যে অভূতপূর্ব সম্মান, সহানুভূতি ও মুগ্ধতা অর্জন করেছিলেন এবারে যেন তার কাছে তার অনেকটাই ম্লান মনে হল। তার গুণমুগ্ধ প্রিয়তম বন্ধু রোদেনস্টাইন — যিনি তখন Royal College of Art-র Principal অর্থাৎ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী — আগের মত উষ্ম অভ্যর্থনা জানাতে পারলেন

না কবিকে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিরা ভারতে তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় খুব বেশি আগ্রহী হলেন না; বলা যায়, প্রায় দায়সারা গোছের একটি কমিটি তৈরির প্রস্তাব দিলেন, যে কমিটি নিজেই সব ব্যাপারটা দেখবে বলে তাঁকে আশ্বাস দিলেন; সে কমিটিতে Montagn L. Carmichaol, Herbert Fisher এবং Michael Sadler থাকবে আশা করেছিলেন বন্ধু রোদেনস্টাইন, অবশ্য তিনি Committee of Trustees গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সে প্রস্তাব মেনে নিলেও বুঝলেন, এ প্রস্তাবের মধ্যে কোন আন্তরিকতা নেই; পরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্যারিতে চলে এলেন। লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল স্যাড্লার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবের বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি ২৫ জুলাই ১৯২১ প্যারিতে রবীন্দ্রাথকে লিখলেন : ' যে সব ছাত্র প্রাচ্যকে জানে এবং যেসব ছাত্র পাশ্চাত্যেকে জানে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সহকর্মীর সম্পর্ক তৈরি করতে এ বিশ্ববিদ্যালয় উৎসাহ যোগাবে।... এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে না কেন?' রোদেনস্টাইন শেষ পর্যন্ত ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ড থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়েই প্যারিতে চলে গেলেন। কবি এন্ডরুজকে প্যারি থেকে লিখলেন, 'আমাদের ইংলন্ডে থাকাটা বৃথা গেছে। আমি প্যারিতে থাকবার জন্য আসিনি, সেখান থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায় তাই স্থির করতে এসেছি।'

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের প্রধানত দু'টি উদ্দেশ্য ছিল - তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাকে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, বর্তমান যুগের ভাষায়, ' সেল' করা এবং তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, এবং বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থোপার্জন করা; এ অর্থোপার্জনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ধনীর দেশ আমেরিকা। তাঁর যে সব বক্তৃতার বিষয় রেখেছিলেন প্রতীচ্যের উগ্রজাতীয়তাবাদের ফলস্বরূপ তীব্র জাতিগত সংঘর্ষ ও আগ্রাসন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতে ঐক্যের উচ্চতম আদর্শ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-বিন্দু ও কবির ধর্ম। এসব বক্তৃতায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি অভিনন্দিত হয়েছেন, কিছু অর্থোপার্জনও তিনি করেছেন, তবে জাতীয়তাবাদের সমালোচনামূলক বক্তৃতা যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ ও আমেরিকা খুব পছন্দ করেনি এবং তার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব সীমিত মহলে অভিনন্দিত হয়েছে মাত্র। ফ্রান্সে সিলভ্যাঁ লেভির মত রবীন্দ্রানুরাগী অধ্যাপক যেমন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করেন (ছাত্রদের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেবার ভাষা ছিল তাঁর এই —'The Universiity of Strassbourg does render homage not only to a poet of genius and a genius marking millenium of a great nation, the French University of Strassbourg entertains a sister University of India" প্রসঙ্গটা উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক লেভি ১৯২১ সালে Visiting Professor হয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যান) তেমনি অন্যান্য দেশেও কিছু অধ্যাপক, গুণী মানুষের সহায়তা লাভ করেন, যেমন আমেরিকাতে পেয়েছিলেন E.H. Lewis এবং James Wood কে। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা-পরিক্রমাও খুব ফলপ্রসূ হয়নি। এর মধ্যে তাঁর নাইটহুড ত্যাগের ঘটনায় ইংরেজদের অসন্তোষ আমেরিকাতেও সংক্রামিত হয়েছিল। তাছাড়া তাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজেতার গর্বান্ধতা, তাদের অবচীন সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্য এবং অর্থসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনদর্শনের মাঝে কবির ভাষণ ও আলোচনা ' চোরা না শোন ধর্মের কাহিনীর' মত আমেরিকাবাসীদের মধ্যে কোন মহত্তর আবেদন রাখতে পারেনি। প্রচুর অর্থলাভ ও তার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের আশা প্রকৃত অর্থে ফলবতী হয়নি। বরং ইংল্যান্ডের মত আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর রাজনৈতিক অভিসন্ধির গন্ধ পেল। তাঁর ভ্রমণসঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথের ডায়েরির ভাষায় "This was the first time, I thought, he lost his dignity...' : তবে দৈত্যকুলে কিছু প্রহ্লাদ ছিল না সেখানে তা নয় — কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সমাজসেবী প্রভৃতির কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছেন তিনি, কিন্তু তাঁর পক্ষে তা আশানুরূপ ছিল না — অর্থে ও সমর্থিত উদ্যোগের বিচারে।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চিমের এই ঠান্ডা পরিস্থিতির পেছনে আছে একদিকে পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে ইংলন্ড ও আমেরিকার ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের প্রতি অমূলক সন্দেহ। এবারে বিদেশ ভ্রমণের উত্তরে তিনি ১৯২০ সালের ৬ অক্টোবরের ব্রাসেলস্ থেকে রোদেনস্টাইনকে কড়াভাষায় একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটির মূল বক্তব্য ছিল এই : ইংলন্ডে তাঁর অবস্থান কালে ইংরেজদের আগ্রহে যে নিষ্প্রভতা লক্ষ্য করেছিলেন, তার পেছনে ছিল ভারত-ইংলন্ডের শাসিত -শাসকের — রাজনীতি যার সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষত কোন সম্পর্ক ছিল না। উগ্র অথবা নরম - কোন অর্থেই তিনি জাতীয়তাবাদী নন। যেহেতু, রাজনীতির বাস্তবতার খেলার এক ব্যপক ধ্বংসাত্মক রূপ আছে এবং যেহেতু তিনিও মানুষ, সেহেতু রাজনীতি উদ্ভূত বিধ্বংসী কর্মকান্ড থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। রাজনীতির খেলা যে সব কুকীর্তির জন্ম দেয় তার সমর্থনে একটা নৈতিক যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা থাকে। কবি যাতে সবচেয়ে বেশি আহত বোধ করেছেন তা হল — ইংরেজ জাতি নিজেদের কুকীর্তি চাপা দিয়ে, তার সাক্ষ্য বিলুপ্ত করে, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতায় অন্যকে যখন বিচার করতে বসে। এ কথা একদিক থেকে খুব অস্বাভাবিক নয় যে, তার বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সংহত করার জন্য বেশি, আরও বেশি পশুশক্তির ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে; তবে এটা ব্যাপক অপকর্ম যে, সারা জগতের উৎপীড়িত লোকেরা তা ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করবে। ইংরেজের শোষণভিত্তিক ঐশ্বর্য এমন বাধার সৃষ্টি করে যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে, যার আকস্মিক সংকেত এক অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে এসে থাকবে।

কবি চিঠির শেষে আশা প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, এই অনাহূত চিঠির মধ্যে যে তিক্ততার স্বাদ আছে তা রোদেনস্টাইন যেন মানিয়ে নিতে সমর্থ হন।

মনে হয়, আমরিকা ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থের ও বিজ্ঞজনের সমর্থন ও সামর্থ্য সবচেয়ে আগে এবং বেশি করে ইংলন্ডেই পাবেন — এমন একটা আশাভরসা তাঁর মনে ছিল, কেননা তাঁর গীতাঞ্জলি পর্বে সেখানকার বহু গুণীজনের সংসর্গে এসে, আলোচনা করে সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হয়ে তাঁর এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে একটি ক্ষেত্র যেন তৈরি করে এসেছিলেন তিনি। অথচ এসে বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখলেন - তাঁর পরিকল্পনাকে ভন্ডুল

করে দিল সেই রাজনীতি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ঐ তিনটি অভিযোগের খন্ডন করতেই প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর ভাষায় ইংরেজ রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিলেন তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধু রোদেনস্টাইনকে।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনুভব ও বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপায়ন ও পরিচালনা মূলত তাঁরই দায়িত্ব, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানের সমাবেশ একমাত্র তাঁরই চেষ্টানির্ভর। যে ফরাসি অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভিকে পাশে বসিয়ে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে তাঁর স্বপ্নের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্বভারতীর সেদিন উদ্বোধন হল সেই লেভি হয়ে রইলেন সেই উৎসবের আন্তর্জাতিকতার প্রতীক। তারপর থেকে শান্তিনিকেতনে বিদেশী গুণীজনের স্রোত অব্যাহত ছিল — কখনো তীব্র, কখনো স্তিমিত — ক্রমশ: পরিণত হল 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্' বোলপুরের মাটিতে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর বাকি ইতিহাস এক পরিহাস — রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীদের হাতে যে পরিণতি লাভ করল তা হল এই ঃ তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক চেহারা থেকে রক্তমাংস খসে গিয়ে আজ তা কংকাল হয়ে পড়ে আছে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে, আর মানবপ্রেমী কবির নিজ হাতে তৈরি সর্বমানবের জয়ধ্বজাটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানকার সেই পবিত্র বেদীটির ওপর যেখানে বসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উদ্বোধন করেছিলেন আজ থেকে ৭৬ বছর আগে।।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খন্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
২. রবিজীবনী (৭ম খন্ড) : প্রশান্তকুমার পাল
৩. রোমাঁ র‍্যোলাঁর দিনপঞ্জী - ভারতবর্ষ : অনুবাদ - অবন্তী কুমার সান্যাল
৪. রবীন্দ্রনাথ - এন্ড্রুজ পত্রাবলী : অনুবাদ - মলিনা রায়

"স্থানে স্থানে ..... জনকতক সাহসী পুরুষ"

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও তার পরবর্তীকালে বাঙলাদেশের রাজনীতিতে যাঁরা নেতা বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই রবীন্দ্রনাথ কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন — একসময় ঐ আন্দোলনে তাঁর যোগদানের সুবাদে। পরে তাঁর ঐ উৎসাহ ও সক্রিয়তা ক্রমে হ্রাস পেলেও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁকে প্রায়ই রাজনৈতিক সভাসমিতির সঙ্গে জড়িত থাকতে হয়েছিল এবং সে সূত্রে সমকালের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও আদানপ্রদান তাঁকে কম বেশি বজায় রাখতে হয়েছিল। এসবের ফলে রাজনীতিকদের সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা, আমরা জানি তা খুব সুখকর হয়নি। স্বদেশীযুগে নেতৃত্বের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তাঁর মত মেলেনি, শুধু তা-ই নয়, তাঁদের নেতৃত্ব সম্পর্কেও তিনি অধিকাংশ সময়ে শ্রদ্ধা রক্ষা করতে পারেননি। তিনি নেতাদের সম্পর্কে এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, ভগবান এঁদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

স্বদেশী যুগের প্রধান নেতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মোদ্যোগে সাড়া না দেবার অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর সম্পাদকীয় গুণাবলীর প্রশংসা করলেও তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তিনি করেননি। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের গৌরবময় যুগে রবীন্দ্রনাথ একদা 'দেশনায়ক' রূপে বরণ করতে চেয়ে লিখেছিলেন, "... আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ... সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজি শিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনার গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন — সেই বন্দরের নাম রাজপ্রাসাদ।...বিধাতার কৃপা-ঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে-ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি।..."

১৯০৬ সালের এই ভাষণে সুরেন্দ্রনাথকে জাহাজের 'কাপ্তেন' বলে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেছিলেন :- "তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে, — হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত। ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে" ইত্যাদি। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথের ওপর সেই ভরসা আর যেন রাখা যাচ্ছে না, তার কারণ বহুবিধ। সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতির গতি নরমপন্থী যা ক্রমশঃ বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আপোষকামিতায় দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। ১৯০৭ সালে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের প্রকাশ্য বিরোধে কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে যায়। চরমপন্থীদের বেশির ভাগই ১৯০৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ না দিলেও এ সময়কার জনমনের নায়ক ছিলেন প্রধানত চরমপন্থী বলে পরিচিত নেতারাই, যেমন রাজদ্রোহের মামলায় অভিযুক্ত তিলক বা অভিযোগমুক্ত অরবিন্দ, — নির্বাসিত অজিত সিং ও লালা লাজপৎ রায় অথবা কারারুদ্ধ বাঙলার অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি ন'জন চরমপন্থী নেতা ও কয়েকমাস আগে কারামুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

১৯০৮ সালে বাঙলাদেশে উদ্ভূত সশস্ত্র বিপ্লববাদের সঙ্গেও এইসব নেতাদের কারও কারও যোগাযোগ ছিল। এই বিপ্লববাদ বা চরমপন্থী কংগ্রেসীদের সব মতবাদ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন, এমন কথা বলা না গেলেও তিলক ও অরবিন্দের মতো কয়েকজন লড়াকু জাতীয়তাবাদীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করতেন। যে-কোনো কারণেই হোক, ১৯০৮ সালে এই 'দেশনায়ক' শীর্ষক ভাষণটি 'সমূহ' গ্রন্থভুক্ত করবার সময় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের প্রশস্তিবাচক অংশগুলো প্রত্যাহার করে নেন। আরও একদশক পরে অ্যানি বেশান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত করা নিয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলে তাঁকে সুরেন্দ্রনাথের দ্বারা কটুভাষায় আক্রান্ত হতেও দেখা যায়। সুতরাং শেষপর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আস্থা বা শ্রদ্ধা কোনটাই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে অবশিষ্ট ছিল না বলেই ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ যে বাঙলার প্রথম সর্বভারতীয় চেতনাসম্পন্ন রাজনীতিক — এই গৌরব থেকে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করেননি পরবর্তীকালেও। তিরিশের দশকে 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক এক রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছিলেন :- ".... এতদিনধরে আমরা গ্রাম ও প্রতিবেশীদের নিয়ে খন্ড খন্ড ভাবে ছোটো খাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। ... ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয়নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়ে ছিলুম তখন রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরবদান করবার জন্যে।... (১৯৩৭)

স্বদেশীযুগের অন্যতম প্রধান নেতা অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই একধরণের আকর্ষণ বোধ করেছেন - এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে অসুবিধা হয়না। ১৯০৭ সালে তিনি প্রবাসী পুত্র রথীন্দ্রনাথকে 'স্টেট্‌সম্যান'এর বদলে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পাঠাতে মনস্থ করেন প্রধানত অরবিন্দের লেখার জন্যই এবং অরবিন্দকে "যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে", এই আশঙ্কা-প্রকাশ করে মন্তব্য করেন যে, আমাদের দেশে জেল খাটাই "মনুষ্যত্বের পরিচয়স্বরূপ হয়ে উঠবে।" অথচ যে সময় প্রধানত অরবিন্দের অনুগামীদের হামলাতে সুরাট কংগ্রেস পন্ড হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাশ্য কলহকে নিন্দা করলেও এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বহুদিন ধরে 'স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোম উদার কথা' পাওয়া যাচ্ছেনা, একথা স্বীকার করলেও অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উচ্চধারণার কোনো ব্যত্যয় হয়না। আমরা এব্যাপারটিও লক্ষ্য করেছি যে, ১৯০৮ সালে বাঙলার যে-সশস্ত্র বিপ্লববাদের অন্যতম হোতারূপে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন, সেই রাজনীতির তীব্র নিন্দা করলেও স্বাভাবিক যুক্তির অবোধগম্য কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নমস্কার' কবিতায় অরবিন্দকে শুধু 'রুদ্রদূত' বলে বন্দনাই করেননি, তাঁর সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাও শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অরবিন্দকে তিনি কেন শ্রদ্ধা করেন, এ কথা বোঝাতে গিয়ে পরবর্তীকালে একটি চিঠিতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিলেন যে, অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে তাঁর সঠিক কোনো ধারণা নেই। স্বদেশী যুগের বাঙলাদেশের রাজনীতিকে উপজীব্য

করে তিনি যখন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখেন, তখন মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় যদুনাথ সরকার তার একটি পর্যালোচনা করেন। উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রটিতে অরবিন্দের ছায়া থাকতে পারে, এমন এক সন্দেহের প্রেক্ষিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি চিঠিটির কিছু অংশ এখানে আমরা উপস্থিত করছি অনুবাদের মাধ্যমে। "আমার বইয়ের যদুবাবুকৃত পর্যালোচনাটি আমি এখনও পড়িনি, তবে আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই এমন কথা বলতে চাননি যে, আমার কাহিনীর সন্দীপ যে-ধরণের মনুষ্য, অরবিন্দ ঘোষও সেই একই ধরণের। আমাদের সমকালীন রাজনীতির লেখাপত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিক ও অনিয়মিত হওয়ায়, আজও আমি সঠিকভাবে জানিনা—অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক অবস্থানটি কী! তবে একথা আমি ঠিক জানি যে, তিনি একজন মহান্ মানুষ — আমাদের মহানতমদের একজন এবং সেকারণে, এমন কি, তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে ভুল বুঝতে পারেন। তাঁর সম্পর্কে আমার নিজের যা মনে হয়, তা নিছক প্রশস্তি নয়। তা হচ্ছে শ্রদ্ধা — তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতা, দৃষ্টির বিশালতা আর কল্পনার অন্তর্দৃষ্টি ও অভিব্যক্তিতে অনন্যসাধারণ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য।..." (৩০ নভেম্বর, ১৯১৯) এই চিঠিতে অরবিন্দকে 'একাধারে ঋষি ও কবি' বলে অভিহিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরানো 'নমস্কার'-এর পুনরাবৃত্তির কথা জানালেও একথা পরিষ্কার বোঝা যায়না যে, আশ্রমজীবনে প্রবেশের এক দশক পরে অরবিন্দের 'আধ্যাত্মিক গভীরতা' ইত্যাদি গুণাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যদি অবহিত হয়েও থাকেন, অরবিন্দ ১৯০৮ সালে যখন গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতার তেমন কোনো পরিচয় যখন জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি, তখন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সঠিকভাবে না জেনেও কিসের ভিত্তিতে তিনি তাঁকে 'দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' বলে বন্দনা করেছিলেন।

যে সন্দীপ চরিত্রটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর এই অতুচ্চ ধারণার পুনরাবৃত্তি করেন, তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, তার মধ্যে 'ভদ্রতার কোনো আদর্শ' নেই। এই চরিত্রটির পেছনে স্বদেশীযুগের কোন্ বাঙালি নেতার মডেল রবীন্দ্রনাথ নিহিত রেখেছিলেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। বিপ্লববাদী তরুণদের মন্ত্রদাতা হিসেবে অরবিন্দের কথা মনে হতেই পারে, তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন ঐ মডেল অরবিন্দ নন, তবে তিনি কে হতে পারেন! অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, স্বদেশী যুগে দেশের কাজে নেমে "একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠা সবল চরিত্র" তাঁর কাছে বিরল মনে হয়েছিল। স্বদেশীযুগের অন্যান্য বাঙালি নেতাদের মধ্যে সত্যিই তিনি কি তেমন কোনো চরিত্র পাননি! বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ-সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া সে-যুগের অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনোরকম সুনির্দিষ্ট অভিমত অবশ্য আমরা পাইনি। শুধু অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরিত কংগ্রেস সম্পর্কিত একটি আলোচনা বিবরণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি তাঁকে "দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত" বলে উল্লেখ করেছেন দেখা যায় ('আত্মশক্তি ও সমূহ')।

জড়ত্বকে যাঁরা আঘাত করেছেন

বাঙলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেসব রাষ্ট্রনেতা জনজাগরণের

নেতৃত্ব দিয়েছেন, গান্ধীর পূর্বে সেরকম যে-দু'জনের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমরা পেয়েছি। তাঁরা ছিলেন হোম রুল আন্দোলনের স্রষ্টা। গান্ধী সম্পর্কে বলতে গিয়ে একপ্রবন্ধে "স্থানে স্থানে . . . জনকতক" যেসব সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে "প্রাণপণে আঘাত করেছেন ও আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন" তাঁদের মধ্যে শুধু তিলকেরই নাম করেছেন। হোম রুল আন্দোলনে তিলকের সহযোগী অ্যানি বেশান্ত সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় বারবার পাওয়া যায়। তিলক রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহায়তার জন্য চাঁদা তোলায় যেমন হাত লাগিয়েছিলেন, তেমনই শ্রীমতী বেশান্তের বৃটিশ সরকারের দমন নীতি ও ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বানে শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে বেশান্ত অন্তরীণ হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ঐ বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। বেশান্তের 'ন্যু ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রেরিত এই বাণীতে তাঁকে 'হার্দিক সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন —"পীড়িত মানবাত্মার জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ আমাদের দাবীকে শান্ত করতে ছুঁড়ে দেওয়া যে কোনো ক্ষুদ্র অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষা থেকে বেশি সুফলপ্রসূ হবে।" সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীটিকে দেখে মীড্ নামে জনৈক ইংরেজ এতে বিস্ময়প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। তার জবাবে ভারতরক্ষা আইনের নানা নির্দয়তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ মীডকে এক খোলা চিঠি পাঠান ও 'মহান আত্মত্যাগের ব্রত" গ্রহণ করে যারা বিনাবিচারে অন্তরীণ হয়েছেন ও জেলে নির্যাতন ভোগ করছেন এমন শতাধিক মানুষের কথা বলতে গিয়ে বেশান্ত সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা এরকম :- "এই সঙ্কটকালে একমাত্র বিদেশী বন্ধু যিনি আমাদের নির্যাতনভোগের অংশীদার হয়েছেন ও সেজন্য তাঁর স্বদেশীয়দের ক্রোধ ও ভ্রূকুটির লক্ষ্য হয়েছেন, তিনি শ্রীমতী বেশান্ত। ...তাঁর এই মহান্ সাহসিকতার জন্যই তাঁর উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়েছি, বিশেষত আজকের এই দুর্দিনে যখন মানবতার বিরুদ্ধে চলছে এই অন্ধ তামসিক আক্রমণ আর তার বিরোধিতাও যখন আজ খুব বিপজ্জনক।" এরপরের বছর বেশান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি করার জন্য জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগকে সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে মডারেট নেতাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন যে কাহিনীও আমাদের অপরিচিত নয়।

অসহযোগ আন্দোলন : আদি পর্বের কয়েকজন নেতা স্বদেশী আন্দোলনের পর যে-রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ আবার রাজনীতিকদের সংস্পর্শে এলেন, তা হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকান্ড। ঐ গণহত্যার পূর্বে রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন যখন চলছিল, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি গান্ধীর দ্বিধাহীন সমর্থক। তবে ঐ হত্যাকান্ড ঘটে যাবার পর যখন তিনি এর প্রতিবাদে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হন ও 'পোলিটিশিয়ানদের পলিটিকসের' স্বরূপ বুঝতে পারেন, সে সময় যেসব নেতাদের নিশ্চেষ্টতার অভিযোগ তিনি পরবর্তীকালে একাধিকবার করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ। জালিয়ান-গণহত্যার পর অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধী ছাড়া অপর যে একজন মাত্র নেতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের নায়করূপে যখন গান্ধীর অভ্যুদয় হয়, ভারতীয় রাজনীতির একজন মহানায়ক এবং রবীন্দ্রনাথেরও শ্রদ্ধাভাজন নেতা তিলকের সেসময় সবে তিরোধান ঘটেছে। কংগ্রেসে এসময় গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হলেও তা অবিসংবাদিত ছিল না। কিছু নেতা অসহযোগের মূলনীতি মেনে নিলেও তাঁদের কৌশলগত নানাপ্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে মতভেদ ছিল এবং তাঁর নেতৃত্বের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরু। এঁদের সঙ্গে কাউন্সিল বর্জন নীতি নিয়ে গান্ধীর বিরোধ ও এঁদের তৈরি স্বরাজ্য দলের রাজনীতির কাছে গান্ধীর নতিস্বীকার রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি, সে-সময় বাঙলাদেশের জনমনের অবিসংবাদী নায়ক চিত্তরঞ্জনের সঙ্গেও প্রথমাবধি তাঁর এক প্রতিকূল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

১৯১৭ সালে বেশান্তকে সভাপতি করবার জন্য কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীরা যে উদ্যোগ নেন সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথ এই বয়ঃকনিষ্ঠ নেতা চিত্তরঞ্জনের কাছাকাছি এসেছিলেন প্রথমবারের মতো। জালিয়ান-গণহত্যার খবর পাবার পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে অনুরোধ করেছিলেন এবং মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, তাতে দেখা যায় — চিত্তরঞ্জন নাকি বলেছিলেন, "আপনিই করুন, আমরা না হয় সভায় উপস্থিত থাকবো।" এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :- "একে কি বলতে চাও? এইসব হলো পোলিটিশিয়ানদের পোলিটিকস। সুবিধে বুঝে চলতে হবে, এর সঙ্গে কখনো মন মেলাতে পারিনি।...." ('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ')

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার বিরোধকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের মনে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে কঠোরতা পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। ১৯১৪ সালে চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ না করেই তিনি প্রমথনাথকে যা লিখেছিলেন, তা থেকেই রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় :- '... বিপিন পাল এবং বিপিন পালের পালকবর্গ যে তোমার সবুজপত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবে সে আমি জানতুম।..." ইত্যাদি। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনীর ভাষণে চিত্তরঞ্জন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিরোধী ভাবধারার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলতে চেয়েছিলেন। 'বাংলার কথা' শিরোনামে এই ভাষণটি 'নারায়ণ'- পত্রিকায় ছাপা হলে (জৈষ্ঠ, ১৩২৪) অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ভারতী'তে আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও প্রবাসী-তে এই রচনার প্রতিবাদ করেন। রামানন্দ এমন কি, দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করতে চাল যে, চিত্তরঞ্জনের লেখাটির অনেক কথাই রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' ও অন্যান্য রচনা থেকেই গৃহীত (প্রবাসী, জৈষ্ঠ, ১৩২৪)।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেখা যাচ্ছে রামানন্দের এই মত সমর্থন করেছেন ও চিত্তরঞ্জনের নামোল্লেখ না করে একাধিকবার একথা উল্লেখও করেছেন। ১৯৩২ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠির অংশ দেখা যেতে পারে :— ".....আমি যখন 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কংগ্রেসওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। ... কিন্তু আমার সেদিনকার কথার টুকরো নিয়ে পরবর্তী অনেক দেশাত্মবোধী

তাঁদের বাণীরূপে ব্যবহার করেছেন এবং দেশে ধন্য হয়েছেন। বেঁচে থাকতে থাকতে এও দেখেছি।" (৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৯) আবার ১৯২৩ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় অনুরূপ ইঙ্গিত :- "... কেউ কেউ বলে আমার কথাগুলো কবির মতো, শুনতে ভালো, কাজে ভালো নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো সকলেই আওড়াবে- অম্লানবদনে বলবে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা।" (১১ অক্টোবর, ১৯২৩)

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পরও আমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছিল, যার অনুবাদ পরে 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়াও এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী গদ্যেপদ্যে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি আক্রমণ করেন, এমন কি রূঢ় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কটাক্ষ করা হয়। সমকালে রবীন্দ্রনাথ এসব বিতণ্ডায় নিজে যোগ দেননি বটে, তবে তাঁর সংবেদনশীল মন ভবিষ্যতে কখনই এসব কারণে চিত্তরঞ্জনকে ক্ষমা করতে পারেননি। ১৯৩৯ সালে তাঁর তাবৎ বিরোধীবর্গের তালিকায় অসঙ্কোচে চিত্তরঞ্জনের নামও যুক্ত করে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :- "... কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজু রায়, বিজয় মজুমদার, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তি কুশ্রী ভাষায় অক্লান্তভাবে আমার প্রতি স্বরবর্ষণ করেছেন — সৌভাগ্যক্রমে সময় এসেছে, যখন আমার বাড়িতেই তার প্রতিমূল্য দিতে পেরেছি। ..." একইভাবে তিনি হেমন্তবালা দেবীকে লিখেন :- "...সজনীর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো লোক আমাকে নিরন্তর আঘাত করেচে। যথা দ্বিজু রায়, চিত্তরঞ্জন, সুরেশ সমাজপতি। তারা যে আমার চেয়ে হিন্দুসমাজের দরদ বেশি বাঁচিয়ে চলত, তা নয়, তাদের আহারবিহারের খবর সকলেরই জানা আছে..."। (২৪-৬-১৯৩৩)

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের সময়ও এই বিরোধিতার কথা রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি। অনুরোধে পড়ে এসময় তিনি দু'-ছত্রের যে সুপরিচিত কবিতাটি রচনা করেন বা তারও দশ বছর পরে দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ উপলক্ষে যে ক্ষুদ্র শ্লোকটি রচনা করেন, তাতে চিত্তরঞ্জনের 'দেহহীন স্মৃতি', 'মৃত্যুহীন দিনে আয়োজিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ যে সংক্ষিপ্ত বাণীটি পাঠান, তাতেও তাঁর রাষ্ট্রনেতার গুণাবলীর চেয়ে ত্যাগকেই বড় দান হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়েছে :- "...চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে-সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার দেশবাসীকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনো বিশেষ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কর্তব্যপালনের আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই সৃষ্টির শক্তিশালী মহাতপস্যা, যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।" (১-৭-১৯২৫)

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে এইসব শোকপ্রকাশকে যে রবীন্দ্রনাথ 'বালাই' বলে মনে করেছিলেন, সেটা তাঁর সযত্নচয়িত ঐ সব শব্দাবলী ও অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিমা থেকে হয়তো সহসা বোঝা যাবেনা। এ সুললিত শব্দবন্ধের আড়ালে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাবটি বোঝা যায় একই দিনে লেখা তাঁর দু'টি ব্যক্তিগত চিঠি থেকে। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির একটি অংশ :- "... চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষে আমার কলকাতা যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন চলচে। ... বিশেষত চিত্তের সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল

— একথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে..." (৪ আষাঢ় ১৩৩২) বোঝা যাচ্ছে যে, চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূলতাকে দেশবাসীর কাছে গোপন রাখতে চান বলেই এ চিঠিতে ছেলের কাছে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অনেকটা একই ধরণের কথা রয়েছে একই দিনে লেখা প্রশান্ত মহলানবীশকে উদ্দিষ্ট চিঠিতেও :- "... তার প্রতি আমার যেটুকু দেয় দেশের লোক তা আশা করে :- শরীরের অস্বাস্থ্য ওজর খাটবে না। কিছু না, একবার ওদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে অভিশোচন প্রকাশ করা। আর নিতান্তই যদি সভাসমিতিতে কিছু বলতে ধরে দুচার কথা বলা। আমার প্রতি চিত্ত চিরদিন নিরন্তর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এসেছিলেন বলেই আজ এই কর্তব্য আমাকে টানছে :- . . . এখন গিয়ে অল্প কিছু করে এলেও তার মূল্য বেশি হবে - এরপরে সভাপতিত্ব ইত্যাদি বালাই থেকে রক্ষা পাব।..." কাজে কাজেই দেশের লোককে শুধু তুষ্ট করবার জন্য শোকপ্রকাশ করে তার ভবিষ্যৎ 'মূল্যের' যে-হিসাব এখানে রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তাকেই হয়তো পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছে "আমার বাড়িতেই তার প্রতিমূল্য দিতে পেরেছি"।

চিত্তরঞ্জনের অসামান্য জনপ্রিয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে :- "...চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোক কদাচিৎ প্রতিবাদ করেছে। এমন কি নিন্দাও করেচে। কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে আঘাত পেয়েও গর্হিতভাষায় কুৎসিতভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেননি। করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেননি — কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না।..." (২৬-১২-১৯২৯) কিন্তু জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে এখানে নিজের ভাগ্যের তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসব কথা বললেও চিত্তরঞ্জনের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর যে খুব উচ্চধারণা ছিল না তা বোঝা যায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠিতে চিত্তরঞ্জনশিষ্য সুভাষচন্দ্রের অরবিন্দ আশ্রমের ভাবধারা সমালোচনার প্রেক্ষিতে তিনি যে মন্তব্য করেন তা থেকে :- "... অরবিন্দের সাধনা বোঝবার মনোবৃত্তি সুভাষের নেই। ওর মনোবৃত্তি চিত্তরঞ্জনের ছাঁচে ঢালাই করা, চিত্তরঞ্জনের বুদ্ধি ও শক্তি বাদ দিয়ে। ...."(১৮-১-১৯২৯)

সমসাময়িক ঘটনাবলীতে উত্তেজিত অবস্থায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে মূল্যায়ণ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, পরে তা সংশোধনের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, কিন্তু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তাঁর চিত্তের প্রতিকূলতা কোনোদিন দূর হয়েছিল বলে মনে হয়না। উদ্ধৃত চিঠিটিতে সুভাষচন্দ্রে ত্রুটি নির্দেশের তাগিদে চিত্তরঞ্জনকে 'বুদ্ধি ও শক্তি'র সামান্য স্বীকৃতি দিলেও মোটের ওপর তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাই ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে অরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ সঠিকভাবে না জেনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্বশক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার জন্য তাঁরে বারবার নমস্কার জনিয়েছেন, তিনি কিন্তু এই চিঠি লেখার সময় ভুলে গেছেন যে, সেই অরবিন্দকে "ভাবীকালের প্রোফেট' ও জাতীয়তাবাদের মহাকবি' বলে চিত্তরঞ্জনই প্রথম সর্বসমক্ষে অভিনন্দিত করেছিলেন!

চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের অপর স্তম্ভ মোতিলাল নেহরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের

চেয়ে অধিকতর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়না। বরং অমল হোমের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, নাইটহুড বর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবার জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা চালান, যে-সব রাজনীতিকের ঔদাসীন্যে অমৃতসর কংগ্রেসে তা চাপা পড়ে যায় তাদের অগ্রণী ছিলেন পন্ডিত মোতিলাল। রবীন্দ্রনাথ একথা অমল হোমের থেকে জেনে থাকবেন, কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে এর বেশ কয়েকবছর পরেও মোতিলালের মতামতের ওপর রবীন্দ্রনাথকে আস্থা প্রকাশ করতে দেখা যায় একটি চিঠিতে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে পূর্ণস্বাধীনতা বনাম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (ডোমিনিয়ন স্টেটাস) প্রশ্নে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল মোতিলালেরই সভাপতিত্বে। এর দু'বছর করে (১৯৩০) বৃটিশ সরকার যখন ভারতের ভাবীশাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করছে, তার কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের য়োরোপ সফর।

১৯২৯ সালেনই গান্ধী, মোতিলাল প্রমুখ নেতারা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ডোমিনিয়ন-তন্ত্রের ভিত্তিতে ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা হলে তবেই তাঁরা সমর্থন করবেন। এ প্রসঙ্গে ইংলন্ড থেকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে লেখেন যে, তাঁর মতে ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রতন্ত্র যারা পেয়েছে তারা নিজের প্রকৃতি থেকেই পেয়েছে- ইতিহাসে অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখে "বাইরের থেকে কেঁদে কেটে চেয়ে চিন্তে কিম্বা ধারধোর করেও" পায়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মন্তব্য :- "যাই হোক্‌গে, এসবকথা মুখ ফুটে কাউকে বলিনে। মনে মনে ভাবি এসব তত্ত্বে আমার হয়তো অধিকার নেই। মোতিলাল নেহরু প্রভৃতির মতো লোক না অবুঝ, না অবিদ্বান, না অবাচীন, তাঁরা যদি ভাবতে পারেন যে, যে পদার্থটা স্বঃতই ডোমিনিয়ন নয়, সেখানে পরত: ডোমিনিয়ন স্টেটাস নামক পদার্থের আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের ভাববার কোনো হেতু আছে।..." (২৬ জুন ১৯৩০) বিভিন্ন দেশের জাতিচরিত্র বিভিন্ন রকম, অথচ তাদের পলিটিক্‌সের মধ্যে "ফলগত কোনো প্রভেদ থাকবেনা, এটা অসম্ভব — নিজের এই মত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :- "কিন্তু আমার থেকে যারা প্রাজ্ঞ তাঁরা একথা যখন একেবারেই ভাবচেন না তখন নিজের বুদ্ধির পরে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয়।"

ডোমিনিয়ান তন্ত্রের বিতর্কের আগেও অবশ্য মোতিলাল যখন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে স্বরাজ্য দলগঠন করেছিলেন ও গান্ধীর মতবাদের বিরোধিতা করে কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষে জনমত সংগঠন করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ 'বিজলী' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, যারা কাউন্সিলে যেতে চায়, তাদের যেতে দেওয়া ও সেখানে কাজ করতে দেওয়া উচিত। এ-থেকেও মোতিলালের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও কর্মধারার ওপর মোটের ওপর তাঁর আস্থা প্রকাশ পায়। স্বরাজ্য দলের অপরস্তম্ভ চিত্তরঞ্জনের ক্ষমতা জনপ্রিয়তা ইত্যাদি অস্বীকার না করলেও তাঁর নীতির এরকম খোলাখুলি তারিফ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেন সম্ভব ছিলনা, তা আমরা আগেই দেখেছি।

স্বরাজ্য দলের আর এক নেতা বিঠলভাই প্যাটেলও স্বরাজ্যদল গঠনের আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছেন। ১৯১৯ সালে বিঠলভাইয়ের আনীত অন্তবর্ণ বিবাহ বিষয়ক

বিল ভাইসরয়ের কাউনসিলে আনা হলে এনিয়ে দেশব্যাপী বিতর্ক শুরু হয় ও রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে চিঠি লিখে এই বিলকে সমর্থন করেন (মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)। আবার ১৯৩৩ সালে য়োরোপ থেকে ভারতীয় নেতাদের বিদেশে ভারতবিরোধী নানাধরণের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করবার জন্য লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে তখন বিবৃতি দিয়ে বিঠলভাইয়ের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন (১৩-৪-১৯৩৩। বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে বিঠলভাই ছিলেন সেই বিরল রাজনীতিকদের অন্যতম, যাঁরা গান্ধীকে অন্ধভাবে সমর্থন করেননি। য়োরোপ থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক যৌথ ইশতাহার প্রচার করে বিঠলভাই কংগ্রেসে গান্ধীর বিকল্প নেতৃত্বের কথা বলেছিলেন। এর অল্প কিছুদিন পরে প্রবাসেই তার মৃত্যু হয়। সেসময় সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের যে শোকবার্তাটি প্রকাশিত হয় তা এরকম :- "বিঠলভাই এর মৃত্যুতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এর মহাসাহসী যোদ্ধার তিরোধান হইল। আত্মত্যাগী এই স্বদেশপ্রেমিক তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মূল্যবান সমস্তই অকাতরে স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় তাঁহার প্রয়োজন যখন একান্ত হইয়া উঠিল, সেই সময়েই নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। ...সমগ্র ভারতের সহিত মিলিত হইয়া আমিও এই পরলোকগত মহান্ নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭-১০-১৯৩৩)।

'সক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিরন্তর আত্মত্যাগ'

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীর প্রবেশের পর যে-ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেটি হচ্ছে ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন। এই সময়ে গান্ধীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতের শাশ্বত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রবক্তারূপে অভিনন্দিত করেন, এমন কি তুলনা করেন বুদ্ধের সঙ্গে! (১২ এপ্রিল ১৯১২) এন্ড্রুজের কাছে লেখা চিঠিতেও সেই নৈতিক শক্তির কথা বলে তিনি গান্ধীর নেতৃত্বকে সমর্থন করেন (২০ এপ্রিল)। কিন্তু অত্যাচার ঘটে যাবর পর 'পোলিটিসিয়ানদের পোলিটিকস' সম্পর্কে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা হয় যখন ঐ সব ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি গান্ধী বা অন্য কোনো রাষ্ট্রনেতাকেই তাঁর পাশে পাননা। গান্ধীর এ সময়ের নীতিকে তিনি একাধিকবার সমালোচনা করেছেন বৃটিশ শাসকের সহযোগিতার জন্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ না করে নীরব থাকার জন্য। প্রশান্তচন্দ্র মহলালবীশকে ১৯২৮ সালে তিনি প্রসঙ্গক্রমে লেখেন:- "... মহাত্মাজী নিজেদের ধর্মকেও খর্ব করে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য একসময় উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তার জন্য ফৌজ সংগ্রহ করতেও বাধা ছিল না — এমন কি জালিওয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারে অনেকদিন নীরব ছিলেন—লর্ড চেমসফোর্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে। যখন দেখলেন স্বজাতির স্বার্থসাধনের বেলায় কোন জাতধর্মের দোহাই মানেনা,... তখন অভিমান করে বললেন — ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। যখন গভীর অন্তরে সম্পর্কের ইচ্ছা প্রবল তখন বাইরে তার প্রত্যাখ্যানের জোর বেশি হয়েছিল।..."(২৮ ভাদ্র ১৩৩৫)

এখানে 'প্রত্যাখ্যানের জোর' বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের

উগ্রতা, যা তাঁর মতে 'বিকৃতি' এবং যার ফলে শান্তিনিকেতনকে বিশ্বমিলনের তীর্থস্থান করে তোলার প্রচেষ্টায় তিনি দেশের লোকের সহযোগিতা পাননি বলে ঐ চিঠিতেই অভিযোগ করেছেন। ঐ আন্দোলনের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর বিরোধের কথা সুবিদিত। ঐ আন্দোলনের গুরু গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্ব শুভফলপ্রদ হবে, ক্রমশ:ই তিনি,গান্ধীর চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিজের দুস্তর পার্থক্য উপলব্ধি করতে থাকেন। এই ব্যবধানের কথা স্বীকার করেও দেখা যায়-চিঠিপত্রে প্রবন্ধে তিনি গান্ধীর সেই 'নৈতিক প্রেরণা' ও জনজাগরণে তাঁর অসামান্য ভূমিকাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশস্তি জানিয়েছেন। বন্ধু এন্ডরুজকে তিনি শিকাগো থেকে একটি চিঠিতে লেখেন :- "মহাত্মা গান্ধী, যাঁর দেহ ক্ষীণ এবং পার্থিব সম্পদে যিনি একেবারেই রিক্ত তিনিই যে ভারতের লজ্জিত অপমানিত জনসাধারণের মধ্যে অবরুদ্ধ দুর্নিবার শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? ভারতের ভাগ্যবিধাতা আত্মার শক্তিকেই সহায় বলে বরণ করেছেন, শারীর শক্তিকে নয়।..." (২ মার্চ ১৯২১) আর একটি চিঠিতে একই ব্যক্তিকে তিনি লেখেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিতে যে ভারতবর্ষ বিশ্বাস হারায়নি, সেকথা প্রমাণের সুযোগ নিয়েছেন বলে " আমরা সকলেই আজ মহাত্মা গান্ধীর কাছে ঋণী। ..."(২০ এপ্রিল ১৯২১)

যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ এস.কে রায় নামে এক বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে গান্ধী সম্পর্কে উচ্চপ্রশস্তি করে অনেক কথা বলেন যা সংকলিত হয়েছে 'ট্রুথ কল্‌ড্ দেম ডিফারেন্টলি' বইটিতে (আর.কে প্রভু ও রবীন্দ্র কেলকার সম্পাদিত) এতে দেখা যায় যে, গান্ধীর সাফল্যের মূল নিহিত তাঁর সক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে ও নিরন্তর আত্মত্যাগে। তিনি মূর্তিমান ত্যাগ। তাঁর এই ত্যাগের শক্তি আরও অপ্রতিরোধ্য হয়েছে তাঁর ভয়হীনতার জন্য। তিনি মুক্ত-আত্মা। তাঁর জীবনযাত্রার সারল্য শিশুসুলভ, তাঁর সত্যনিষ্ঠা অবিচল। মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম অপরিমেয়। ....ইত্যাদি ইত্যাদি। এর আগে আমরা দেখেছি গান্ধীর কাছে লেখা চিঠিতে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে, আর এখানে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, গান্ধীর মধ্যে যীশুর ভাব অনেকটা আছে। তাঁর মতে " এই মহৎ মানুষটি পৃথিবীর গতি নির্ধারণে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করবেন।"

মনে রাখতে হবে গান্ধী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই সব মন্তব্য ও মূল্যায়ন অনেকটাই তাত্ত্বিক, কারণ অসহযোগের ব্যবহারিক দিকটি তখনও রবীন্দ্রনাথের ধারণা বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ ভারতে ফেরার পর যখন ক্রমশ: সম্মুখীন হলেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ও বাস্তব অভিঘাতের। তখন তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গান্ধী মূল্যায়নকে প্রভাবিত হতে দেখি আমরা। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন যুগের।

উল্লেখ পঞ্জী:—

১। মহাত্মা গান্ধী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সংস্করণ) একাদশ খন্ড)২। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রশস্তিবাচন - দ্রষ্টব্য - 'মহাজাতিসদন / শংকরীপ্রসাদ বসু, "নেতাজী" (নেতাজী প্রদর্শনীর স্মারক সংকলন, ১৯৭০)

৩। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি - চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী) দ্বিতীয় খন্ড

৪। অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৩০-১১-১৯১৯) দ্রষ্টব্য (Modern Review, January 1920)

৫। অ্যানি বেশান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী ও খোলাচিঠির অংশ দ্রষ্টব্য:- "অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণ ও ভারতরক্ষা আইনের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ / নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ - রবীন্দ্রসংখ্যায়, (১৯৮২)।

৬। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি - চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী) ষষ্ঠখন্ড

৭। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠি - চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী) নবম খন্ড

৮। অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা চিঠি - চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী) একাদশ খন্ড

৯। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠি (১৯৩৯) দ্রষ্টব্য পত্র নং ১৮, সাহিত্যসংখ্যা দেশ ১৩৭৯

১০। চিত্তরঞ্জনের শোকসভায় প্রেরিত বাণী - দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৭৭।

১১। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশকে লেখা চিঠি — দেশ ২৩-৮-১৯৭৫, ও ১২-৭-৭৫ ও সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬

১২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি - দেশ ২৮-৭-১৯৯০

১৩। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি - দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩।

১৪। গান্ধীকে লেখা চিঠি (১২-৪-১৯১৯) দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রজীবনী' (তৃতীয় খন্ড) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৫। আমেরিকায় সংবাদিকের কাছে গান্ধী সম্পর্কে উক্তি : - দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র জীবনী (ঐ)

১৬। এন্ডরুজকে লেখা চিঠি - রবীন্দ্রনাথ - এন্ডরুজ পত্রাবলী (বিশ্বভারতী) মলিনা রায় অনূদিত)

বিয়াল্লিশে গোপন কংগ্রেস রেডিও

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

তারিখ	:	১৯ অক্টোবর ১৯৪২
স্টেশনের নাম	:	বেআইনি কংগ্রেস রেডিও
ওয়েভলেংথ	:	৪১.৪২ মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	:	৭.১২ এম সি -৭১২০ কে সি
শুরু	:	রাত্রি ৯.৭
শেষ	:	রাত্রি ৯.১৭
		খবর

ভাষা : ইংরেজি কণ্ঠস্বর : পুরুষ

ভারতের কোনও একটি জায়গা থেকে কংগ্রেস রেডিও, খবর পড়ছি, ৪১.৪২ মিটারে।

এখন আমরা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেব। প্রশ্নগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনেককে চিন্তায় ফেলেছে। অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছি।

প্রশ্ন ১ : সৈন্যরা যে আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করছে, এই গণধর্ষণ আমরা কীভাবে বাধা দেব?

উত্তর : কোনও দ্বিধা নেই এ বিষয়ে। আমাদের উত্তর : আপনারা যেভাবে পারুন বাধা দিন। অবশ্য অহিংস পথে বাধা দিতে পারলে ভালো। তবে আপনারা যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, যদি আপনারা বেঁচে থাকেন, তাহলে মারুন না হয় মরুন। ধর্ষণের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। একজন ভারতীয়ের পক্ষে ধর্ষণের মতো পাশব কর্ম আর কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন ২ : আমাদের শহর ছাড়তে বলছেন কেন? গ্রামে গিয়ে আমরা কী করব? না খেয়ে মরব?

উত্তর : শহরেই বরং আপনার না খেয়ে মরার বেশি সম্ভাবনা। আপনি কি জানেন না, এই ঠকবাজ সরকার খাদ্যশস্য, চিনি, আর এই রকম সব পণ্য দেশের বাইরে পাচার করে দিচ্ছে? আপনার এটাও জানা উচিত। আমাদের কৃষকেরা এখন অনেক সেয়ানা হয়ে গেছেন, সরকারের কাগুজে টাকার জন্য তাঁরা তাঁদের শস্য হাতছাড়া করছেন না। শহরে এখনই খাদ্যাভাব ঘটছে, সামনেই দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। গ্রামে অন্তত খাবারটা পাবেন আপনি। অবশ্য যদি কৃষকেরা শস্য বেচে দিয়ে না থাকেন।

প্রশ্ন ৩ : আপনারা লোকজনকে বলছেন সিনেমায় না যেতে। সিনেমার ট্যাক্স বাবদ সরকারের আয় হয়। আপনারা বড়লোকদের বলছেন না কেন, ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে?

উত্তর : আমরা সবাইকেই বলছি, বড়লোকদেরও, সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করতে।

কিন্তু আমাদের প্রকৃত শক্তি আছে জনসাধরণের হাতে। সিনেমায় যাঁরা যাচ্ছেন তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যে তাঁদের দেওয়া বিনোদন করে ঠকবাজ সরকারেরই সুবিধা হচ্ছে। কেউই তাঁদের বাধ্য করতে পারেন না এই কর দিতে। আধুনিক জীবনযাত্রার দিকে চোখ মেলে দেখুন - মাকড়সার জালের মতো এই জীবনযাত্রা - তন্তুতে তন্তুতে জড়িয়ে আছে, সহস্র সহস্র তন্তু। সিনেমায় যখন যাচ্ছেন আপনি শুধু সরকারকে করই দিচ্ছেন না, যত সব মিথ্যাবাদী খবরের কাগজকেও সাহায্য করছেন সিনেমার বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা রোজগার করতে।

প্রশ্ন ৪ : ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে মার্কিন সমালোচনায় কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় আপনার? চার্চিল কি পালটাবে?

উত্তর : আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যাঁরা এই প্রশ্ন করছেন তাঁরা ভারতের এই নতুন বিপ্লবের মর্ম বুঝতে পারছেন না। চার্চিল পালটাবে কি পালটাবে না, সেটা আমাদের ভেবে দেখবার দরকার নেই। আমাদের দরকার ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য করা। মার্কিন খবরের কাগজগুলো কী লিখছে না লিখছে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, যদিও সেগুলি আমাদের পক্ষেই লিখছে। আমাদের নির্ভর করতে হবে আমাদেরই উপর। চার্চিল আর তার বশংবদেরা আমাদের নামে অপপ্রচার চালিয়েই যাচ্ছে। যদিও এই ব্রিটিশ শাসককুল একটা অদ্ভুত জাত। সন্দেহ হয় ওদের মগজে কী আছে। লিনলিথগোটা বিশেষ করে মূর্খের একশেষ। যে জাহাজে করে সে ইংল্যাণ্ড যাবে, সেই জাহাজ থেকেও সে আমাদের ভারতের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'আমাকে তাড়িয়ে দিও না। যদি টাকায় দশ আনায় তুমি খুসি না হও, বারো আনাই নাও, শুধু আমাকে থাকতে দাও।' বর্তমান পৃথিবীতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর মতো মূর্খ আর কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন ৫ : পোস্টাপিসের ডিপোজিট নিয়ে কিছু বলছেন না কেন? কেন বলছেন না লোকজনকে এই ডিপোজিট তুলে নিতে?

উত্তর : সাধারণভাবে আমরা বলেছি লোকজনকে, ঠকবাজ সরকারের সঙ্গে কোনও রকম সম্বন্ধ না রাখতে। পোস্টাপিসের ডিপোজিট স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে নেওয়ার জন্য আমরা আরও একটা কারণ দেখাতে পারি। আসলে, লোকজন টাকা তুলেই নিচ্ছেন। যুদ্ধের ঠিক আগে, পোস্টাপিস সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা ছিল ৮২ কোটি টাকা। আজকে সেটা কমে হয়েছে ৫১ কোটি টাকা, অর্থাৎ আগে যা ছিল তার প্রায় অর্ধেক। এর থেকেই বুঝতে পারছেন ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব কি রকম নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে সরকারের ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রি হয়েছিল ৬৫ কোটি টাকা, আজ সেটা কমে হয়েছে ৩৯ কোটি। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধে ব্রিটিশরা হারছে, ফলে গত তিন বছরে পোস্টাপিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক আর ক্যাশ সার্টিফিকেটে টান পড়েছে। লোকজন যে টাকা তুলে নিচ্ছেন তাতেই বোঝা যাচ্ছে সরকারে আস্থা রেখে টাকা রাখতে তাঁরা আর ভরসা পাচ্ছেন না।

সরকার নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে, জনসাধারণের সরকারে আস্থা কমে যাচ্ছে, যুদ্ধে তারা হারছে, এতে চিন্তার কারণ আছে বৈকি। পোস্টাপিসের টাকা তুলে নেওয়ার আরও কারণ আছে। পোস্টাপিসে জনসাধারণের জমানো এই বিরাট টাকা দিয়ে সরকার ভারতীয়দের হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছে, ঠকবাজ সরকার এই টাকা দিয়েই ধসে-যাওয়া অর্থনীতি সামলানোর চেষ্টা করছে। আমাদের সবারই উচিত পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে নেওয়া, ক্যাশ সার্টিফিকেট বেচে দেওয়া। পোস্টাপিসে টাকা রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। এখনও সময় আছে, টাকাটা তুলে নিন।

প্রশ্ন ৬ : টাকা ছাপিয়ে ভারতের ব্যবসা আর শিল্পকে ... (অস্পষ্ট) মূল্যস্ফীতির কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?

উত্তর : মুদ্রাব্যবস্থার একটি মূল নীতি কী? দেশে উৎপাদনের, ব্যবসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে টাকা ছাপানো উচিত, যাতে টাকার দাম না পড়ে যায়। যুদ্ধের সময় হোক শান্তির সময় হোক, এটাই আর্থিক সুব্যবস্থার নিয়ম। যুদ্ধের সময় অবশ্যই উৎপাদনের সঙ্গে টাকা ছাপানোর গরমিল হয়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা মেনে নিতেই হয়। দেশে তেমন তামা নেই, অথচ খুচরো টাকা বাজিয়ে চলাও তেমন অস্বাভাবিক নয়, যখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে। ভারতে বর্তমানে আমরা কি দেখছি? ১৯৪২-এর আগস্টের শেষে চালু টাকার পরিমাণ শতকরা পঁচাত্তর বেড়ে গেছে যুদ্ধ লাগার পর, আর উৎপাদন ও ব্যবসা বেড়েছে মাত্র শতকরা পঁয়ত্রিশ। ফলে, পাইকারি আর খুচরো দর দুটোই আকাশ ছোঁয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় জীবনযাত্রার খরচ ১৯৩৯-এ ১০০ থেকে আগস্ট ১৯৪২-এ ১৯২-তে ঠেকেছে — শতকরা ৯২ বৃদ্ধি। এই একই সময়ে, বোম্বাইতে পণ্যের পাইকারি দাম আর জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ১১৮ আর ৬০। অর্থাৎ প্রমাণ পাওয়া যচ্ছে, যে পরিমাণ টাকা ছাপানো হচ্ছে তার কোনও যথার্থ নেই, উৎপাদন আর ব্যবসা সেই পরিমাণে বাড়েনি। এই অনর্থক টাকা ছাড়ার জন্যই জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে গত কয়েক মাসে। আমরা এখন যাকে বলে মূল্যস্ফীতি তার মধ্যেই রয়েছি। টাকা ছাপিয়ে ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকার কাগজের নোট ছাপিয়ে ছাপিয়ে আমাদের যথেষ্ট সেবা করছে! কাগুজে টাকা মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে। ওই টাকায় হাত দেবেন না।

আপনারা এতক্ষণ কিছু প্রশ্ন আর উত্তর শুনলেন।

কংগ্রেস রেডিও থেকে বলছি। ভারতের কোনও অংশ থেকে, ৪২.৩৪ মিটারে। আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ। আমরা আবার সম্প্রচার করব কাল সকাল সাড়ে আটটায়। তখন আপনাদের গত পনেরো দিনের খবরের পর্যালোচনা করব।

সবাইকে শুভরাত্রি জানাই। শুভ রাত্রি।

* * *

কংগ্রেস রেডিও খবর দেওয়া সুরু করে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তারিখে। রেডিও স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয় ২ নভেম্বর ১৯৪২।

সময়টা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে সুভাষ চন্দ্র বসু জার্মানি থেকে আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ ভারতবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। জাপান ব্রিটিশদের আক্রমণ করে ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সিঙ্গাপুরের পতন হয়। পরপর দখল হয়ে যায় মালয়, বার্মা, আন্দামান নিকোবর। ভারত দখলের পথে জাপান, এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। কলকাতার পতন হলে ভারতের পতন ঘটবে, কেননা কলকাতা হাতছাড়া হলে যুদ্ধের অস্ত্র উৎপাদন ভারতে অর্ধেক হয়ে যাবে, জানালেন লর্ড লিনলিথগো চার্চিলকে। এমনই একটা অবস্থায় বোম্বাইতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ৭-৮ আগস্ট ১৯৪২-এ ডাক দিল অহিংস উপায়ে গণ-আন্দোলনের। গান্ধী বললেন ব্রিটিশকে, ভারত ছাড়। ভারতবাসীদের বললেন - করো বা মরো, ড়ু অর ডাই, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কী করতে হবে? পরিষ্কার বলা হলো না। ভারত স্বাধীন করতে হবে, কিন্তু কীভাবে? অহিংস গণ আন্দোলন? সে তো চলছে ১৯২০ থেকে। ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার কোনও লক্ষণ নেই। হঠাৎ কংগ্রেস আর গান্ধী তেড়েফুঁড়ে উঠলেন কেন। অবশ্য তাঁদের আর স্পষ্ট কথা বলার দায় রইল না, ৯ আগস্ট সব কংগ্রেস নেতা জেলে চলে গেলেন।

এই অবস্থায় যাঁরা ভারতে আন্দোলন চালিয়ে গেলেন, তাঁদের অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাম মনোহর লোহিয়া। বোম্বাইতে তাঁরই পরামর্শে এবং অর্থসাহায্যে কংগ্রেস রেডিও আগস্ট বিপ্লবের কথা বলে যাচ্ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর এত তীব্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ভারতে হয় নি। জাপানের পূর্ব এশিয়ায় আগ্রাসন ব্রিটিশদের নড়বড়ে করে দেয়। সেই সময়ে পাড়াগাঁয়ে একটি ছড়া বাচ্চাদের মুখেমুখে ঘুরত

সারেগামাপাধানি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের মধ্যে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ।

কংগ্রেস রেডিওকে জাপানিদের পঞ্চম বাহিনী, ফিফথ কলাম, প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাপানি পঞ্চম বাহিনী প্রমাণ করার ব্যস্ততা কেন, জানতে হলে, সেই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থানগুলোর চালচিত্র জেনে নেওয়া দরকার।

১৯৩৯-এর বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের নেতারা কি মনোভাব নেবেন ঠিক করতে পারেন নি। তাঁদের সংগ্রাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ব্রিটিশরা লড়ছে ফ্যাসিস্ট জার্মানি আর ইটালির সঙ্গে। তাহলে ব্রিটিশদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক কি হবে, সেই বিষয়ে গান্ধী, নেহেরু, আজাদ, রাজা গোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদরা উল্টেপাল্টে বিবৃতি দিতে লাগলেন, কংগ্রেসের নানা সিদ্ধান্তের নানান অর্থ সম্ভব। নেতারা কখনও বলেন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত, তাদের যুদ্ধপ্রয়াসকে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই সময় ধর্মঘট টর্মঘট না করাই উচিত। কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে কথা না বলে ভারতকে যুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়েছে কি সরকারের, এমন অভিমানও তাঁরা প্রকাশ করতে থাকলেন। যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ দূরে ইয়োরোপে আবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত আলোচনাটা তাত্ত্বিক পর্যায়ে ছিল, কিন্তু জাপানের

যুদ্ধে নেমে পড়া, যুদ্ধ ভারতের ঘাড়ের উপর এসে পড়াতে আলোচনাটা তত নিরাপদ থাকল না।

এরই মধ্যে জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ(২২ জুন ১৯৪১) ভারতের বামপন্থীদের বিভ্রান্ত করল। যত দিন ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা রাশিয়াকে খতম করায় উৎসাহী ছিল তত দিন বামপন্থীদের বিভ্রান্তি ছিল না, তারা যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে এর সঙ্গে সহযোগিতা না করার অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া মিত্রশক্তিতে যোগ দেওয়ায়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো জনযুদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া একটি পত্রিকাই প্রকাশ করে ফেলল দি পিপলস ওয়ার। কমিউনিস্টদের দ্বিধার কোনও কারণ ছিল না, সোভিয়েট রাশিয়া না টিকলে বিশ্ব কমিউনিজমও টিকবে না। কারণ, কমিনটার্ন-এর বকলমে রাশিয়ার অর্থ সাহায্য, পরামর্শ, উৎসাহেই চলে তখনকার সিপিআই। জনযুদ্ধ সমর্থন করায় বেআইনি সিপিআই বৈধ দল স্বীকৃত হলো ২৪ জুলাই ১৯৪২। সিপিআই তখন থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সরকারিভাবে সরকারকে সহযোগিতা শুরু করল। সন্দেহ হতে লাগল কমিউনিস্টরা ব্রিটিশবিরোধীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে — যার এক প্রকাশ সতীনাথ ভাদুড়ির জাগরী উপন্যাস।

অন্যান্য বামপন্থী দলের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এ বাঙলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিয়েছিল, সেই দল সরকারের কাছে পুরো আনুগত্য প্রকাশ করছে। বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়াও সরকারের কাছে আনুগত্য ঘোষণা করল। সিপিআইয়ের আনুগত্য অবশ্য এত দৃঢ় ছিল না। কমিনটার্নের ষষ্ঠ এবং সপ্তম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়াকে রক্ষা করাই আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের প্রথম লক্ষ্য। ১৯৩৬ সালে এক ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতা করাই কমিউনিস্টদের কর্তব্য যদি ঘটনাচক্রে সোভিয়েট রাশিয়াকে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় তাহলেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতা অনড় থাকবে। কিন্তু সত্যিসত্যিই সেই ঘটনা ঘটল যখন, তখন ব্রিটিশ বিরোধিতা অপসৃত হলো। নেতাদের এই দ্বিচারিতায় এই পর্যায়ে কংগ্রেসিদের মতো কমিউনিস্টদের সংগ্রাম ও স্তিমিত হয়ে যায়।

দোলাচল কাটিয়ে সিপিআই যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত করল, তখন অবশ্য সেই পার্টি অস্পষ্টতার ধার ধারে নি। সিপিআই-এর প্রথম কংগ্রেসে, ২৩ মে ১৯৪৩, বোম্বাই, সেই দল জানিয়ে দিল, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, ট্রটস্কিপন্থীদের তারা জাপানের পঞ্চম বাহিনী মনে করে, জাপানি আক্রমণ হলে এই দলগুলো জাপানের হাতে ভারতকে তুলে দেবে, সে বিষয়ে সিপিআই-এর কোনও সন্দেহ নেই।

বামপন্থীদের এই অবস্থানের পর এবার আমরা লক্ষ্য করতে পারি কংগ্রেস রেডিও জাপান সম্পর্কে কী বলছে। তার আগে অবশ্য জানতে হবে কংগ্রেস রেডিওটা কি, কে বা কারা কোথায় চালাচ্ছিল।

এই রেডিও স্টেশনটা চলেছিল বোম্বাইয়ের এই এই জায়গা থেকে :

সী ভিউ বিল্ডিং (চৌপাট্টি)	:	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২
রতন মহল (ওয়াকেশ্বর রোড)	:	১০ ” ”

অজিত ভিলা (লাবুরনুম রোড)	:	২৫ ” ”
লক্ষ্মী ভবন (স্যাণ্ডহার্স্ট রোড)	:	৪ অক্টোবর ”
পারেখ ওয়াদি (গিরগাঁও ব্যাক রোড)	:	১৫ ” ”
প্যারাডাইস বাঙলো (মহালক্ষ্মী মন্দির)	:	২৩ ” ”

পুলিসের অভিযানে ১২ নভেম্বর ১৯৪২ স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। গোপনীয়তার জন্য বারেবারে স্টেশনটি জায়গা বদল করেছিল। খবর পড়ার আগে ‘হিন্দুস্থান হামারা’ আর শেষে ‘বন্দে মাতরম’ গান রেকর্ডে বাজানো হতো, সমবেত কণ্ঠে গাওয়া গানের রেকর্ড। স্টেশনের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি খুব শক্তিমান ছিল না, প্রায়ই শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যেত, সম্প্রচারের পরিধিও ছিল ছোট। বোম্বাই ছাড়া নাসিকেও রিলে স্টেশন ছিল। একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ রেডিও, জাপানি প্রোপাগাণ্ডা, নাৎসি প্রোপাগাণ্ডা, আর তার সঙ্গে কংগ্রেস রেডিও যাঁরা শুনতেন তাঁদের বিহ্বল হয়ে যাওয়ারই কথা। আশ্চর্য নয়, কংগ্রেস রেডিওকেও ব্রিটিশ সরকার জাপানি পঞ্চম বাহিনী বলে গণ্য করেছিল।

কংগ্রেস রেডিও চালানোর জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন, বিঠলদাস মাধবজি খাখর (বয়স ২০, গুজরাটি), বিঠলদাস কাঁথারভাই জাভেরি (২৮, গুজরাটি), নানেক গোরাচাঁদ মোতোয়ানি (৪০, সিন্ধি), উষা মেহতা (২২, গুজরাটি), চন্দ্রকান্ত বাবুভাই জাভেরি (২৩, গুজরাটি), জগন্নাথ রঘুনাথ ঠাকুর (২৭, ভাণ্ডারি হিন্দু) আর নরিম্যান আবারবাদ প্রিন্টার (৪০, পার্সি)। খাখর স্কুলেও বেশিদিন পড়াশুনা করেন নি। প্রিন্টারের সঙ্গে ব্যবসা করতেন কেরোগ্যাস মেশিন বিক্রি করে। কেরোসিনে গাড়ি চলে, সেই কেরোগ্যাস। কংগ্রেস রেডিও’র ইনিই ছিলেন মূল লোক। রাম মনোহর লোহিয়ার উপদেশে আর অর্থে চালাতেন স্টেশনটি। বিঠলদাস জাভেরি কংগ্রেসি রাজনীতি করতেন, আইন অমান্য আন্দোলনে জেলেও গিয়েছিলেন। মোতোয়ানি বেতার বিশেষজ্ঞ, শিকাগো রেডিও অ্যাণ্ড টেলিফোন কোম্পানির ডিরেক্টর। কংগ্রেসি মনোভাবাপন্ন। ৮ আগস্টের বোম্বাই এআইসিসি অধিবেশনের চলচ্চিত্র তোলেন শিকাগো রেডিওর পক্ষে, সেই বক্তৃতাগুলো শোনানো হতো কংগ্রেস রেডিওতে। উষা এম এ পাঠরতা ছিলেন, খাখরের সহকর্মী, রেডিও সম্প্রচারের জন্য রেকর্ড তৈরি করতেন, রাম মনোহর লোহিয়ার বক্তৃতাগুলো তিনিই রেকর্ড করতেন, ট্রান্সমিটার চালাতেন, প্রায়োজনমতো ঘোষণার কাজ করতেন রেডিওতে। চন্দ্রকান্ত জাভেরি অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তবে বিশেষ কোনও যোগ ছিল না তাঁর কংগ্রেস রেডিওর সঙ্গে। জগন্নাথ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। প্রিন্টারের সঙ্গে কংগ্রেসের তেমন যোগ ছিল না, তিনি ছিলেন নেহাৎই প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবসায়ী।

কংগ্রেস রেডিওর খবর পাওয়ার পর বোম্বাই পুলিশ-এর সম্প্রচারের মনিটর করা শুরু করে ৮ অক্টোবর ১৯৪২ থেকে শেষ দিন পর্যন্ত। বিচারের পর বিঠলদাস খাখরের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, উষার চার বছর, চন্দ্রকান্তের এক বছর। বাকিরা ছাড়া পান।

রেডিও কংগ্রেসে যে খবর পড়া হতো, তার বিশেষ বিশেষ অংশ : ১২ অক্টোবর। আজ ঈদ। ব্রিটিশ সরকার মিথ্যা বলেই চলেছে। বলা হচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম মুষ্টিমেয় কিছু লোক চালাচ্ছে। বলা হচ্ছে নয় কোটি মুসলমান এই সংগ্রামে নেই। মিথ্যায় ভুলবেন না। মুসলমান, হিন্দু, পার্সি, খ্রিষ্টান সবাই আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়ছেন।...

জাপানে কি ভারত আক্রমণ করবে? না। তারা তাদের অধিকৃত স্থানগুলো রক্ষায় ব্যস্ত। আর যদি আক্রমণ করেও, জাপানকে মোকাবিলা করা হবে।...

মালে বোঝাই পাঁচটা ব্রিটিশ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় পঞ্চান্ন মিনিট ধরে বিমান আক্রমণের বিপদসঙ্কেত বাজানো হয়েছে। এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, জাপানি আক্রমণ ঘটলে ব্রিটিশ শাসন একেবারে নড়বড়ে হয়ে যাবে, যা আগেই দেখা গেছে। আপনারা তৈরি রাখুন সরকারি শাসনযন্ত্র হাতে তুলে নিতে, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ঘোষণা করতে, জাতীয় পতাকা তুলে ধরতে। ব্রিটিশ গুণ্ডামিতে শুধু কলকাতা শহরে মৃতের সংখ্যা ৫৫০ ছাড়িয়ে গেছে।...

২০ অক্টোবর। বিপ্লবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। এটা সত্য যে এমন সময় আসবে যখন শহরের লোকেরা খাবার পাবেন না। শহরে শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। ব্রিটিশ সরকার আমাদের সব ঐশ্বর্য যুদ্ধে লাগিয়ে আমাদের দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শহর আর গ্রামের মধ্যে সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিল। কৃত্রিম উপায়ে প্রদেশে প্রদেশে ভাগ করে সরকার আমাদের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করেছে তা অগ্রাহ্য করুন। কৃষকদের হাতে যাতে ফসল থাকে তার ব্যবস্থা করুন। শহরে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করুন। শহরের লোকেরা গ্রামে গিয়ে কাজ করুন। গ্রামে যা আছে তাতেই শহর থেকে আসা লোকের চলবে। গান্ধীর করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের এটাই নির্দেশ। কৃষকেরা যদি ফসল বিক্রি না করেন তাহলেই সরকারের চাকা থেমে যাবে। মিলিটারি খাবার জিনিস পাবে না। এটা অবশ্য সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। কৃষক, জমিদার আর মহাজনদের ঐক্য দরকার এই সন্ধিক্ষণে। এই ঐক্য সাধিত হলে মিলিটারির পক্ষে গ্রামে ঢোকা অসম্ভব হবে। যখন মাতৃভূমি শৃঙ্খলাবদ্ধ তখন কারখানায় কাজ করে শ্রমিকেরা সরকারের যুদ্ধ প্রয়াসে সাহায্য করছেন। গত দুমাসে আমেদাবাদের শ্রমিকেরা এক থেকে সওয়া কোটি টাকার লোকসান সহ্য করেছেন। এক লাখ শ্রমিক সোওয়া কোটি টাকার লোকসান সহ্য করেছেন, আমেদাবাদ সেটা প্রমাণ করেছে। এটা মিথ্যা কথা, যে কদিন কাজ করেন নি সে কটা দিনের মাইনে তাঁরা পেয়েছেন। বড় লোকেরা অবশ্য লোকসান সহ্য করতে রাজি নন। আপনারা শ্রমিকদের পরামর্শ দিন। এই বিপ্লব গরিবের বিপ্লব। ধনীদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য তাঁরা প্রত্যাশা করেন না।

২২ অক্টোবর : অর্থশক্তির বর্ণকৌশল নিয়ে কিছুকাল আগে নয়া দিল্লি খুব ভাবিত হয়ে পড়েছিল। নয়া দিল্লির দুর্ভাবনা একেবারেই ভিত্তিহীন। নয়া দিল্লি ভাবছে, পূর্ব থেকে জাপান আর উত্তর থেকে জার্মানি আক্রমণ করে নয়া দিল্লিতে এসে হাত মেলাবে। খুব বিশদভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে হিটলার আর তোজো দিল্লিতে এসে কীভাবে কদমদন করবেন। স্ট্যালিনগ্রাডে রাশিয়ানদের দুর্মর প্রতিরোধে, স্ট্যালিনগ্রাডের পতন না হওয়ায়, ঠকবাজ ব্রিটিশরা, যারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তারা আবার চাগিয়ে উঠেছে। ব্রিটিশরা বার্মা আক্রমণ করার কথাও বলছে। এটা কি স্ফটিকের বলের মধ্যে ভবিষ্যৎ দেখা, না ব্রিটিশ সৈন্যের শক্তিসঞ্চার, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক আমাদের ভারতীয়দের এই রকম মিথ্যা আশ্বাসে বসে থাকা নিরাপদ নয়, ভারতে ব্রিটিশরাই থাকে, ওদের পালানোর জায়গা নেই। স্ট্যালিনগ্রাড যদি পড়ে যায় ... আর জার্মানি যদি বেলুচিস্তান বা সীমান্ত প্রদেশে ঢুকে পড়ে, আর যদি জাপান

আসাম, পূর্ববঙ্গ আর উড়িষ্যায় ঢোকে। কখন যে এটা ঘটবে সেটা বলা মুশকিল। জার্মান সৈন্যের হয়ত কিছুকাল বিশ্রাম প্রয়োজন, শক্তি সংহত করারজন্য সময় লাগতে পারে। আবার, জাপান হয়ত একাই পূর্ব-ভারত আক্রমণ করবে। সুতরাং অক্ষশক্তি উত্তর বা পূর্ব দুদিক থেকেই আক্রমণ করতে পারে, কোনটাই উপেক্ষা করা চলে না। সেক্ষেত্রে ভারত কি করবে? যদি অক্ষশক্তির আক্রমণের আগেই আমরা ঠকবাজ ব্রিটিশদের তাড়িয়ে স্বাধীন সরকার গড়ে তুলতে পারি, আমাদের রাস্তা স্পষ্ট। হয় অক্ষশক্তির ফিরে যেতে হবে অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু স্বাধীন সরকার গড়ার আগেই যদি অক্ষশক্তি ঢুকে পড়ে? সেই ক্ষেত্রে, আমাদের দেশে দুটো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে — একটা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে, আর একটা ঠকবাজ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ। যদি সেটাই ঘটে, আমাদের ভারতীয়দের আমাদের নিজেদের যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, যাতে ঠকবাজ সরকার নিঃশক্তি হয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে হতোদ্যম হয়ে পড়বে... (অস্পষ্ট) নতুন শত্রুর আক্রমণ হলে আমাদের আরো বেশি উদ্যম নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। প্রথমত, এই সংগ্রামের সাফল্যের সম্ভাবনা আরো বেশি। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতের পক্ষে অক্ষশক্তির মোকাবিলা করা আরো বেশি প্রয়োজন, সেই শক্তি ভারতে ঢুকে পড়ার আগেই। আক্রমণের শুরু আর আমাদের দেশ অধিকার করে নেওয়ার মধ্যে দুটো পর্যায় আছে : একটা মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা আর একটি বাস্তবক্ষেত্রে শূন্যতা। যখন আক্রমণ ঘটবে (অস্পষ্ট) এক হাজার মাইল বা তারও বেশি — কিন্তু সেটা কুড়ি মাইলের বেশি হতে পারে না। এই অধিকার অবশ্যই আঁকাবাঁকা পথেই হবে, টানা অধিকার হতে পারে না। এই কুড়ি মাইলের মধ্যে অক্ষশক্তির ইস্পাতের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্পাতের সংগ্রাম চলবে — এই অবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষে করার কিছুই নেই... তবে পিছন থেকে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রের পিছনে বৃহৎ যে ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এর পরিণাম বেশ তীব্র হবেই। এই বৃহৎ পশ্চাৎ ক্ষেত্রে, সেটা পাঁচশো মাইল হতে পারে হাজার মাইল হতে পারে, আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে। ঠকবাজ সরকারের দম ফুরিয়ে যাবে, সরকারের পতনও হতে পারে। এর শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে, বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে (অস্পষ্ট)। মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা থেকে বাস্তবিক শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেরি হবে না। ঠকবাজ শাসনযন্ত্র, এর লোকলস্কর পালাতে শুরু করবে, শাসনযন্ত্র দেখাশুনার লোকজন থাকবে না, ভেঙেই পড়বে। এই দুই পর্যায় — মনস্তাত্ত্বিক আর বাস্তব শূন্যতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হতে পারে (অস্পষ্ট) এটা স্পষ্ট যে বাস্তব শূন্যতার সময়েই স্বাধীন সরকার গড়ার প্রকৃত সময়। এটা হবেই।

২৭ অক্টোবর : সরকারের ঘোষণা থেকে জানা যাচ্ছে জাপান চট্টগ্রাম আর আসামে বোমা ফেলেছে। সরকার বলছে, ক্ষয়ক্ষতি সামান্য। সেটা সত্য নয়। বোঝা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেই স্থলপথে জাপানি আক্রমণ ঘটবে। ভারতীয়দের আশু কর্তব্য, শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া, কলেকারখানায় কাজ এখনই বন্ধ করা দরকার।

২৯ অক্টোবর : প্রত্যেক ভারতীয়কে দশটা কর্তব্য করতে হবে।

১। ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনও রকম, সরকারের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখা

চলবে না। ওদের যদি টাকা দেন, বা ওদের কাছ থেকে টাকা নেন, জানবেন সেই টাকা দেশবাসীর রক্তে ডোবানো টাকা।

২। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে জানালায় ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়াবেন।

৩। ফিল্ম দেখবেন না। কাউকে দেখতে দেবেন না। দিলে সরকারের পকেটেই টাকাটা যাবে।

৪। আদালতে ঢোকা পাপ মনে করবেন।

৫। বিদেশি পণ্য কিনবেন না।

৬। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিন।

৭। অত্যাচারী সরকারের চাকরদের বয়কট করুন।

৮। এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনাকে কোর্টে যেতে হয়।

৯। শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যান।

১০। ফসল আর অন্যান্য পণ্য যাতে কৃষকের ঘরে থাকে তার ব্যবস্থা করুন।

৩০ অক্টোবর : আপনারা জানেন তিন বছর ধরে ভারত যুদ্ধের মধ্যে আছে। এতদিন আমরা সব রকম চেষ্টা করেছি যাতে ব্রিটিশদের কোনও রকম অসুবিধা না হয়, শত্রুকে মোকাবিলা করায় তারা যেন দুর্বল না হয়। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীনতার দাবি করছি, কেননা আমরা জানি, সব রকম অস্ত্র এবং শিক্ষিত সৈন্য সত্ত্বেও তারা সিঙ্গাপুর, হংকং মালয় আর বার্মা রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি... এখন বুঝতে পারছি ইংরেজদের পক্ষে আমাদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। তারা নিজেরাও মরছে আমাদেরও মারছে। আমরা বলছি আমাদের হাতে দেশকে রক্ষা করার ভার দিন। প্রথমত, জাপান কখনই আক্রমণ করবে না। যদি করেও তাহলে চল্লিশ কোটি ভারতীয় কাঁধে কাধ মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। মালয়ে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ হেরেছে, কেননা সেখানকার জনগণের সহানুভূতি তারা পায় নি। যদি আমাদের পরামর্শ ব্রিটিশ শোনে, তারা এই সুযোগ হারাবে না। এর উপর নির্ভর করে আমরা এই প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছি, অহিংস উপায়ে। আজ আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। এর পর আমরা ব্রিটিশ সরকারকে স্বীকার করব না, তার আইনও মানব না। আমরা এই প্রদেশের মানুষকে, সীমান্তবর্তী উপজাতিদের অনুরোধ করছি, জাপানি প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

কংগ্রেস রেডিওর শুধু সেই সব অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো, যেখানে জাপানের প্রসঙ্গ এসেছে। ৯ আগস্ট ১৯৪২-এর পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না, দেশময় আন্দোলনের কোনও খবর ছাপার অধিকার ছিল না খবরের কাগজে। গোপন রেডিও ছিল অন্যতম বাহন যার মাধ্যমে আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারি অত্যাচার এবং তৎসত্ত্বেও আন্দোলন ছড়িয়ে খবর প্রচার হতো। এই রেডিওতে ভারতের অর্থনীতি, স্বাধীনতার তত্ত্ব, আন্দোলনের খুঁটিনাটি প্রচার করা হতো। কোনও কোনও সময় ১ মিনিট, দুমিনিট, কখনও কখনও দশবারো মিনিট চলত সম্প্রচার। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল টেলিগ্রাফের পোস্ট ভাঙা আর তার ছেঁড়া, রেলওয়ের লাইন ভাঙা, স্টেশন ভাঙচুর করা — উদ্দেশ্য সরকারি যোগাযোগের সূত্রগুলো নষ্ট করা। কোথায় কোথায় সূত্রগুলো ভাঙা গেল, তার খবর দিত

এই রেডিও।

কংগ্রেস রেডিও সরকারের কানে আসার পর বোম্বাই সরকার অনুসন্ধান শুরু করে। এই রেডিওর সঙ্গে জাপানি রেডিওর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করে বোম্বাই সরকারের এইচ.ভি.আর আয়েঙ্গার মত দেন, কংগ্রেস রেডিও ব্রিটিশবিরোধী বটে তবে জাপানের চর নয়। টোকিও, সাইগন থেকে প্রচারিত জাপানি প্রচার আর কংগ্রেস রেডিওর প্রচার সমজাতীয় নয়। কংগ্রেস রেডিও জাপানকে উল্লসিত, এমন কি সাহায্যও করে থাকতে পারে, তবে সেটা কংগ্রেস রেডিওর উদ্দেশ্য ছিল না। এই রেডিও অবশ্যই ব্রিটিশ শাসনের অপপ্রচার করত, অত্যাচারের কথা বানিয়ে বলত, দমননিপীড়নের কথা বাড়িয়ে বলত, আন্দোলনের সাফল্য অতিরঞ্জিত করত, তবে জাপানের অনুগামী এটা ছিল না। জাপান বলত, আমরা তোমাদের বন্ধু, তোমাদের স্বাধীন করতে আমরা আসছি। কংগ্রেস রেডিও এই জাতীয় কথা বলত না। তারা বলত, ব্রিটিশদের তাড়াতে হবে। কিন্তু জাপানিরা না এলে ব্রিটিশদের তারা কী ভাবে তাড়াবে, সে বিষয়ে তাদের কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। আসলে এটা ছিল গান্ধীর সব পরিকল্পনার দুর্বলতা, কংগ্রেস রেডিওরও দুর্বলতা। তাই বলে, বলা চলে না, কংগ্রেস রেডিও জাপান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। এই রেডিওর উদ্যোক্তা রাম মনোহর লোহিয়া সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ আছে। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলটা ব্রিটিশবিরোধী বটে, কিন্তু জাপানপ্রেমিক নয়। আয়েঙ্গারের এই মতকে সমর্থন করেছিলেন বোম্বাই সরকারের আর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী সি এইচ ব্রিস্টো। এই মতামত চেয়েছিলেন ভারত সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, সার রিচার্ড টটেনহাম।

***

আগস্ট ৪২ আন্দোলনের স্থায়িত্ব মোটামুটি আঠারো মাসের। এই আন্দোলনের সময়, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া মনে করছে আন্দোলনকারীরা সব জাপানের পঞ্চম বাহিনী। আন্দোলন কারা করছে? কংগ্রেস আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, কিন্তু কর্মসূচী ঘোষণার আগেই জেলে চলে গেছেন নেতারা। যারা আন্দোলন করছে তাদের মধ্যে আছে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দল (বঙ্গদেশে যেমন রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি, শ্রী সঙ্ঘ ইত্যাদি)। সরকারি নথি অনুযায়ী, পুলিশের ধারণা, গন্ডগোল করছে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছাত্র আর গুণ্ডারা (এবং ভাগ্যিস শ্রমিকেরা নয়)। আর কংগ্রেস এবং তার অনুগামীরা মনে করছে, সিপিআই হলো জাপানের পঞ্চম বাহিনী। সরকারের ধারণা কংগ্রেস, সিপিআই, সব দলই জাপানের পঞ্চম বাহিনী। জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীন করতে হবে এমন কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। জাপান কতটা সাহায্য করবে, কেন করবে, সেই সন্দেহ অবশ্য সুভাষচন্দ্রেরও ছিল। কিন্তু অন্যান্য নেতারা এবং দলগুলো জাপান সম্পর্কে কোনও মোহ পোষণ করেন নি। কিন্তু সরকারের বিশ্বাস, যুদ্ধের মধ্যে ভারতের দাবি মতো পূর্ণ স্বরাজ দিলে, ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করলে, ভারত জাপানের কব্জাতেই চলে যাবে।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন নিয়ে শাসন সূত্র ধরে বহু আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত,

কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেতাদের মতবিরোধ, নেতাদের আদেশ কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের দ্বিধা, সিপিআই-এর সিদ্ধান্ত কিন্তু ব্যক্তিগত কমিউনিস্টদের দ্বিধা (অনেক কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তি বিয়াল্লিশের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, সতীনাথ ভাদুড়ির জাগরী উপন্যাসে অতিতরলীকৃত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও), কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের তত্ত্ব সত্ত্বেও সরকারের সন্দেহ, ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। নতুন তথ্য পাওয়া গেল দিল্লির শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত ও গৌতম চ্যাটার্জি সংকলিত গ্রন্থে : সিক্রেট কংগ্রেস ব্রডকাস্টস অ্যাণ্ড স্টর্মিঙ রেলওয়ে ট্র্যাকস। তথ্য নতুন, তবে ভিন্ন কোনও আলো নেই তাতে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, রাম মনোহর লোহিয়াদের কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির, বিয়াল্লিশের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের লক্ষ্য, জাপান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, এই কংগ্রেস রেডিও থেকে অনুমান করা যায়। সেটা ব্রিটিশবিরোধী, জাপানবিরোধীও। ভারতের কমিউনিস্টরা তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়, যে কোনও ব্যবহারকে তত্ত্বে রূপ দেওয়ার আগ্রহে (যেহেতু মার্কসীয় তত্ত্বে আছে, তত্ত্ব ছাড়া ব্যবহার দিগ্‌ভ্রান্ত হয়), জনযুদ্ধের তত্ত্ব খাড়া করে শত্রু ব্রিটিশ সরকারকে মিত্র গণ্য করেছিল। শত্রুমিত্র চিহ্নিত করার প্রবণতাটা এখনও সমাজ দৃঢ়। এই নতুন মিত্রের সন্ধানে পুরোনো মিত্রদের শত্রু করে তোলার প্রবণতাও সমান।

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব ও রবীন্দ্রনাথ

পিনাকী ভাদুড়ী

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল ১৯১৭ সালে, রাশিয়ায়। ঘটনাটা তত্ত্বগতভাবে মানুষকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল সন্দেহ নেই। শুধু তত্ত্ব নয়, এই বিপ্লবের সূত্র ধরে নানা তথ্য বিশ্বের মানুষকে আলোড়িত করে চলেছে বহুকাল। এই প্রথম জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, দেশব্যাপী শুরু হল কর্মযজ্ঞ, বেকারত্ব প্রায় মুছে গেল। দীর্ঘকাল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যমান স্থির হয়ে রইল, নিজস্ব সম্পদ প্রায় বিলুপ্ত হল, সকল স্তরের মানুষের জন্য কল্যাণব্রত গৃহীত হল। ওয়েলফেয়ার স্টেট হিসেবে রাষ্ট্র সকলকে কাজ দিল, দিল ক্ষুধার অন্ন, দিল শিক্ষার সুযোগ। বৃদ্ধরা বাতিল হলেন না, সমাজের একদা কর্ণধারদের বার্দ্ধক্যজনিত সকল প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এল রাষ্ট্র এবং সমাজ। দেশকে দ্রুত এবং সংগোপনে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রনায়কেরা লৌহযবনিকার অন্তরালে রাখলেন দেশকে। বাইরে থেকে জানাই যাচ্ছে না তখন কি ঘটছে ভেতরে।

এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে যেতে বেশিদিন কিন্তু লাগেনি। যদিও বহুকাল ধরেই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চলছে, কিন্তু প্রকৃত সুযোগটা এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯১৪ থেকে যে যুদ্ধ চলেছিল, রাশিয়ার জার সেই যুদ্ধ লড়েছিল। যুদ্ধের সময়কার ভাঙচুর, অর্থনীতির ভাঙন, এসবের সুযোগ নিয়েই বিপ্লব ঘটে গেল মাত্র দশদিনে। বিপ্লবের নেতা তখনো দেশের বাইরে।

বিপ্লবটা যদিও অত্যন্ত দ্রুত ঘটেছিল, তবু একথা মনে রাখতে হবে যে ভেতরে ভেতরে এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং কাজ চলছিল অনেকদিন থেকেই। সেসব খবরাখবর বাইরে কিছু কিছু আসছে, যদিও চেহারাটা স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ তখনই এসব নিয়ে ভাবছিলেন। নিজের পৈতৃক জমিদারিতে গিয়ে প্রজাদের, সাধারণ মানুষদের দেখছেন, ব্যথিত হচ্ছেন, অসহায় বোধ করছেন। ১৮৯৩ সালের ১৪ই মে একটি চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ — সেটি 'ছিন্নপত্রে' পাওয়া যাবে — তাতে বলেছেন, 'সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানিনে, যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।'

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলেন, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেইজন্যই সোসিয়ালিস্টদের চিন্তাধারাটা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল — এটাকে তিনি বোধহয় শেষ আশ্রয় বলে মনে করছিলেন, যেটা ব্যর্থ হলে বুঝতে হবে 'মানুষ ভারি হতভাগ্য'।

রাশিয়ার বিপ্লব ঘটবার একবছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটির নাম At the Cross- roads — ১৯১৮র জুলাই সংখ্যা Modern Review-তে প্রকাশিত হল রচনাটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, তবে শেষ হতে আর দেরিও নেই। ঐ প্রবন্ধে বিশ্বরাজনীতির যে চেহারাটা কবি দেখিয়েছিলেন তার সংকট সমাধান নিয়েও ভেবেছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই তখনই ঘটে যাওয়া রাশিয়ার বিপ্লব তাঁকে

আন্দোলিত এবং আশান্বিত করে তুলেছিল। তিনি লিখেছিলেন, We know very little of the history of the present revolution in Russia... it is not unlikely that... she will fail, then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the new age. রাশিয়া সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায়নি তখন, তথাপি কবি আশা করে যাচ্ছেন, কারণ তখনো পর্যন্ত মানুষের হাতে আশা করবার মত আর কিছুই আসেনি। কবি এই প্রবন্ধেই বলেছেন, আমরা শুনেছি রাশিয়া সুবিধাবাদী রাজনীতির কঠোর যুক্তিবাদকে বাদ দিয়েছে। কবির মতো সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাই রাশিয়ার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করছিল। মনে হচ্ছিল, শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠো খাবার মুখে তুলে দেওয়াই নয়, এখান থেকেই বেরিয়ে আসবে মানুষের উত্তরণের পথ। Man does not live by bread alone—এই আপ্তবাক্যকে সার্থক করে তুলবে রাশিয়া, রুটির পরবর্তী ধাপে মানুষের রুচির বিবর্তনও সে ঘটিয়ে দেবে, এমন স্বপ্ন মানুষ দেখতে শুরু করেছিল।

জহরলাল নেহরু ১৯২৭ সালে চারদিনের জন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী নিয়ে প্রকাশিত হল Soviet Russia— তার মধ্যে রাশিয়া এবং ভারত, এই দুই কৃষিপ্রধান দেশের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মিল খুঁজেছিলেন নেহরু, বলেছিলেন If Russia finds a satisfactory solution for these, our work in India is made easier.

রবীন্দ্রনাথ দেশভ্রমণে সবসময়েই উৎসুক ছিলেন। প্রথম জীবনে লেখা 'বসুন্ধরা' এবং শেষজীবনের 'ঐকতান', এই দুটি কবিতাতেই তাঁর পৃথিবীকে দেখার আকাঙ্ক্ষা ধরা আছে। এইজন্যই শেষ বয়সে, যখন তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তখনো অত্যুৎসাহ নিয়েই রাশিয়া ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ১৯২৬য়ে যখন প্রথমবার নিমন্ত্রণ আসে তখন শরীরের জন্য যেতে পারেননি। ১৯২৮ সালে এল দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ। এবারে আর দ্বিধা নেই। ১৯৩০য়ের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি সদলবলে মস্কো পৌঁছলেন। সঙ্গে আছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়ম, অমিয় চক্রবর্তী, হ্যারি টিম্বার্স, এবং আইনস্টাইনের কন্যা মার্গারিটা। মাত্র চোদ্দদিন তিনি ছিলেন রাশিয়ায়। ২৫শে সেপ্টেম্বর চলে আসেন, অর্থাৎ এর মধ্যেই তাঁকে তাঁর জীবনের 'তীর্থদর্শন' সেরে নিতে হয়েছিল।

১৯৩০ সালের রাশিয়ার যে ছবি কবির চোখে ধরা দিয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান যে জিনিসটার কথা তিনি বলেছেন, তা হল, ধনগরিমার 'ইতরতা' তিরোহিত। এখানে নির্ধনীর কোন সংকোচ নেই। বিপ্লবের অন্যতম নেতা ট্রটস্কী ছিলেন ধনীর সন্তান। তাঁর পিতা প্রথমে সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলেন — দেশে এ যা ঘটছে, তা ভাল না মন্দ? পরে সব বিচার করে তিনি তাঁর জীবনের এতদিনের বিশ্বাসকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। তাঁর বয়স তখন আশি। সব ক্ষোভ ত্যাগ করে ছেলের কাছে গিয়ে কাজ চাইলেন। সেটা ১৯২০ সালের কথা।

রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গেলেন ততদিনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্টালিন। ট্রটস্কী বিতাড়িত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সারা দেশে চলছে বিরাট কর্মযজ্ঞ।

বিপ্লবের পরে বেশ কিছুকাল দেশে গৃহযুদ্ধ চলেছে। War Communism নামে যে নীতি সরকার নিয়েছিল তাতে উৎপাদনের বড়ো অংশ সরকারকে দিতে হতো। এতে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উৎপাদন কমে যায়। ১৯২৩য়ে গৃহীত হল NEP — National Economic Policy, ট্যাক্স হল Graduated, কিছুটা Private Industry হল, অসন্তোষ কমল খানিকটা। এই অবস্থায় ১৯২৮য়ে নেওয়া হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াকে যেমন তলস্তয় দস্তয়ভস্কির দেশ বলে মান্য করতেন, তেমনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার সময়ে সোভিয়েট লেখকদের সভায় পেত্রভ্ কবিকে ' লোকশিক্ষার খুব বড় কর্মী' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এই সভ্যতা যে কৃত্রিম জীবন গড়ে তুলছে তা থেকে জন্ম নিচ্ছে যত কিছু পীড়া, ভয়াবহ দুর্ভোগ আর দাসবুদ্ধি'। সেই সভ্যতার ফাঁস ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে রাশিয়া। কিন্তু তা' করতে গিয়ে অন্য আরেকরকম জবরদস্তি হচ্ছে কিনা, তা কে বলতে পারে — এমন প্রশ্নও তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ভ্রমণকাহিনী বা পত্রাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে তাঁর মনের উত্তাপ, অপমানের দাহ ছড়িয়ে আছে। দেশভ্রমণের বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে সর্বদা তুলনা করছেন স্বদেশের সঙ্গে। নিজের কর্মক্ষেত্রে তিনি যা করতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি, তাই যেন রাশিয়ায় করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতন গড়েছিলেন, কিন্তু রাজশক্তির অবহেলা আর দেশবাসীর ঔদাসীন্যে তাঁর চেষ্টা সফল হতে পারেনি। যখন তিনি সবটাই ভবিতব্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছেন তখন রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অভিনবত্ব নিয়ে এল। এইজন্যই 'রাশিয়ার চিঠি' এমন পৃথক। এতে হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি আছে, আবেগ বা অলস প্রশ্রয় নেই। নিসর্গবর্ণনার পারিপাট্য প্রায় অনুপস্থিত, পোয়েটিক লিবার্টি নেওয়ারও চেষ্টা নেই। চোদ্দদিনের সফর নিয়ে লেখা পনেরোটি চিঠির পরিসরে তাঁকে ধরিয়ে দিতে হয়েছে তাঁর আশা, হতাশা, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।

রাশিয়ায় কবি ধনগরিমার ইতরতা তিরোহিত হয়েছে দেখে খুশি হয়েছিলেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদেরাও ধনহীনতার লজ্জার কথা বলেছেন, যে কথা কবি বলেছেন অনেকদিন আগেই। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলতে গিয়ে আধুনিক চিন্তাবিদেরা তিনটি বস্তুকে চিহ্নিত করেছেন — Life Sustenance, Self esteem, freedom. জীবনযাপনের জন্য যেখানে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় চিকিৎসা জরুরি, সেখানে আত্মসম্মানও একটি প্রধান বিষয়। ধনীর সামনে নির্ধনী স্বভাবতই নিজেকে অসম্মানিত মনে করে থাকে। অসম্মানিত মানুষ নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে শিক্ষার প্রসার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দেখেছিলেন 'চিত্তের জাগরণ', 'আত্মমর্যাদার আনন্দ'। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের উপকরণ ছিল। ছিল থিয়েটার, ছিল ছবি। শিক্ষা ছাড়া আর যেটা প্রধান ছিল, সেটা হল কৃষি। এখানে Collective farm হচ্ছিল, সেটা নিয়ে জবরদস্তি হচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিষ্কার জবাব পাননি।

রাশিয়ায় ধর্মচর্চা তুলে দেওয়া হচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ধর্ম মানুষকে মেলায় না, বিচ্ছিন্ন করে। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা ভালো।

রবীন্দ্রনাথ অল্পদিনই ছিলেন মস্কোতে। সরকারী তথ্যাদিই তাঁকে দেখতে দেওয়া হয়েছে,

তাদের নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী তাঁকে চলাফেরা করতে হয়েছে। কোন রাষ্ট্রনেতা, কোন মন্ত্রী, কোন সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। তবু ওরই মধ্যে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেশটার ভালোমন্দ বিষয়ে ধারণা গড়ে নিতে পেরেছিলেন, প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার মধ্যেই তিনি বলেছেন যে এদের মধ্যে গুরুতর গলদ আছে। এরা ছাঁচ বানাচ্ছে, ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব টেঁকে না— হয় ছাঁচ ফেটে যাবে, নয়তো মনুষ্যত্ব মরে যাবে বা পুতুল হবে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতার নিদর্শন যে বইতে ধরা আছে, সেখানে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সম্পর্কে বলেছেন, এ ছাঁচ ফেটে যাবেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয় চিঠিতে বলেছেন, রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থাকত। কিন্তু তাঁর পঞ্চম চিঠিতেই যা বললেন তাতে ধরা পড়ল যে মস্কোতে অবস্থিতির মধ্যে এইটুকু সময়েই তাঁর অনুভবের সীমানা প্রসারিত হয়েছে। বিপ্লবী সরকার মানুষের লোভের বাধা দূর করতে চেয়েছিল, সম্পত্তি বানানো নিষেধ করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হল তার আত্মপ্রকাশের উপায়। তার তো অন্য কোন গুণ নেই। এর সমাধান নিয়ে যুগে যুগে ভাবা হয়েছে, কিন্তু কোন পরিষ্কার জবাব এখনো কেউ পায়নি। ব্যক্তিগত লোভ ছাড়াও রাষ্ট্রগত লোভও কারো কমেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মাণি ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছিল। হিটলার যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে, তখন হঠাৎ রাশিয়া এসে পোল্যাণ্ডের খানিকটা নিজের বলে দাবি জানিয়ে গ্রাস করে নেয়। ১৯৩৯য়ে রাশিয়া হঠাৎ ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করায় রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিক্রিয়ায় লেখেন 'অপঘাত' কবিতাটি।

তেরো নম্বর চিঠিতে কবি সরাসরি বলছেন — 'এরা ফ্যাসিস্টদেরই মত। এই কারণে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোন বাধাই মানতে চায় না।... এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।' ১৯৩৫য়ের ১৭ অগস্ট সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, 'আমার সাহিত্য সৃষ্টিকার্যে.. সেই ছাঁচে যা রচিত হয়েছে সে যদিবা ... মূল্যবান হয়, তবু সাহিত্যিক মুসোলিনী বা লেনিন হয়ে ... সেই ছাঁচকে পাকা করে দিতে চাইলে সেটা সইবে না...।' ঐ ১৩নং চিঠিতেই কবি বলেছিলেন এত পীড়ন সত্ত্বেও এরা, 'শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে... এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।'

১৯৮৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতা ডুবচেক ইটালিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাম্মানিক উপাধি নিতে এসে স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়াকে কবি বলেছিলেন, তোমরা যাদের শত্রু মনে কর, তাদের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করে তোমরা কি তোমাদের আদর্শের প্রতি প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছ?... একদিন এই ঘৃণা তোমাদের নিজেদের আদর্শের প্রতিই ঘুরে দাঁড়াবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে।

'রাশিয়ার চিঠি'র শেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নায়কিয়ানাকে মনুষ্যত্বের পক্ষে পরম উপদ্রব বললেন। বললেন ডিকটেটরশিপের মত আপদ রাশিয়ায় অত্যাচার চালাচ্ছে। এছাড়াও বললেন, বর্তমান রুগ্ন যুগে হয়তো বলশেভিজমই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না। ডাক্তারের শাসন ঘুচলেই রোগীর শুভদিন আসবে।

বিংশ শতাব্দীর এই বিপ্লব রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি এর ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, এইটাই দেখা যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেসব রচনা লিখেছেন সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেও তাঁর ধারণার পরিবর্তনটা ধরা পড়বে।

সমাজকে যেসব ব্যাধি পীড়িত করে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন, লিখেছেন নাটক। ১৯২৬য়ে লেখা 'রক্তকরবী' নাটকে তিনি বললেন যে মানুষ এখানে এখন 'দশ পঁচিশের ছক,' 'পিঠে নম্বর দাগা আছে ৬৯৬' — মানুষের এই সংখ্যারূপের অপমানকে কবি কেমন করে অনুভব করেছিলেন কে জানে। রাশিয়ায় তাই আত্মমর্যাদার আনন্দ দেখে খুশি হয়েছিলেন। তবু সেই উদ্দীপনা থেকে মানুষের মুক্তি উন্মোচিত হল না।

১৯২৩য়ে লিখেছিলেন 'রথযাত্রা' নাটক। ১৯৩৭য়ে লেখা 'সমস্যা' প্রবন্ধে কবি বললেন — ' ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল।' 'রথযাত্রা' নাটকে সেই ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই। ওর প্রবন্ধেই বলেছিলেন কারখানায় মানুষকে একটা সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালাই করা হয় বলেই তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। মানুষের বিচারহীন, বিধান কলের চেয়েও সংকীর্ণ হতে পারে — 'রক্তকরবী'তে বললেন সে কথা। তার আগে 'রথযাত্রা' নাটকে ওই ভেদবুদ্ধি সমাজকে কেমন চলৎশক্তিহীন করে দেয় তা দেখালেন।

এই নাটককে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২য়ে আরেকবার ঘষে মেজে নিলেন। নাটকটি কবি লিখেছিলেন রাশিয়া যাবার আগেই, অবশ্য তখন রাশিয়ার বিপ্লব সমাধা হয়ে গিয়েছে। এই নাটকে তিনি সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে তুলে আনলেন সমাজ চালানোর সংকেত। নাটকটি তিনি শেষ করেছিলেন সম্ভবত একটু দ্বিধার মধ্যে, বলেছিলেন, ' দেখো, ভাবো। তৈরি হয়ে থাকো।' ১৯৩০য়ে যখন রাশিয়া ঘুরে আসার পরে নাটকটি নতুন করে লিখলেন, তখন ঐ দ্বিধাটুকু কেটে গেছে, তাই পরিষ্কার বলতে পারলেন —

আজকের মতো বলো সবাই মিলে
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে।
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে,
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

এটাই কিন্তু শেষ কথা নয় নাটকটির। 'রথের রশি' নাটকের নাম বদলে হল 'কালের যাত্রা' —মহাকালের ঘর্ঘর চক্র সব অচলতাকে টুকরো করে এগিয়ে নিয়ে গেল সমাজের রথ। মানুষের ভেদবুদ্ধিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

তবু লক্ষ্য করতে হবে যে এই ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আজকের মতো'। তাহলে চিরকালের মতো কোনটাকে বলা যাবে? সেকথাও ওই নাটকেই বললেন রবীন্দ্রনাথ —

— একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে —
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা,
হলধরের মাতলামিতে জগৎ উঠবে টলমলিয়ে।

আমরা এই 'মাতলামি' দেখেছি। বিদেশেও, এদেশেও। তাই শেষপর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশা

পূরণ হল না। চোখের সামনে অবাক হয়ে দেখতে হল যে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটবার সত্তর বছরের মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবির ভবিষ্যদ্বাণী কেমন সত্য হয়ে উঠল। একটার পর একটা দেশে বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত সরকার মুখ থুবড়ে পড়ল, সাধারণ মানুষ যেন মুক্তি পেল। আমরা আগেই বলেছি যে মহাযুদ্ধের গোড়ায় রাশিয়া কিভাবে পোল্যাণ্ডকে খানিকটা গ্রাস করে নিল — যুদ্ধের শেষদিকে দেখা গেছে যে স্টালিনের সঙ্গে চার্চিল, ট্রুম্যানের কেমন তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র এঁদের রাজনীতিগত ব্যবধানই বড়ো হয়েছে এমন নয়, পররাজ্যলোভও বোধহয় দায়ী। এসব বিবরণ চার্চিল তাঁর Second World War গ্রন্থরাজিতে দিয়েছেন। সেগুলো একপেশে কিনা সে তর্কে না গিয়েও তখনকার টানটান উত্তেজনা এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যায়।

এসব আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। কারণ এসব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। তবে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার যে এই যুদ্ধ শুরু হবার সময়টায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কিভাবে জার্মাণির সঙ্গে ইংরেজ আমেরিকা আপস করছে, কি মূল্য দিচ্ছে, এসব নিয়ে তাঁর ক্ষোভ তখনকার বহু চিঠিতে প্রকাশিত হয়ে আছে। যুদ্ধের সময়েও রাশিয়ার ক্ষমতার ওপরে ভরসা করতে চেয়েছেন।

কিন্তু যখন তিনি তাঁর সর্বশেষ দলিল পেশ করলেন তাঁর শেষ জন্মদিনে — সেই 'সভ্যতার সংকটে' দেখা গেল রাশিয়ার সপ্রশংস উল্লেখ থাকলেও তার ওপরে আর তিনি আশা করছেন না। বললেন, 'আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত - কুটিরের মধ্যে ... ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।... মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

'রাশিয়ার চিঠি'তে পরিত্রাণের রাস্তা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'কালের যাত্রা' নাটকে যখন পথের মধ্যে মাতলামি দেখেছেন, তখন তার পরিত্রাণ হিসেবে সুপারিশ করেছেন কবির ছন্দ —

— তখন যদি রথ আর একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে —
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা!
—ঠাট্টা নয়, রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বার বার
কাজের লোকের ভীড় ঠেলে সে পৌঁছতে পারেনি।
— তোমরা রথ চালাবে কিসের জোরে?
— গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে,
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা...
যার ভোজন কুৎসিত
যার ওজন অপরিমিত।

অর্থাৎ লোভ। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে দেখতেন মানুষ আরো কত বেশি লোভী হয়েছে। রাশিয়া যে লোভের বাধা দূর করবে বলে সরকার গড়েছিল, সে নিজেই লোভের তাড়ায় প্রতিবেশী রাজ্যে নিজস্ব পুতুল সরকার গড়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে নতুন বিশ্বযুদ্ধ এখনো লাগেনি, কিন্তু তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বারবার। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা সর্বত্র দারিদ্র্যের সঙ্গে লোভের লড়াই। ভয়াবহ মারণাস্ত্র, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা সব চলেছে একসঙ্গে।

সমাজবাদী দেশগুলো থেকেই কেন সর্বদা পলাতক মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী দেশে, তার ব্যাখ্যা এখন আমরা পেয়েছি। পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট দেশে বার বার রাশিয়াকে ফৌজ পাঠিয়ে স্তব্ধ করতে হয়েছে জনতার অসন্তোষ। বাধ্যতামূলক শ্রম, স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবনযাত্রা, রাষ্ট্রিক মন্ত্রের আবৃত্তি, এসব থেকেই মানুষ পরিত্রাণ চেয়েছে। 'কালের যাত্রা' নাটকের কবি এবং 'সভ্যতার সংকটে'র পরিত্রাণকর্তা একই জন কিনা তার প্রমাণ আজো মেলেনি। হয়তো কোনদিন মিলবেও না। 'ছন্দের জোর' প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানুষের যে সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটা প্রয়োজন, তা আদৌ সম্ভব হবে কি? সময় এখন শুধু ইতর নয়, ইতরতর হয়েছে। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর কোন বিবেক - কণ্ঠস্বর আর শোনা যায়না। রবীন্দ্রনাথ নেই, সার্ত্র নেই, রাসেল নেই, গান্ধী নেই, রঁলা নেই, আইনস্টাইন নেই, নেই লুথার কিংয়ের পুত্র দ্বিতীয় লুথার। সর্বত্র অপরিমিত দানবের কুৎসিত লোভ। সেই লোভ দরিদ্রের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। রাশিয়ার বিপ্লবের পরে ঐ সাংস্কৃতিক কাজ কতটা সম্ভব হয়েছিল? মায়াকভস্কিকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, পালাতে হয়েছে অনেককে — পাস্তেরনাককে নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ক্রুশ্চেভ স্বয়ং স্টালিনের অত্যাচারকে নিন্দা করে প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছিলেন। নিয়তির পরিহাসে তাঁকেও বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত ঐ প্রতিবাদই বড়ো হতে হতে চুরমার করে দিল এই শতকের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিপ্লবকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকের কবির ছন্দকে যে অধিকার দিতে চেয়েছেন, যে সাংস্কৃতিক উত্তরণকে আবাহন করে আনতে চেয়েছেন সুস্থ, সুন্দর, সার্থক জীবনযাপনের জন্য, তার প্রকৃত সম্ভাবনা কতটা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এমন কাজ শুরু করেছিলেন বিশ্বভারতীতে, বলেছিলেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য জীবনে আনন্দের প্রবাহকে আনয়ন করা। কিন্তু সে কাজ তাঁর জীবৎকালেই সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এমন অনুমান করা অসম্ভব নয়। তখনকার কোন কোন বিশিষ্টজন শান্তিনিকেতন থেকে চলে গিয়েছেন অথবা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন এমন উদাহরণ আছে। অবশ্য সেগুলি হয়তো যে কোন প্রণালীরই অঙ্গ।

তারপরে সময়ের গঙ্গা দিয়ে শুধু যে অনেক জল বয়ে গিয়েছে তাই নয়, সেই আদিগঙ্গা বদ্ধ নালাতে পরিণত হয়েছে — তাও আমাদের নজরে না পড়ে যায়নি। সমাজের সর্বস্তরে যে লোভ, ঈর্ষা এবং নীতিহীনতা মানুষকে পীড়িত করে চলেছে, তা থেকে সেই সব মানুষেরাও মুক্ত নন, যাঁরা সংস্কৃতিচর্চা করেন বলেই পরিচিত। রাজনীতিগত মতাদর্শ এখনো পর্যন্ত মানুষের জীবনকে মধুর করতে পারেনি — সেকথা আমরা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা থেকে বুঝতে শিখেছি। একথাও বুঝতে পেরেছি যে মানুষের প্রকৃত দুঃখের কারণ, নিহিত

আছে তার চরিত্রগত উপাদানের মধ্যেই। শুধু অর্থের লোভ নয়, ক্ষমতার লোভ, যশের লোভ মানুষের মনে ঈর্ষার জন্ম দেয় যা শেষপর্যন্ত প্রকৃত সুখ এবং প্রকৃত আনন্দের হন্তারক হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা এবং হীনতা থেকে সংস্কৃতিমান মানুষ আমাদের আদর্শ হবেন, এমন ধারণাই আপাতত আমাদের শেষ সম্বল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল — রবীন্দ্রনাথও বোধহয় সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

এমনটি সত্যিই কোনদিন ঘটবে বা ঘটতে পারে, এমন সম্ভাবনার কল্পনা করার পক্ষে দুটি বাধা আছে। একটি হল, সামগ্রিক ভাবে মনুষ্যজাতির সর্বসমাজে এবং সর্বস্তরে 'কবির ছন্দ', অর্থাৎ সুন্দরের আবাহন এসে পৌঁছনো আদৌ সম্ভব কিনা। যে মুহূর্তে লোভের প্রলোভন মানুষের সামনে এসে হাজির হবে সেই মুহূর্তে সে ফিরে যাবে তার আদিম বাসনার আদিতেই।

দ্বিতীয়ত, আমরা এখন যে সব তথাকথিত সংস্কৃতিমান মানুষদের চারপাশে দেখি, তাঁরা কেমন মানুষ? সমাজের নানাবিধ মঞ্চে যাঁদের নানা অভিনয় দর্শন করি আমরা, তাঁদের জীবনদর্শনটা কি এবং কেমন? এইসব উৎসবে আমাদের যতটা উৎসাহ, ততটা অনুরূপ অভিনিবেশ আমাদের জীবনযাত্রায় থাকে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। যিনি নাটকে আদর্শবাদীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, বিশেষ গান শুনে হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করেন, তাঁর হৃৎপিন্ড ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে স্পন্দিত হয়? যিনি নানা দার্শনিক সাংস্কৃতিক আলোচনায় যোগ দেন, কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেন, তিনি নিজে মানুষ হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে, পরিচালক হিসেবে কতটা মূল্যবান? কতটা স্বার্থহীন? তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে মহত্তর কোনো ছায়া পড়ে, কি পড়ে না? এঁরা কি রবীন্দ্রনাথের 'কবির ছন্দ' নিজেরা অনুভব করেন? সংস্কৃতি কি এঁদের জীবনের মানোন্নয়নে অভিজ্ঞ করে তোলে?

মানতেই হবে, এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এঁরাও আমাদের হতাশ করে থাকেন। যে কোনো তীব্র মুহূর্তে এঁরাও ততটাই তিক্ত, যতটা অন্য কেউ হতে পারেন।

সর্বোপরি, আমরা এও দেখছি বিশ্বে জাগতিক নিয়ম যতই নির্ভুল হোক না কেন, নৈতিক কোন নিয়ম নেই। অন্যায়, অসংযম, অপরাধ অনেকাংশেই শাস্তিহীন থাকে। বুদ্ধি, শিক্ষা, রুচি এই তিনটি বস্তু আমাদের কাছে কোন বিষয় নয়, যতটা আকর্ষণ ক্ষমতা ও বিলাসের। উত্তেজনা ছাড়া কোন দিন ঋতু ক্ষণ, অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ মানুষের নেই। অদ্ভুত আঁধার এসেছে আজ। যারা অন্ধ তারাই চক্ষুষ্মান বলে পরিচিত, তাই মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির ওপরে শেষ ভরসাও স্তিমিত হতে চলেছে। কারণ সংস্কৃতি এখন শুধুমাত্র বিনোদন কিংবা ' কেরিয়ার' মাত্র — কোনো জীবনদর্শন নয়। সংস্কৃতিচর্চার প্রবাহ বহতা নদীর মতো মানুষের মালিন্য দূর করতে পারত, কিন্তু করেনি। জীবনকে সুভদ্র ও সুরসিক করে তুলতে পারত, কিন্তু পারেনি। রবীন্দ্রনাথ জাপানি কবি নোগুচিকে একসময়ে ভর্ৎসনা করে Intellectual's betrayal এর কথা বলেছিলেন। আমরা একটু আগে নৈতিক অনিয়মের কথা বলেছি, বলেছি নীতিহীন দুরবস্থার কথা — রবীন্দ্রনাথও এই অবস্থা দেখেছেন। মানুষের যে সীমাহীন সম্ভাবনা ছিল, তার পরিচয় মানুষের হাতেই নষ্ট হচ্ছে, এমন কথাই বলেছেন তিনি — This history has come to a

stage when the moral man, the complete man is more and more giving way, almost without knowing it, to make room for the political and commercial man, the man of the limited purpose. প্রায় না জেনেই নৈতিক মানুষ হার মানছে সীমাবদ্ধ বাণিজ্যিক মানুষের কাছে। বড়ো-আমি হারছে ছোট-আমির কাছে। ডা: জেকিল পরাস্ত হচ্ছে মি: হাইডের হাতে। যে প্রযুক্তিগত আশ্চর্য উন্নতি মানুষ ঘটিয়েছে, প্রমিথিয়ুসের মত যে আগুন জ্বালিয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তার চিন্তার জগৎ দীনতর হয়েছে। এই দীনতা সর্বত্র।

আমার আপনার চারপাশেই এই হীনতার ছায়া। দেখতে পাচ্ছি সব প্রাণীরই নির্দিষ্ট স্বভাব আছে, কেবল মানুষেরই কোন স্থির স্বভাব নেই। যাকে চিরকাল প্রথা এবং রীতি মানতে দেখেছি, সে ক্ষণকালের মধ্যেই তার খোলস বদলে ফেলে দেয়, আমরা বলি এতে মনুষ্যত্বের অপমান হচ্ছে, ভুলে যাই 'এইটেই মনুষ্যত্ব'। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। সমাজে, রাষ্ট্রে, দেশে এমন ঘটনা দেখি, কিন্তু কিছু বলি না, চুপ করে থাকি। সব সুখ ঈর্ষায় পীড়িত, সব মুখই মুখোশ, সব হাসি-ই কৃত্রিম। Frautz Fannon-য়ের The Wretched of the earth গ্রন্থের ভূমিকায় Jean Paul Sartre যা বলেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশটি দেখা চলে এই সূত্রে — You doubted whether such things could be true; but now you know and still you hold your tongues... there is not a laugh that does not ring false, not a face that is not painted to hide fear or anger, not a single action that does not betray our disgust and our complicity.

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ওষধি - 'কবির ছন্দ' বা সংস্কৃতিগত উন্নয়ন, তার কথা সমাজবাদী নেতারাও ভেবেছিলেন। তাঁরাও নেমেছিলেন Cultural revolution বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। কিন্তু রাষ্ট্রিক বিপ্লবের মতো তাও বিফল হল, কারণ শিক্ষার নিয়ম মানা হয়নি। প্রকৃত শিক্ষা যে কি, তাই আমরা বুঝতে পারলাম না। চৈতন্যকে ঘা মেরে জাগায় শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ একথা বলে গেলেও সেই জাগ্রত চৈতন্যের উপাদান আজো অনাবিষ্কৃত।

আমরা জানি, এসব কথা পরাভবকে স্বীকার করে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এমন কথার চিন্তাও সম্ভবত চলে না। কারণ তিনি তো বলেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু তিনি নিজেও কি ঐ একই অবিশ্বাসে দীর্ণ হননি? বিশ্বভারতীতে যে আনন্দের স্রোত — streams of happiness তিনি বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার সমূহ বিনষ্টির সম্ভাবনায় তিনি কখনো ফিরতে চেয়েছেন সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠীর দিকে, কখনো বা মেয়েদের স্বাভাবিক মাধুর্যের দিকে। দুজায়গাতেই তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে। দেখেছেন তারাও তাঁর শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ করতে চায়নি। সাংস্কৃতিক উন্নতির যে আনন্দ, তার বদলে প্রতিযোগিতাই তাদের উন্মাদ করেছে। উদ্দীপনা নয়, উত্তেজনা; সার্থকতা নয়, সাফল্য — এই-ই মানুষের অবলম্বন। 'রাশিয়ার চিঠি'তেও কবি স্বদেশ সম্বন্ধে অনুরূপ হতাশার কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে চাইলেও 'কালান্তর' প্রবন্ধে তাঁকে বলতে হয়েছে — 'মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি তাহলে ভাঙতে হবে?'

যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ — সে মানুষ কে? তেমন মানুষ নিশ্চয় প্রতিযুগেই

দেখা দেন। আমাদের চারপাশেই হয়তো তেমন মানুষ কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো এই দীর্ণ জীবনকে বিদীর্ণ করে উঠে দাঁড়ান। তবু তাঁরা কতজন? তাঁরা যতটা আশা জাগান, ততটা শক্তি জোগাতে পারেন কি? আমাদের অবিশ্বাস দূর করার পক্ষে তা কি যথেষ্ট?

রবীন্দ্রনাথের তুলনা দিয়ে লাভ নেই। তাঁর মতো মানুষের শক্তি অসীম। সারাজীবন একলা চলার চর্চা করে তিনি যার অধিকারী হয়েছিলেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অর্জন করা কতটা সম্ভব? এমন কি, এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের শেষজীবন আমাদের আরো দুর্বল করে দেয়।

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব দেখার পরে অন্য কোন বিকল্প মানুষের সামনে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ ঐ বিপ্লবকে প্রশংসা করেও 'পূর্বদিগন্ত থেকে' যে নবজন্ম চেয়েছেন তা ব্যর্থ হয়েছে। যে 'পরিত্রাণকর্তার' আশ্বাস তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা কি তবে বিফল হবে? সেজন্য কি আমাদের আর একজন রবীন্দ্রনাথকেই প্রয়োজন? 'কালের যাত্রা' নাটকের কবি, তিনি কি আসবেন আমাদের জীবনে ছন্দ বিতরণ করতে? একঝোঁকা তাল কাটা বন্ধ করতে? নিজেদের শক্তিতে, বিচারে, বিশ্বাসে, বিবেচনায়, আনন্দে উৎফুল্ল হবার সাধ কি তাহলে অসম্ভব কল্পনা? যে বিপ্লব প্রথমে কবিকে আশান্বিত করেও পরে দ্বিধান্বিত করেছিল, শতাব্দীর শেষে তা বিশ্বাসহীনতায় ভঙ্গুর। অধিক কি, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের একবছর পরেই ১৯৩১ সালে 'প্রশ্ন' বলে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তার মধ্যে কি মানুষের অভিমান, অনুযোগ, অভিযোগ ভরে দিয়ে যাননি? একেবারে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ হয়েই কবিতাটি রচিত। পৃথিবীর বিশিষ্ট মানুষদের ওপরে সুভদ্র মানুষ আর যে ভরসা করতে পারছে না, এঁদের পরামর্শ শোনার মত আবহাওয়া যে আর বজায় থাকছে না, এই বেদনা থেকেই কবিতাটি লেখা। এটির প্রত্যক্ষ পটভূমি হল হিজলি জেলে নিরস্ত্র বন্দীদের ওপরে গুলিচালনা এবং হত্যা। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে কবিতাটির অনুভূতি, আবেগ এবং অবিশ্বাস। মানুষের নীচতা দেখে মানুষের ওপরে বা কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের পদ্ধতির ওপরে আশ্বাস রাখতে পারছেন না, শেষপর্যন্ত বিধাতাকেই আক্রমণ করতে হচ্ছে তাঁকে। 'প্রশ্ন' কবিতায় তাঁর সেই অসহায় জিজ্ঞাসাটি হল এইরকম — 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!' এই প্রশ্ন আজ আরো প্রাসঙ্গিক। বিংশ শতাব্দীর শেষে এই সত্যই প্রতিভাত হচ্ছে যে মানুষের চরমতম বিপদ শুধু পরিবেশদূষণই নয়, মানুষে মানুষে সম্পর্কদূষণও প্রবল বিপদজনক। যে মানুষ ভীরু, ভদ্র, ভাবুক - সে প্রজাতি হিসেবে বিলুপ্তির সম্মুখীন কিনা সেকথা এককথায় বলে দেওয়া যায়না।

'প্রশ্ন' কবিতার জবাব রবীন্দ্রনাথ পাননি। অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, 'শাস্তি তারি তরে, যে নপুংস কোনদিন অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়', আজ বেঁচে থাকলে তাঁকে মেহের আলি শিখিয়ে দিতো — 'সব ঝুট হ্যায়'।

অবশ্য, এই অনিবার্য দুর্দিনে কি করতে হবে, সেকথাও একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। আজ থেকে একশো বছর আগে লেখা বাংলা ১৩০৪ ইংরেজি ১৮৯৭ — ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই কবিতাই, বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব মানুষকে নিরাশ করার পরেও একবিংশ শতাব্দীর জন্য কর্তব্য নির্দেশ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই পুরো বিংশ শতাব্দীর

বছরগুলোতে আমরা মানসিক দিক দিয়ে এগোইনি। বুদ্ধিতে শান দিলেও বোধির মান বাড়াতে পারিনি। এই কবিতা লেখার পরে কবি অনেক দেখেছেন — একটি মহাযুদ্ধের শেষ, আরেকটির শুরু, মানুষের উন্মার্গযাত্রা — তথাপি নতুন কিছু তাঁকে বলতে হল না, বা নতুন কোন উপায় তিনি পেলেন না — পূর্বকালের এই কবিতাতেই যে অবিরাম আশাহীন কর্তব্যের কথা বলা হয়েছিল, তাকে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আজো মানুষের হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' কর্ণের মুখ দিয়ে 'আশাহীন কর্মের উদ্যমে'র কথা বলিয়েছেন, ১৮৯৭ সালের এই কবিতাতেও সেই 'উদ্যম'কেই মহিমান্বিত করে গেছেন।

কবিতাটির নাম 'দুঃসময়'। এতে কোন আশা দেননি তিনি, স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আশা শুধু মিছে ছলনা'। বলেছেন, যা রয়েছে তা হল 'মহা আশঙ্কা', 'অধীর মরণ'। আর আছে 'মহানভ অঙ্গন — নিবিড় তিমির আঁকা', যার অন্তরালে সূর্যের দেখা মিলবে না ('ঘুমায় অরুণ') —এখানে ক্রমাগত উড়ে চলাই হবে আমাদের কাজ। চলতেই হবে ('আছে শুধু পাখা'), থামলে চলবে না (বন্ধ কোরো না পাখা')। সূর্যের আশা তো নেই ('উষা দিশাহারা') — তবে একফালি চাঁদ আছে ('ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা')।

ঐটুকু আলো এবং আশার ছলনা নিয়েই চলতে হবে মানুষকে। এইটাই দুঃসময়। এইটাই নিয়ম, এইটাই নিয়তি। থামলেই যেখানে পতন, সেখানে 'গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি শততরঙ্গে তোমাপানে উঠে ধাইয়া।' তাই চলো শুধু চলো, দূরে কাদের 'করুণ মিনতি' ডেকে ফিরছে। সে মিনতি কি বিপন্ন মানুষের?

এইসঙ্গে যদি স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের সেই ছোট্ট ইংরেজি কবিতাটি, যেটি Straybirds-য়ে লিখেছিলেন — Every child brings this message that God is not discouraged of man — তবে আর একবার বোঝা যাবে যে স্বয়ং ঈশ্বরকেও মানুষ সম্বন্ধে হতাশই হতে হয়, শুধু প্রতিটি শিশু আর একবার আশা জাগিয়ে তোলে। সেই আশা কিসের? 'শেষকথা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেকথা বলেছেন, ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না, থাকবেন বহু যুগ পরে — যেখানে মানুষই ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হবে। অরবিন্দ যেমন বলেছিলেন যে বানর থেকে নর হওয়াটা যতটা আশ্চর্যের, তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য ঘটনা হবে মানুষের মানসিক উত্তরণ।

এসব কোনটাই ঘটেনি, অন্তত কোন লক্ষণও নেই। Straybirds-য়ের ঐ কবিতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই নিরাশার ইঙ্গিত। প্রতিটি শিশু আশা জাগালেও সে তো ক্রমশ শৈশব পার হয়ে মানুষ হয়ে ওঠে —Child হয়ে যায় Man — ঈশ্বরকে আরেকবার তাই Discouraged

ফকির

মূলগল্প : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালক : গৌতম ঘোষ

দৃশ্য-১

গ্রাম : ইচুর ঘর। ভোর

ঝিলের জলে ভোরের আকাশের প্রতিফলন। পদ্মপাতার উপর শিশিরবিন্দু। জলের তলায় একটা মাছ ঝাপটা দেয়।

পদ্মপাতা নড়ে ওঠে।

সাউন্ড ট্র্যাক "ললিতা গৌরী" রাগে আলাপ শুরু হয়।

ব্রিজের ওপর দিয়ে ভোরের ট্রেন চলে যাচ্ছে। সাউন্ড ট্র্যাকে শুধু আলাপ ভেসে আসছে। দূর ছবির মত একটা গ্রাম। উনুনের ধোঁয়া জমাট বেঁধে আছে।

ইচুর ঘরের ভেতরে ভোরের আলো এসে পড়েছে। ক্যামেরা দেয়াল ধরে ইচুর উপর আসে। ইচু মগ্ন হয়ে নামাজ পড়ছে। ফজরের নামাজ। ফ্রেমের এক কোন এখনও অন্ধকার। টাইটেল superimpose হয়।

ঘরের ওপর কোণে নিমি এখনও শুয়ে আছে। ক্যামেরা নিমির শরীরের উপর দিয়ে চলেতে থাকে। অপূর্ব এক ভঙ্গিতে নিমি ঘুমোচ্ছে।

ইচু নামাজ পড়ছে। রোদের আলো ইচুর দিকে যেন এগিয়ে আসছে। টাইটেল চলছে। সঙ্গে গান—

"তু হ্যায় নিরাঙ্কার"

নামাজ শেষ হয়ে গেলেও ইচু সূর্যের রশ্মির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ক্যামেরায় এসে পড়ে।

নিমি উনুনে আঁচ দিচ্ছে আর গজর গজর করছে।

নিমি : নামাজ তো শেষ হল.....এবার গতর নাড়িয়ে কাজে যাও দিকি।

নিমি কয়লা আনতে ওঠে। ইচু তখনও চুপচাপ বসে। ওর মুখে সূর্যের রশ্মি পড়েছে। একটু মৃদু হেসে বলে—

ইচু : আল্লার কি খেলা। রোজ আঁধার হয়। আবার প্রভাতী আলোয় সব ঝলমল করে ওঠে।..... একবার আলোর দিকে তাকিয়ে দেখ ....কত রঙ।

নিমি বাইরে থেকে কয়লা তুলে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলে—

নিমি : ঐ আছে তোমার কপালে...সংসার পাট তুলে শেরপুরের দরগায় গিয়ে আল্লা আল্লা কর। ফকিরিতে পেট ভরবে?.....

উনুনে কয়লা দেয়।

ইচু মৃদু মৃদু হাসে। (centre focus filter)

নিমি : (ov) হাঁড়িটা তুলে একবার দেখো....বড় জোর আর একবেলা চলবে।

ট্রেনের আওয়াজ ভেসে আসে ইচুর মুখের ওপর।

দৃশ্য-২

আমিনুদ্দির বাড়ি।। ভাঙা চালকুমড়ো মাচা।। সকাল

ভাঙা চালকুমড়োর মাচার মধ্যে বৃদ্ধ আমিনুদ্দি বেজার মুখে ঘোরাঘুরি করছে। মুখটা ফ্রেম থেকে সরে গেলে পাশের রাস্তায় ইচুকে দেখা যায়। আবার আমিনুদ্দির মুখ ফ্রেমে ঢোকে। মুখ সরে গেলে দেখা যায় ইচু কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ইচু : ও আমিনুদ্দি চাচা... সকাল সকাল বেজার মুখ করে ঘোরাফেরা করছ ক্যানে?

আমিনুদ্দি : দেখ বাবা ইচু, চালকুমড়ার মাচাটার কি হাল হয়েছে। কেমনে মেরামতি করব তার কোনো দিশা পাচ্ছি না।

ইচু : খুঁটিগুলো সব পচে গেছে। তুমি বুড়োমানুষ অত খাটনি পোষাবে না। আমি কাল এসে করে দেবো'খন।

আমিনুদ্দি : কাল কাল করেই তো এমন হাল হয়েছে। এ আর একদিনও টিঁকবে নারে...

ইচু সাতপাঁচ না ভেবেই বলে ফেলে।

ইচু : তা'লে তুমি সর আমি হাত লাগাই।

আমিনুদ্দি : তুই! জনে যাবি নে।

ইচু : সে নয় কালই যাব। আজ তোমার কাজ করি।

ইচু নিজের পুঁটলিটা দাওয়ার কোণে রেখে জামা খুলে ফেলে।

আমিনুদ্দি : আল্লা তোর মঙ্গল করুক।

নুইয়ে পড়া চালকুমড়ো লতা। একটা বাঁশের চাপে আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠে।

ইচুর মুষ্টিবদ্ধ হাত। হাতে উল্কি। 'আলিফ' চিহ্ন।

দৃশ্য-৩

ইচুর বাড়ি।। দুপুর

বন্ধ দরজা। ছোট একটা তালা ঝুলছে। ইচুর গলা শোনা যায় — "ও নিমি, গেলি কোন চুলো। তেষ্টায় যে ছাতি ফাটে"।

ইচু ধপ করে দাওয়ায় বসে।

দৃশ্য-৪

টিনের চালওয়ালা ভিডিও হল।

নিমি ওপাড়ার ছেলে গোপালের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখছে। হিন্দি ছবির জমাট নাচের দৃশ্য। ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যাবে যে গোপাল নিমির বুকে হাত বোলাচ্ছিল। নিমি ঝট্‌কা দিয়ে হাত সরিয়ে বলে—

নিমি : (ফিসফিসিয়ে) হচ্ছেটা কি? ওদিকে দেখো।

নাচ চলছে।

দৃশ্য-৫

ইচুর বাড়ি ।। বিকেল

বন্ধ দরজা। তালা ঝুলছে। সাউন্ডট্র্যাকে হিন্দি সিনেমার গান চলছে।

ইচু ডাব গাছে উঠছে।

ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। ট্রেনের আওয়াজে সিনেমার গান মিলিয়ে যায়।

ইচু দাওয়ায় বসে ডাবের শাঁস খাচ্ছে।

নিমি ফিরে এসে ইচুকে দেখে অবাক হয়ে পড়ে।

নিমি : কি গো আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলে।

ইচু খেতে মগ্ন। উত্তর দেয় না।

নিমি তালা খোলে।

নিমি : রাগ হলো বুঝি।

ইচু : কই না তো। (তারপর একগাল হেসে বলে) আজ আর জনে যাওয়া হল না। একটু খাবি। খুব মিঠা।

ইচু বউকে দিতে যায়।

নিমি : যা মরণ।

ইচু : কি করি বল। মাঠেই যেতে ছিলাম। দেখি আমিনুদ্দি চাচা চালকুমড়ার খুঁটি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

নিমি : ভাল বেগার দেবার লোক পেয়েছে। . . বললাম না ঘরে চাল বাড়ন্ত।

ইচু : চাচা একা মানুষ। দেখে মায়া হল।

নিমি ঠোঁট বেঁকিয়ে গুনগুন করে গান করতে থাকে। তারপর নিজের সাজের বাক্সটা খুলে কাচের চুড়িগুলো খুলে রাখে আর গান করে ''পরদেশি, পরদেশি''।

ইচু : সিনেমা দেখে এলি, না?

নিমি একবার ঘুরে তাকায়। তারপর হেসে বলে—

নিমি : রাজা হিন্দুস্থানি।

ইচু বউয়ের পাশে গিয়ে বসে।

ইচু : কি গল্প রে।

নিমি : সে কি এক কথায় বলা যায়। কত কি। . . প্রথমে খুব মজা . . . তারপর দুঃখ, মারপিট . . : তারপর আবার মজা।

নিমি উঠে পড়ে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে গাইতে থাকে '' পরদেশি পরদেশি''। সঙ্গে কোমরও দোলায়। ইচু তাকিয়ে থাকে। তারপর সাজের বাক্স থেকে নিমির চুড়িগুলো বের করে।

নিমি : ও হো. . . দেশলাইটা গেলো কোথা।

নিমি ইচুর কাছে এলে ওকে থামিয়ে ইচু বলে —

ইচু : এ গুলো খুললি কেন? কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল।

নিমি : দুর'হ মরণ।

ইচু বউকে শক্ত করে ধরে।

ইচু : আমি পরিয়ে দি। তোকে বড় সুন্দর লাগে। আর এই হাতদুটো নড়লে চড়লে কেমন টুংটাং আওয়াজ হয়।

নিমির পুরো ব্যাপারটা কেমন সিনেমা সিনেমা লাগে। সে নায়িকাদের মত মুখ নিচু করে হাত বাড়িয়ে দেয়। ইচু চুড়ি প রায়। তারপর বউয়ের চোখে, ভূরুতে, ঠোঁটে, হাতে আঙুল বোলায়।

ইচু : আল্লার কি সৃষ্টি। পরীদের রানী. . . তুই এত সুন্দর কেন রে বউ?

ইচু নিমিকে আদর করতে যায়। নিমি মুখ সরিয়ে নেয়। ওর চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসে। নিমি আঁচল দিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করে।

ইচু : কি হল?

দৃশ্য-৬

ধানক্ষেত।। দুপুর

পাকা ধানের গোড়ায় কাস্তের কোপ পড়ছে। ক্যামেরা চলতে চলতে ইচুকে ধরে। ইচু ধান কাটতে কাটতে বসে পড়ে। অবাক হয়ে পাকা ধান দেখে। হাত দিয়ে স্পর্শ করে। পাশের জনমজুর লোকটি বলে ওঠে।

জনমজুর : কি রে থামলি যে।

ইচু : এগুলো কি বলদিকিনি।

জনমজুর : ধান।

ইচু : ধান গাছের পাকা ফল। . . . এই সেদিন বীজ পোত্‌লাম। কেমন তর তর করে গাছগুলো বাড়ল। ফল ধরল, পাকল—আমরা ঘ্যাচ করে কেটে নিলাম। . . . এবার এগুলো মানুষের পেটে যাবে - - কি কাণ্ড বল্ দিকি।

জনমজুর : বাজে বকা থামিয়ে নড়্ ওধারে।

ইচু : ভাব একবার আল্লা মানুষের কি বুদ্ধিই না দিয়েছে। এই ফলগুলো খাবে, আবার গাছ লাগিয়ে পাকাবে — আবার খাবে . . . গরু ছাগলের এই মগজ নাই।

ইচু কাজে মন দেয়। ধানক্ষেতের খানিকটা দূর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে।

দৃশ্য-৭

স্টেশনের পথ ।। বিকেল

একটা লুঙ্গি পরা লোকের পায়ের অংশ সাইকেল চালাচ্ছে।

একটি মেয়ের কোমরের অংশ সাইকেলের সামনের দিকে রডে বসা। Camera follow করে।

নিমির কোমরে ছেলেটির পায়ের ঘষা লাগছে। একটু উঁচু থেকে দেখা যায় শামসের আর নিমি সাইকেল চড়ে লালমাটির পথ দিয়ে আসছে।

রেললাইনের বাঁধ। গাড়ি আসার ডাউন সিগন্যাল।

ক্যামেরা নিমি ও শামসেরের সঙ্গে pan করে। Frame এ সিগন্যাল দেখা যায়।

নিমি : উঃ। কি হচ্ছে পথের মাঝে।

শামসের সাইকেল থামায়। শামসের হেসে বলে—

শামসের : আদর করতে মন চায়।

বলেই সাইকেল থেকে নামে। নিমি বসেই থাকে।

শামসের : ঐ দিকটায় চল। এ পথে এখন কাকপক্ষী নেই।

নিমি : উঁহু . . . অত সহজ। আগে স্টিশনে চল . . . বললে যে পেট ভরে খাওয়াবে। আজ অনেক কিছু খাব। ডিমের চপ, ব্রেস কাটলিস্, চাওমিন . . . ঠিক আছে। . . . আর আমার ফকির স্বামীর জন্যও দুটো নিয়ে যাবো। রাজি তো?

শামসের : বারে মেয়েছেলের আবদার। পেট ভরে খাওয়াবো আবার সোয়ামির জন্য ছাঁদাও বেঁধে দেবো।

নিমি হাসে।

শামসের : এরপর বলবি . . . এক প্যাকেট গোপালের জন্যও দাও না গো।

নিমি সাইকেল থেকে নামে। একটু বিরক্ত হয়েই বলে—

নিমি : কি বলতে চাও খুলে বল। হেঁয়ালি ভাল লাগে না।

শামসের : আসমান থেকে পড়লি যে। . . . ঐ হিন্দু ছোকরাটার সঙ্গে বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি? লোকে তো আর চোখে কুলুপ এঁটে নেই।

নিমি : দেখো শামসের . . . তোমায় আমি ভালবাসি, বিশ্বাস করি। তুমি কেনো আমারে করবে না। কেউ যদি সখ করে এক দুদিন সিনেমায় যায় তাহলে কি ধর্ম খোয়া যাবে?

শামসের : তুই মুসলমানের বউ।

নিমি : হ্যাঁ পরের ঘরের বিবি। তারে নিয়ে তুমি যখন ঘুরে বেড়াও তখন বুঝি সকলে কুলুপ এঁটে থাকে।

শামসের : তুই থামবি নিমি।

নিমি : কেন থামবো। কথাটা তো তুমিই পাড়লে।

নিমি হাঁটা দেয়। শামসের সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে ওর পেছন পেছন আসে। নিমির হাত চেপে ধরে বলে—

শামসের : রাগ করিস না। . . . লোকে দশ কথা বলে, তাই বলছিলাম।

নিমি : লোকে কি বলে তাতে আমার বয়েই গেল। তোমার তো হিম্মৎ নেই। অতই যদি ভালবাসা তো বউটারে তালাক দিয়ে, আমারে নিয়ে ঘর বাঁধো। . . . খুব সেয়ানা। মরদ জাতটাই এমন।

শামসের সোহাগ করে নিমিকে কাছে টেনে নেয়।

শামসের : একটু সবুর কর্। কারবারটা জমে গেলে সব হবে।

নিমির গালে গাল ঘষে।

নিমি : আগে স্টিশন চল, খিদে লেগেছে।

কালভার্টের উপর দিয়ে ট্রেন চলে যায়।

দৃশ্য-৮

মহাজনের বাড়ি ।। শেষ বিকেল

একটা বস্তায় ধান বাঁধা আছে। শেষ বিকেলের আলোয় ধানের শীষ দেখা যায়। camera pan করে ইচুকে ধরে। ইচু ধান নিয়ে মহাজনের উঠোনে বসে আছে। মহাজনের গলা পেয়ে ইচু হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

মহাজন : (OV) কিরে ইচু, কি মনে করে?

ইচু : সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলেছি।

মহাজন এসে একটা মোড়ায় বসে।

মহাজন : কি হল আবার!

ইচু : ওদিন ভুল করে আপনার জমির ধান খানিকটা কেটে ফেলেছি। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরৎ দিতে চাই।

মহাজন : ও তোর কাজ ইচু। আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

ইচু : আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, অত ধানের মধ্যি সেদিন জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। . . . আজ মাঠে গেয়ে শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। . . তখন খেয়াল হল। লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া সুদ দেবো আপনারে।

মহাজন : এ কলি যুগে তোর মত লোক আছে দেখলেও ভরসা হয়। ও ধান তোকে ফেরৎ দিতে হবে নি। ঘরে নে যা।

ইচু হাতজোড় করে মহাজনকে বলে—

ইচু : তা হবে না বাবু। ও ধান নিতি পারব না মাপ করবেন। ও আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমার হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরাণ বাঁচাবো — যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মহাজন অবাক হয়ে ইচুর দিকে তাকায়। ইচু মাথা নামিয়ে নেয়।

Camera ধানের শীষের উপর চলে আসে।

"তু হ্যায় নিরাঙ্কার" গান ভেসে আসে।

দৃশ্য-৯

রেললাইনের বাঁধ ।। গোধূলি

একটু Slow motion এ ইচুর গামছা Frame-এ ঢোকে। ইচু নামাজ পড়তে বসে যায়। পাশে ধানের বস্তা। Silhoutte .

Soundtrack -এ গান চলছে।

সন্ধ্যা লগ্নে একটা প্রকান্ড বটগাছ ধরে Camera উঠছে।

ট্রেন চলে যাওয়ায় শব্দ।

দৃশ্য-১০

ইচুর বাড়ি ।। রাত

ট্রেন যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভাত ফুটছে।

নিমি বসে আছে। খালি গায়ে শাড়ি জড়ানো।

বাইরে দরজা খোলার শব্দ।

ইচু ঢোকে। ধানের বস্তা এক কোণে নামিয়ে রাখে। (সামান্য পড়ে আছে)

নিমি : এত দেরি করলে?

ইচু : সেদিন ভুল করে মুখুজ্যেবাবুর ধান কেটে নিয়েছিলাম। ফেরত দেয়ে এলাম। বাবু বড় ভাল — সুদ নেল না। . . . তারপর বাজারে গেলাম। দ্যাখ কি এনেছি।

পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে খোলে। হলুদ আর লাল রঙের কাঁচের চুড়ি। ইচু নিমির কাছে গিয়ে বসে। নিমি একবার তাকিয়ে ফুটন্ত ভাতের দিকে মনোনিবেশ করে।

ইচু : পছন্দ হল না বুঝি।

নিমি : তুমি সিধা হবার লোক নও। অর্ধেক ধান দে এলে। . . . পয়সাগুলো অযথা খরচা করলে। কি করে দিনগুলো চলবে তার হুঁস আছে।

ইচু : খোদাতাল্লা আছেন না। . . . হাতদুটো দেখি।

নিমি হাত বাড়ায় না। ভাত নামাতে নামাতে অভিমান প্রকাশ পায়। ভাতের ভাপ ফ্রেমকে অস্পষ্ট করে —

নিমি : তুমি আর তোমার খোদা। নিজের তালে আছ। . . . আমার কথা একবারও ভাবো! . . .

কাচের চুড়িগুলো হাতে নিয়ে ইচু স্থির।

নিমি ফ্যান গালতে গালতে বলতে থাকে।

নিমি : আমার কোনো শখ আহ্লাদ নেই বুঝি। সারাদিন ঘানি টানা। কি আছে এই সংসারে। . . . একটা ছেলেপুলে থাকলেও ভরসা পেতাম।

ইচু : তেনার মর্জি হলে সব হবে রে নিমি। মন দিয়ে ডাক।

নিমি : তুমি একটা গরু। . . . আজকের দুনিয়ায় তুমি অচল। আমারে তালাক দিয়ে ফকিরি করগে যাও।

ইচু নিমির কাছে এই ব্যবহার আশা করেনি। সে প্রতিবাদ করতে জানে না। চোখ ফেটে জল নেমে আসে। নিমি বুঝতে পারে যে একটু বেশি বলে ফেলেছে। আঁচল দিয়ে ইচুর চোখ মুছিয়ে দেয়। Music

ইচুর হাত থেকে চুড়িগুলো নিয়ে দু হাতে পরে।

dissolve

ইচু ভাত খাচ্ছে। নিমি দুটো বড় বড় চপ ইচুর পাতে দেয়। চপ দেখে ইচুর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। এক কামড় নিয়ে বলে —

ইচু : কই পেলি।

নিমি : আল্লায় পাঠিয়ে দেল।

দুজনেই হাসে।

dissolve

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ইচু আর নিমি বিছানায় আলিঙ্গনবদ্ধ। কাঁচের চুড়ির শব্দ। সিনেমার Music

দৃশ্য - ১১

ভিডিও সিনেমার হল ।। বিকেল

সিনেমা শেষ হওয়ার অংশ।

হলের বাইরে। লোকজন বেড়িয়ে আসছে। নিমি ও গোপালকে দেখা যায় ভিড়ের মধ্যে।

লাইনের ধার দিয়ে নিমি আর গোপাল হাঁটছে। বরফের আইসক্রিম হাতে। সিনেমা নিয়ে হাসি তামাসা করছে।

হাঁটতে হাঁটতে নিমি কি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। গোপালও দাঁড়ায়।

গোপাল : আমি যাই। (চোখেমুখে অস্বস্তি)

নিমি : না —

শামসের সাইকেল থেকে নামে। ওর চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

নিমি : (একটু হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বলে) (ছবির নাম) দেখেছো? হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

শামসের : এই কাফেরের বাচ্ছার সঙ্গে লদগালদগি হচ্ছে?

গোপাল : মুখ সামলে কথা বলবে শমসের।
শামসের : চোপ,... মুসলমান বাড়ির বউ নিয়ে ফূর্তি মারাচ্ছো!
গোপাল শামসেরের জামা চেপে ধরে। ধাক্কাধাক্কিতে সাইকেলটা উল্টে যায়। শামসের গোপলকে খানিকটা কাবু করে দেয়।
গোপাল ছুটে গিয়ে রেললাইনে ওঠে। শামসের তেড়ে যায়।
রেললাইনের উপর দুই পুরুষের জান্তব লড়াই silhoutte -এ দেখা যায়।
নিমি তাকিয়ে দেখছে। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। বুঝতে পারে না কি করবে। মিউজিক

দৃশ্য — ১২

ইচুর বাড়ি ।। রাত্রি

দরজায় তালা ঝুলছে। Camera পিছিয়ে এলে দেখা যায় ইচু বসে। রাতের ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। ইচু উঠে দাঁড়ায়। একটু এগিয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়।
দূরে পাথর ভাঙার কলে এখনো কাজ চলছে।
হাতে টর্চের আলো পড়ে।

ওসমান : কি ইচু মিঞা, পথের ধারে। একা কি কর?
ইচুর চোখেমুখে শঙ্কার আভাস।
ইচু : বউটা এখনো ফিরল না। বড় চিন্তায় পড়লাম ওসমান ভাই।
ওসমানের নেশা হয়েছে। ইচুকে ভাল করে দেখে—
এত রাত তো হয় না।
ওসমান হাসে। পিছনে পাথর ভাঙার কল। ওটাই source light।
ইচু : একি হাসির কথা হল।
ওসমান : ঘরের বিবিরে পর্দার আড়ালে রাখতে হয়। নয়তো মেয়েছেলের পাখা গজায়।
ইচু চুপ করে থাকে।
ওসমান : আমারে দেখে শেখো। দু'দুটো বিবিরে কেমনে রাখতে হয়। কোনোদিন মুখ দেখেছো তাদের?... বোরখা ছাড়া বেরুনো বারণ।
(একটু হেসে বলে)
এখন মিঞার পথ চেয়ে বসে আছ, তারচে —
তারপর যেতে যেতে বলে —
যাও ঘরে যাও।... যাবে কোথা... তবে এখন থেকে একটু কড়া হতে শেখো... মেয়েছেলের এত বাড় ঠিক নয়।
ইচু নিরুত্তর। ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে।
একটা পাথর দিয়ে ইচু ঘরের তালা ভাঙে। আলো জ্বালায়। ঢক্‌ঢক্‌ করে জল খায়।

দৃশ্য — ১৩

ইচুর বাড়ী ।। সকাল

পুকুরে সকালের আকাশের প্রতিফলন। Camera pan করে পদ্মপাতার উপর

আসে।
ইচুর ঘরে সকালের আলো পড়েছে। ইচু তখনও ঘুমোচ্ছে। দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ।
ইচুর ঘুম ভাঙে।
জড়ানো গলায় বলে —

ইচু : রাত কাবার করে ফিরলি।... চিন্তা হয় না বুঝি।
ইচু উঠে গিয়ে দরজা খোলে। গাঁয়ের প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে। ইচুর গলা শুকিয়ে যায়। সে ধীর পায়ে উঠোনে নামে। দলটার সামনের দিকে বুড়ো হাফেজ, বছিরদ্দি শেখ। আর পেছনের দিকে কয়েকজন যুবক।
ইচু : কি হয়েছে গা?
হাফেজ : তোমাকে একবার যেতে হবে মোদের সঙ্গে।
ইচু : কখন?
হাফেজ : এখুনি।
ইচু : বেলা হয়ে গেল, নামাজটা সেরেনি।
হাফেজ : সে সময় নেই।
ইচু : কোনো বিপদ আপদ নয় তো...
বছিরদ্দি : ঘরে পয়সাকড়ি কিছু আছে?
ইচু : আজ্ঞে সামান্য কিছু আছে বউ এর কাছে। সে তো একটু বেরিয়েছে।
একজন যুবক কি একটা বলতে যাচ্ছিল। বছিরদ্দি তাকে থামিয়ে দেয়।
ইচু : কি হল চাচা?
ইচুর চোখেমুখে শঙ্কা।

দৃশ্য — ১৪

রেললাইনের ধারে ।। সকাল

রেললাইনের ধারে একটা ভিড় জমে আছে। ইচু কলের পুতুলের মত দলটার সঙ্গে ভিড়ের দিকে এগোয়।
Frame এ ভিড়ে এক অংশ Low angle shot। হাফেজ -এর মুখ ভিড় সরিয়ে ঢোকে।
তারপর আস্তে আস্তে ইচুর মুখ। ইচুর মাথা ঘুরে যায়। ইচু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।
পাশের লোকেরা ওকে ধরে নেয়।
রেললাইনের ধারে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। গলার সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মৃতদেহ নিমির।
ইচু অস্ফুট আওয়াজ করে 'আল্লা' বলে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ভিড়ের বাইরে গিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকে।
ইচু : কি করলি... রেলে গলা দিলি।
হাফেজ : নারে ইচু... এ খুনের মামলা।... কারা ওরে মেরে এখানে ফেলে গেছে।

ইচু : মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা . . . আল্লাই জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

হাফেজ : ঝগড়া হয়েছিল ?

ইচু মাথা নেড়ে না জানায়।

হাফেজ : রাতে বউ ঘরে ছিল?

আবার ইচু মাথা নাড়ে। মাথা নাড়তে নাড়তে কেঁদে ফেলে।

ভিড়ের মধ্যে বছিরদ্দি সকলের উদ্দেশ্যে বলে—

বছিরদ্দি : মোর কথা সবাই শোন। ইচু ভাল মানুষ। ওকে বাঁচানো দরকার। পুলিশ আসার আগেই ওরে নিয়ে যেতে হবে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তারা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। চল মোরা কয়েকজন ওকে নিয়ে লাভপুর যাই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়। Camera ইচুর উপর চলে আসে।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে —

ইচু : আমি যাব না।

হাফেজ : যে গেছে তারে তো আর ফিরি পাবি না। তোমারে বাঁচতে হবে। তুমি চল দিনি।

দৃশ্য — ১৫

রেললাইনের বাঁধ ।। সকাল

রেললাইনের বাঁধ ধরে একটা দলকে হন্তদন্ত হয়ে চলতে দেখা যায়।

হাফেজ, বছিরদ্দি, ইচু ও আরো কয়েকজন।

দৃশ্য—১৬

রামলালবাবুর সেরেস্তা ।। সকাল

Frame -এ রামলালবাবু profile in করে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে রামলালবাবু বলেন —

রামলাল মোক্তার : খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে —

হাফেজ : এই লোকের বউ বাবু . . . সকালে রেললাইনের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। রেলে গলা দেয় নি। কেউ মেরে ফেলে দে গেছে। . . .

রামলাল : ওর নাম কি?

Camera ইচুকে close করে।

হাফেজ : ইচু —

রামলাল : ও রাত্রে কোথায় ছিল ?

হাফেজ : বাড়িতেই শুয়ে ছিল বাবু —

রামলাল খানিকক্ষণ চুপ থাকে। সিগারেটে টান মারে।

রামলাল : বৌ-এর স্বভাব চরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। বছিরদ্দি পাশ থেকে বলে উঠল।

বছিরদ্দি : ভাল না বাবু।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বছিরদ্দি : বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ — নিরীহ ভালমানুষ খুন ও করেনি।

রামলাল ধমকের সুরে বলে —

রামলাল : তুমি কি করে জানলে? তোমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল। যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না।

তারপর হাফেজকে বলে —

রামলাল : তুমি কি জান বল মোড়ল . . .

হাফেজ সংযত হয়ে বলে —

হাফেজ : আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের ভাল লোক . . .

রামলাল : ঘটনা বল . . .

হাফেজ : জন্ খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বললে, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না।

ইচুর মুখ। out of focus পেছনে এ মোক্তার ও হাফেজ, বছিরদ্দি। Music। মোক্তার ও হাফেজকে কথা বলতে দেখা যায় কিন্তু ওদের কথা শোনা যায় না। ইচুর বিভ্রান্ত মুখমন্ডল। Camera এগিয়ে গেলে মোক্তারের গলা ভেসে আসে —

রামলাল : (O.V) একটা কথা শিখিয়ে দিই তোমায়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশ তা শুনবে না। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক . . .

রামলাল বাবুকে profile এ দেখা যায়। একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন —

রামলাল : বুঝলে? যাও, সাবধানে গাঁয়ে ফিরে যাও।

হাফেজ : বাবু পুলিশ ধরলি কি হবে?

রামলাল : হাজতে থাকতে হবে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। . . . বাড়ি গিয়ে পয়সাকড়ি যোগাড় কর সব — বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ — অনেক টাকার খেলা। আমি অবশ্য তোমাকে বাঁচানোরই চেষ্টা করব।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। এতক্ষণে ইচু কথা বললে। হাত জোড় করে বলে —

ইচু : বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

রামলাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইচু রামলালের পা-দুটো জড়িয়ে বললে —

ইচু : মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না। . . . দয়া করে একটা আবদার রাখবেন মোর . . . আল্লা, দিনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

রামলাল : আহ্ পা ছুঁতে হবে। কি বল —

ইচু : যেখানে মোরে রাখুক, যা করে করুক। কিন্তু বাবু আপনি ওদের এইটুকু বলে দিবেন . . . ওখানে আমি যেন পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে পারি।

রামলালবাবু এই আবদার আশা করেননি। বছিরদ্দির দিকে চেয়ে বলে —

রামলাল : খুব ধার্মিক মুসলমান দেখছি।

বছিরদ্দি : না বাবু, কস্মিনকালেও কেউ ওরে মস্‌জিদে যেতে দেখেনি। . . . পাগল —

দৃশ্য — ১৭

পথের ধারের হোটেল ।। দুপুর

একটা লরি ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গেলে দেখা যায় — পথের ধারে একটা হোটেলের বেঞ্চে বসে ইচু, হাফেজ, বছিরদ্দি ও অন্যান্যরা তেলে ভাজা মুড়ি মেখে খাচ্ছে।

খেতে খেতে ইচু কেঁদে ফেলে।

আর একটা গাড়ি সরে যায়।

হাফেজ বা বছিরদ্দি কিছু বলে না।

ইচু : নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছেল না . . . কেন এক কথা বললে তোমরা?

হাফেজ : কাঁদিস না, পেট ভরে খেয়ে নে ইচু . . . কপালে কি আছে আল্লাই জানে. . .

মাথা মুড়ির গ্রাস মুখে ওঠে না ইচুর।

আবার একটা গাড়ি চলে যায়।

(Match cut করে ইচুর close up।)

ইচু : চরিত্র জিনিষটা কি বলতে পার বাবা? . . . ওদিন ওসমান বলল ঘরের বিবিরে পর্দার আড়ালে রাখতে হয়। অমন সুন্দর বিবি মোর . . . কেন রাখব পর্দার আড়ালে।

হাফেজ আর বছিরদ্দি কিছু না বলে খেতে থাকে। ইচু হঠাৎ উঠে পড়ে। Slow motion-এ মুড়িগুলো ছড়িয়ে যায়।

ক্যামেরার সামনে দিয়ে একটা গাড়ি সরে গেলে দেখা যায় ইচু দৌড়চ্ছে।

ফাঁকা Frame-এ হাফেজ ও বছিরদ্দি উঠে দাঁড়ায়। ওরা এগোতে শুরু করে।

দৃশ্য—১৭এ

উকিলের বাড়ি ।। বাহির ও ভিতর

ক্যামেরা ইচুর pan থেকে উকিলের বাড়ি জানালায় উঁকি মারে। অসহায় বাপ মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

বাপ : পুলিস কিছুই করবে না মোক্তারবাবু। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। আমার জামাইটি হচ্ছে দারোগার এক পেয়ালার বন্ধু।

ইচুর মুখ দেখা যায় জানালার পেছনে।

বাপ : আমার সর্বস্ব গেলেও এই অত্যাচারের বিহিত করবো। আপনি কেস্ করুন — criminal case. . . যা হবার হবে।

রামলাল : সবই তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়ে কি চায়। ওর ভবিষ্যতও তো ভাবতে হবে।

বাপ : আপনি দেখতে চান। অত্যাচারের নমুনা। দেখাও তো মা।

মেয়েটি অস্বস্তিতে মাথা নিচু করে থাকে।

বাপ : কোনো লজ্জা নেই . . . উকিলবাবু তোমার...।

বাপ মেয়ের শাড়ি সরিয়ে পিঠ দেখায়।

বাপ : দেখুন বুকে পিঠে কি ভাবে ছেঁকা দিয়েছে।

মেয়েটি কেঁদে ফেলে। ইচু ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে।

বাপ : বলুন। আপনার নিজের মেয়ের ওপর এস অত্যাচার হলে সহ্য করতেন?

ইচুর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে আসে ।

ইচু : হায় আল্লা।

রামলাল মোক্তারের চোখ পড়ে জানালার দিকে।

রামলাল : কি হল? ফিলে এলি যে —

ইচু : সত্যি কথাটা বলা হয়নি বাবু। খুনটা মুই করেছি।

মেয়েটি তাকিয়ে ইচুকে দেখে। পিঠের কাপড় ঢেকে নেয়। অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

রামলাল : কি বাজে বকছো। ও কথা উচ্চারণ করলে ফাঁসিকাঠে লটকাতে হবে।

ইচু : তেনার যা মর্জি — তাই হবে বাবু।

হাফেজ ও বছিরদ্দি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়ে।

হাফেজ : কি হল রে তোর?

ইচু নিজের মনেই বলে যায়।

ইচু : দড়িতে আমার লাস্‌টা ঝুলবে। বড় ভালো দেখাবে।

বছিরদ্দি : ওর মাথার ঠিক নেই মোক্তারবাবু। কিছু মনে করবেন না।

ওরা প্রায় ইচুকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। ইচু হঠাৎ থেমে বলে —

ইচু : দেখবে তোমরা? চল মোর সাথে।

১৭বি

জঙ্গল পথ ও বটগাছ।

জঙ্গলের পাতার ফাঁক দিয়ে ইচু, হাফেজ ও বছিরদ্দির মুখ সরে যাচ্ছে।

ইচু এক জায়গায় এসে ওদের থামায়।

ইচু : ঐ দেখো . . .

ক্যামেরা ইচুকে close করে। soundtrack এ গানের তান ভেসে আসে। দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যায় বটগাছের ডালে শাড়ি দিয়ে ফাঁস বাঁধা এক রমণীর লাস ঝুলছে। তার ঠিক নিচে একজন বসে তান্ করছে।

ইচু : দেখছো কেমন নিশ্চিন্তে ঝুলছে।

হাফেজ ও বছিরদ্দি কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারে না। ইচুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে।

হাফেজ : তুই থামবি।

ইচু তাকিয়ে থাকে।

Centre focus filter এর মাধ্যমে দেখা যায় নিমির মুখ। Camera নেমে আসে। ঝুলন্ত দুটো পা। Camera আরও নেমে-আসে। লাসের তলায় বসে ইচু গান গাইছে। Camera এবার

track করে। বটগাছের একটা মোটা গুঁড়ির সামনে দিয়ে সরে যায় পুরো Frame জুড়ে। জলের ধারে নিমি নাচছে।

ইচু : ঐ দেখো এবার নাচতে নেগেছে।

বছিরদ্দি ইচুকে জোর ঝাঁকুনি দেয়। হাফেজ চিৎকার করে বলে —

হাফেজ : ইচু।

পিছনে বটগাছের ঝুরি। সামনে তিনটে মানুষ। হাফেজের গলা প্রতিধ্বনিত হয়।

দৃশ্য — ১৮

বড় মোড়লের বাড়ি ।। বেলা গড়িয়ে গেছে

বড় মোড়লের বাড়ীতে লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে । দারোগা বসে আছে উঠোনের দাওয়ায়। বৃদ্ধ আমিনুদ্দিকেও দেখা যাবে। ইচু বসে আছে উঠোনের মাটিতে। সকলের চোখ ওর দিকে।

দারোগা নৈঃশব্দ ভেঙে সকলের উদ্দেশ্যে বলে —

দারোগা : চুপ করে থাকলে চলবে? যা বললাম চট্‌পট্ তার উত্তর দাও . . .

লোকজন তাকিয়ে আছে। Frame এর তলা থেকে ওসমান ওঠে। মাথা চুলকে বলে—

ওসমান : কি বলব দারোগাবাবু। এই লোকটা বড় সাধাসিধে . . .

বলতে বলতে আবার চুপ করে যায়।

দারোগা : বলে ফেল বলে ফেল।

ওসমান : আজ্ঞে বউটা ছেল খুব ঢলানি। . . . পাঁচ গায়ে দশটা নাগর ছেল বাবু। সে অনেক কেচ্ছা . . . সকলেই জানত . . . এখন কাটা ঘায়ে আর নুনের ছেটা দিয়ে কি লাভ।

ইচু মাথা নিচু করে থাকে। দারোগার গলা শুনে ইচু মুখ তুলে —

দারোগা : তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ?

ইচু : না দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

দারোগা : সত্যি বল ইচু। তুমি কি জান এ কেসে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

ইচু : আল্লার যদি তাই মর্জি হয় . . . মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু। তেনার যা মর্জি তাই যেন হয়।

ইচু চুপ করে যায়।

হাফেজ মন্ডল উঠে দাঁড়ায়।

হাফেজ : দারোগাবাবু ইচু নির্দোষ। .. . আল্লার কথা উঠলে ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন ফকির লোক এ দিগরে নাই।

দারোগা চুপ করে থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলে —

দারোগা : তোমার বউ'এর লাশ মর্গে পাঠাতে হবে। যাও একবার দেখে এসো . . .

ইচু মাথা নেড়ে না জানায়।

ইচু : ও লাশ আমি আর দেখবনি বাবু।

দারোগা : শোন মোড়ল, ইচুকে আমি থানায় নেব না। তবে খুনি ধরা পড়বেই, . . সে এ চত্বরে আছেই। . . . কাল কাটাঘর থেকে লাশ ছাড়িয়ে আনবে।

হাফেজের মুখে একটু হাসি ফোটে।

ইচু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'নিরাকার' গানের তান Soundtrack এ শোনা যায়।

Mix

দৃশ্য — ১৯

Montage

ইচুর মুখ dissolve হয়ে যায় বটবৃক্ষের উপর pan shot-এ। গান চলছে।

Mix

জঙ্গলের উপর চাঁদ উঠেছে।

চাঁদনি রাতে গাছপালার উপর দিয়ে Camera zoom করছে। Frame-এ তলা থেকে আগুনের হল্‌কা উঠতে থাকে। পিছনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জঙ্গল। আগুন আর জঙ্গলের মাঝে নিমির মুখ। নিমি ঘুরে তাকায়। ইচুর মুখ চাঁদের আলোয় দেখা যায়।

ইচু : নিমি, ও নিমি মোরে ভাত এনে দে।

(Music)

ইচুর ঘরে camera ঘুরছে। ফাঁকা ঘর। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া বইছে। নিমির জামাকাপড়, সাজের জিনিষ, কাচের চুড়ি। সব ছড়িয়ে আছে। দেওয়ালে টাঙানো আয়নার উপর camera আসে। আয়নায় ইচুর প্রতিফলন। ইচু যেন আবার বলে।

ইচু : ও নিমি মোরে ভাত এনে দিলি নে। বড় খিদে নেগেছে।

উপর থেকে ঘরটা দেখা যায়। ফাঁকা ঘরে ইচু ডুকরে ওঠে। মাটিতে বসে পড়ে।

dissolve

দৃশ্য — ২০

ফাঁকা ঘর।

ফাঁকা ঘর। ইচু নেই। মোড়লের গলা শোনা যায়।

বাইরে হাফেজ ও অন্যান্যরা ডাকাডাকি করছে। ইচুর কোনো সাড়া নেই।

দরজা হাট করে খোলা। গাঁয়ের লোকেরা-ঘরে ঢোকে।

ওদের থেকে camera এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়।

শূন্য ঘর। শুধু একটা ছোট বিড়াল ভয় পেয়ে দৌড় মারে।

দৃশ্য — ২১

শেষ দৃশ্য ।। ভোর

বটবৃক্ষের গা ধরে camera নেমে আসে। পেছনে একটা বিল। বিলের উপর ভোরের আকাশের প্রতিফলন। এক কোণে ছায়ার মত একট মানুষের ধ্যানমগ্ন চিত্র — ফজরের নামাজ করছে।

Soundtrack-এ ললিতা গৌরী রাগ আলাপ শোনা যায়। "তু হ্যায় নিরাকার"।

ফকির

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচু মন্ডলের আজ বেজায় সর্দ্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দ্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে — আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে — জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

— কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে?

— এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

— তবে আর কি? পানি দে — নামাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নমাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে — উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভাল না।

ইচু বললে — নামাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে। কি আছে রে?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা —বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে —যাবা কোথায়?

—সনেকপুরের বিনি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছে?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও, ওই বেনা ঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাঁফ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে — ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ীর চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন, কি হয়েছে চাচা?

— খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলো এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়ীতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ী হাজির হল।

মুখুজ্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে?

ইচু বললে—সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলিছি!

—কি রে?

— আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

— ওঃ, তোর কাজ ইচু! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

— আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তারপর পরস্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়তি সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে-মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমার হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশী হয়ে বললেন—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ীর মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই। পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয়?

—বিঘেয় না কি কাঠায়?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে — কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলি কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ী কোথায় তোমার?

—পাইলেপাড়া।

—নাম?

—ইচু মন্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘন্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা

ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মন্ডল খেতে খেতে বলে— আজ এট্টু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পারে না।

—নুন কনে পাবা? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে-খেয়ে খেয়ে চকি ঢ্যালা বেরুল। কেরাচিন্নি তেলের মুখ দেখিনি কতকাল।

—কুমড়োর বালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি খেতি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায়?

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আখের মন্ডল দা-কাটা তামাক সাজলে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মন্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হল ক কুড়ি?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা?

—না গো।

—কেন?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ী, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মন্ডলকে ইচু ডাক দিলে। —ও চাচা, সর্দারের বাড়ী তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্যে মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অন্যেয় তো কিছু বলছি নে।

—অন্যেয় নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দ্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দ্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা! হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে? মাচার শসা, না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে — দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দ্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দ্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধেছিস?

—এবেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাব গো! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জ্বেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমোট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ীর উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর লগা — ও ইচু, ইচু বাড়ী আছ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে— ও ইচু; বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে? বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গা মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মন্ডল বললে—ইদিকি এস?

—আগে নামাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনের দাওয়ায় নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে একসঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েছে কি?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যই গ্রামের লোক তার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বলেল? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকম লোক নয়।

চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ-সাত জন ওরে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে যায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—টাকার জন্যি ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশি ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ী, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মন্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ী কোথায়?

হাফেজ মন্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বউ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়ীতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার দিয়ে নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকে সুরে বললেন —তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না। যাও বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলো। ইচু মন্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয়?

— না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল; তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মন্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু ?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে—বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না — দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবেন। বাড়ী গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়েগিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলার কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি যোগাড় হয়ে উঠবে? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম— বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে একটা আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না —কি — কি বল—

—বাবু, ঝেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেননি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে —শত অসুবিধা,

অর্থনাশ, নির্য্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে —নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন — সত্যি অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেষ্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুজি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে—কত আদর-যতন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ী ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল। ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মন্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বললেন — তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে!

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি মোরে ভাত এনে দিলি নে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না। সে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

খলসেখালি গ্রামের নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

Price : Rs. 25
Vol 19. No 4.

BIVAV
Special Summer issue 96.
Jan-March 96
Published in May 96
INTERNATIONAL STANDARD
SERIAL NO ISSN 0970-1885

Reg No : 30017/76
71st issue

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার-ট্যাগোর কোম্পানির
কয়লাখনি যুগিয়েছিল বাঙলার শিল্পায়নের ইন্ধন।
মহাজনী-মুৎসুদ্দীগিরি নয় — সোজাসুজি শিল্পস্থাপনে পৌঁছুলো বাঙলার স্বপ্ন।
তারপর? স্যার আর এন মুখার্জী, স্যার বীরেন, আচার্য প্রফুল্ল রায়, রাজশেখর বসু....
বাঙলা বিশ্বের সাথে পাল্লা দিতেও পিছপা হল না।
বাঙলার অভাব কি? প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। শ্রম আছে, জ্ঞান আছে,
বুদ্ধি আছে, দক্ষতা আছে, ইতিহাস আছে, স্বপ্ন আছে।
চাই শুধু উদ্যোগ। চাই সুযোগ। চাই একটু সহায়তা। আর সেজন্যই আমরা আছি।
ক'দিনের সাফল্যেই প্রমাণ পেয়েছি, দ্বারকানাথের বাঙলা আজও আছে।
২১শতককে স্বাগত জানাতে তৈরি।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিষ্ঠান)
৫, কাউন্সিল হাউস, স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ৯১-৩৩-২১০৫৩৬১-৬৫, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-২৪৮৩৭৭৩৭
E-Mail : WBIDC@X400.nicgw.nic.in
internet : www.westbengal.com & www.wbidsc.com